হরর উপন্যাস

ব্লাড শো

গাই এন স্মিথ

রূপান্তর

অনীশ দাস অপু



হাইল্যান্ডের শতাব্দী প্রাচীন প্রাসাদটি দেশি-বিদেশি পর্যটকের অন্যতম আকর্ষণ। এর মাটির নিচের ঘরে রয়েছে মানুষকে ভয় দেখানোর নানান কৃত্রিম উপকরণ। মায়া নেকড়ে, নরখাদক, জল্লাদ, ভ্যাম্পায়ার ... প্রতিটি জিনিস নিয়ন্ত্রিত হয় বিদ্যুতে। অন্তত প্রথম দর্শনে আপনার তা-ই মনে হবে।

কিন্তু আসল শয়তান শত শত বছর ধরে লুকিয়ে আছে ভল্টের নিচে। প্রতিশোধের বাসনায় ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে শয়তানের শিষ্য বিনাহির ভূস্বামী। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে সীমাহীন আতংক এবং মৃত্যু।

তবে ভৌতিক ওই প্রাসাদে মৃত্যুই শেষ কথা নয়। পাঠক কি প্রস্তুত? ভয়ংকর এক পিশাচকে মোকাবিলা করার জন্য ...

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ



ব্লাড শো

গাই এন. স্মিথ

তৃতীয় মুদ্রণ
জুলাই ২০১১, আষাঢ় ১৪১৮

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৮, পৌষ ১৪১৫

প্রকাশক
প্রকৌ. মো. মেহেদী হাসান

বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ তাজমহল মার্কেট, নিচতলা
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২০৪০৩, ৭১৭০৯০৯
E-mail info@banglaprakash.com

পরিবেশক
লেকচার পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা

বিদেশে পরিবেশক
রূপসী বাংলা, ২২০ টুটিং হাই স্ট্রিট, লন্ডন
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা
বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা, ভারত
ডিকে এজেন্সিস (প্রা.) লি., নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স, ঢাকা

মূল্য ২২০.০০ টাকা

BLOOD SHOW by Guy N. Smith, Translated into bengali by Anish Das Apu, Published by Engr Md. Mehedi Hasan. Banglaprakash (A concern of Omicon Group), 38/2-Kha Tajmahal Market, Ground Floor, Banglabazar, Dhaka 1100.

Local Price in BDT 220.00 Only
Intl. Price in USD $ 11.00 Only

ISBN 984-300-000-560-3

উৎসর্গ

ডা. ওয়ানাইজা

হাসিখুশি এই ভদ্রমহিলার আমার হরর গল্প
পড়ার সময় নাকি মুখ থেকে হাসি উবে যায়,
ভয়ে চিৎকার করতে থাকেন এবং
তাঁর রাতের ঘুমও যায় হারাম হয়ে।
'ব্লাড শো' তাঁকে ভয়ে ভয়ে উৎসর্গ করছি।
কারণ এ বই তাঁর ক'রাতের ঘুম যে হারাম করে দেবে,
কে জানে!

ভূমিকা

সেবা প্রকাশনীর হরর ভক্ত পাঠকরা আমার হরর গল্প খুব পছন্দ করেন। আমার হরর গল্প-উপন্যাস লেখার শুরুটা মূলত সেবা থেকেই। বাংলাবাজারের প্রকাশকদের জন্য লেখা কোনো হরর উপন্যাস এটাই প্রথম। বাংলাপ্রকাশের তরুণ প্রকাশক প্রকৌ. মেহেদী হাসান এবং আমার লেখক বন্ধু হুমায়ূন কবীর ঢালীর অনুরোধেই 'ব্লাড শো' অনুবাদ করতে হলো। তাঁরা নির্বাচন করেছেন মোট ছয়টি বই। এর মধ্যে থ্রিলারও রয়েছে। তবে ওসব বই পর্যায়ক্রমে আসবে।

আমার বেশিরভাগ হরর ভক্ত পাঠক, যখন আমার কোনো হরর গল্প বা উপন্যাস পড়া শুরু করেন, মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান একটা শক্ পাবার জন্য। তাঁরা জানেন আমার নির্বাচিত কাহিনী মানেই রুদ্ধশ্বাস ভয় এবং রোমাঞ্চের মিশ্রণ। 'ব্লাড শো' তাদেরকে হতাশ করবে না আশা করি। এ বইয়ের কয়েকটি অধ্যায় আমি রাতের বেলা অনুবাদ করতে পারিনি ভয় লাগছিল বলে। আমার ভয় তাঁদের স্পর্শ করলেই বুঝব পরিশ্রম স্বার্থক।

অনীশ দাস অপু
০১৭১২৬২৪৩৩৬

এক

এক সেকেন্ডের জন্য যেন সমস্ত যুক্তি হারিয়ে ফেলল মেয়েটি, নির্জলা আতংকের গভীরে প্রবেশ ঘটল তার। কান ফাটানো আর্তনাদে কেঁপে উঠল কলজে।

পাথুরে সিঁড়িতে পা রাখা মাত্র ভয় ঘিরে ধরল তাকে। এই বিশ্রী জায়গাটার পরতে পরতে যেন লুকিয়ে আছে বিভীষিকা, শিউরে উঠল সে। মাকড়সার জাল দেয়ালে, পায়ের নিচে ভেজা শেওলা। হিলহিলে সরীসৃপের মতো ওর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যেন প্রস্তুত। গা ঘিনঘিন করছে তার, ঝিমঝিম করছে মাথা।

পেছনে কারও পায়ের শব্দে খাড়া হয়ে গেল মেয়েটির কান। ঈশ্বর, লোকটা ওর পেছন পেছন আসছে। অবশ্যই সেই লোকটাই। মনের চোখে লোকটার অবয়ব ফুটতে না দেয়ার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারছে না। লম্বা একটা লোক, মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে চেহারা, কোটরাগত লাল টকটকে চোখজোড়া যেন জ্বলছে। মেয়েটি নিজের মনকে নির্দেশ দিল, ওই লোকটার কথা ভেবো না, চলতে থাকো।

থপ্ থপ্। এগিয়ে আসছে তার অনুসরণকারী। দুই/তিন গজ দূরে মাত্র। জোরে জোরে ফোঁসফোঁস নিশ্বাস ফেলছে। মেয়েটি ছুটছে। হঠাৎ সিঁড়িতে বেঁধে গেল তার গাউন। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল। তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পিশাচ। ভাঁটার মতো জ্বলছে চোখ, বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল তার। বেরিয়ে পড়ল দাঁত। তার দিকে হাত বাড়াল লোকটা। হাতে ঝিকিয়ে উঠেছে ড্যাগার। লোকটার হাঁ করা মুখ থেকে বিকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। তার গায়ে লোকটার হিমশীতল আঙুলের স্পর্শ। এক টানে মেয়েটির গাউন ছিঁড়ে ফেলল দানব। তার দিকে ঝুঁকে এলো। ভয়ংকর মুখটা তার মুখ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে।

চিৎকার করল না মেয়েটি, লাভ হবে না জেনেই। বাধ্য হলো

পিশাচটার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। তার শরীর আড়ষ্ট হয়ে রইল। সে মৃত্যুর হাসি দেখতে পাচ্ছে, রক্তহীন ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেছে, দেখা যাচ্ছে থাবার মতো দাঁত।

তারপর মেয়েটির শরীরে প্রবেশ করল পিশাচ। মেয়েটি তীব্র ব্যথা অনুভব করল। তীব্র যাতনায় তার নরম, লাল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো আরেকটি সুতীব্র আর্তনাদ।

অন্ধকার হঠাৎ লাল রঙ ধারণ করল, কালো ভেলভেটে যেন ফুটল রক্তের দাগ, অনেক দূর থেকে ভেসে এলো শয়তানের অশ্লীল কণ্ঠ, যেন তাকে নির্যাতিত হতে দেখে আনন্দ অনুভব করছে। তারপর অন্ধকারের কালো পর্দাটা আরও গাঢ় হয়ে এলো, বেদনা হ্রাস পেল, অদৃশ্য হয়ে গেল ভৌতিক ফিসফিস, তাকে যেন গভীর এক খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেয়া হলো যেখানে দানব হামলাকারী তাকে আর ব্যথা দিতে পারল না, তাকে লাঞ্ছনা করারও সুযোগ পেল না।

লিওন ফেল যেন গভীর একটি ঘূর্ণির তলা থেকে জেগে উঠল। যে ঘূর্ণি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল গভীর থকথকে একটি জলার মধ্যে। সে যেন এখন ভেসে চলেছে, আবছা চাউনি, উজ্জ্বল আলোটা বড্ড লাগছে চোখে। চোয়াল খুব ব্যথা করছে। মুখে রক্তের স্বাদ। থুথু ফেলল সে। ঠন্ করে শব্দ হলো পাথরের মেঝেতে। লিওন জানে ওটা তার দাঁত। তার সামনে একটার পর একটা মুখ আসছে। আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট চেহারা। তারা কী যেন বলছে ক্রুদ্ধ স্বরে বুঝতে পারছে না লিওন। গুঙিয়ে উঠল সে, ঘষল চোয়াল। চোয়ালটা নির্ঘাত ভেঙে গেছে।

লিওন একটা ঘরের মধ্যে আছে। এটা প্রাসাদের হলওয়ে, এখানে ক্যামেরা, নানান সাইজের বাক্স, খালি বিয়ারের ক্যান, সিগারেটের প্যাকেট– সবমিলে আবর্জনার ভাগাড় হয়ে আছে। তার আশপাশের নড়াচড়া কমে আসছে। কিন্তু ঘটছেটা কি এখানে?

তার দৃষ্টি আগের চেয়ে পরিষ্কার। অ্যাঞ্জেলা এলিসনকে দেখতে পেল। কুমিরের চামড়ার সোফায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রয়েছে। তাকে ঘিরে রয়েছে কতগুলো লোক। অ্যাঞ্জেলা জামা-কাপড় শতছিন্ন, দুধসাদা বুক বেরিয়ে পড়েছে। গা থেকে রক্ত ঝরছে। সম্ভবত ঘাড় বেয়ে রক্ত পড়ছে। প্রযোজকের সহকারী রোজালিন্ড টেট কিছু একটা দিয়ে ক্ষতস্থানে

ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। কিন্তু আমার দিকে তোদের কোনো খেয়াল নেই কেন হারামীর দল? ভাবল লিওন।

লিওনের মনের কথা যেন শুনতে পেল গাট্টাগোট্টা এক লোক। মাথায় পাতলা চুল। সে এগিয়ে এলো লিওনের দিকে। এ হলো ফ্রাঙ্ক ভোবোদা, পরিচালক। লিওনের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। ভোবোদার সাথে প্রথম পরিচয়ের সময় সে বলেছিল, 'এই ব্যবসায় সবাই ফালতু মানুষ, লিওন। কেউ বড় ফালতু, কেউ ছোট। আমি বড় ফালতু। তুমি ছোট ফালতু। বোঝা গেছে?' হরর ছবিতে সবার সাথে সবার এরকমই নাকি সম্পর্ক থাকে। লিওন ভোবোদা'র 'ডেথ কাস্ট' ছবিতে একটি সাপোর্টিং চরিত্রে অভিনয় করছে। ভোবোদা ইউনিটের সবার ওপরে ছড়ি ঘোরায়। কেউ তাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস পায় না।

'ইউ ক্রেজি, লিওন?' খেঁকিয়ে উঠল ভোবোদা, 'হচ্ছে কী এসব?'

লিওন আস্তে চোয়াল ঘষল। সরিয়ে নিল চোখ, মেঝে থেকে তুলে নিল রক্তাক্ত দাঁত।

'কী হচ্ছে?' কথাটা পুনরাবৃত্তি করল লিওন। তবে ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ। ও ভয় পেয়েছে। তবে ফ্রাঙ্ক ভোবোদা ওর ভয়ের একমাত্র কারণ নয়।

'আমি তো তাই জানতে চাইছি, ইউ ক্রেজি বাস্টার্ড। এই চূড়ান্ত দৃশ্যটি অন্তত: ডজনখানেক বার শূট করা হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই প্রত্যাশিত রেজাল্ট পাইনি। যখনই ভালো কিছু পাবার আশা করি, তোমার কারণে ভেস্তে যায় সব। আমার সাথে বেশী চালাকি হচ্ছে, না? বেশ, আমিও বলে দিচ্ছি তুমি 'দ্য গ্রেভ পিপল'-এ ভ্যাম্পায়ারের রোলটা পাচ্ছ না। কারণ তোমাকে আমি আর আমার কোনো ছবিতে নেব না। বুঝতে পেরেছ?'

লিওন বুঝতে পারেনি। সে শুধু জানে কোথাও মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। সে আবার চোখ বুজল। সিঁড়ির দৃশ্যের কথা মনে করল। সমস্যার শুরু ওখান থেকেই। যে মুহূর্তে সে সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখেছে, তখন থেকে যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল ও, দেখছিল দুঃস্বপ্ন।

অ্যাঞ্জি সাদা পোশাক পরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দৃশ্যটা ওকে উত্তেজিত করে তুলল। অ্যাঞ্জিকে সেদিন ও পটানোর চেষ্টা করেছিল। আউটডোর সুইমিংপুলে অ্যাঞ্জির পেছন পেছন আসছিল লিওন। খেঁকিয়ে উঠে অ্যাঞ্জি বলেছিল, 'আমাকে নিয়ে কোনো বদ মতলব থাকলে ছাড়ো,

লিওন। আমার পেছনে বেহুদাই ঘুরঘুর করছ। আমি অন্য মেয়েদের মতো ন্যাংটো হয়ে সুইমিংপুলে নামব না, আমার পরনে থাকবে বিকিনি।'

তবে অ্যাঞ্জি যে নাইট ড্রেসটি পরেছে তার মধ্যে ইরোটিক একটা ব্যাপার আছে। লিওন ওকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে চুম্বন করেছিল। আবার সুযোগ এলে সে অ্যাঞ্জির শরীরে যত্রতত্র হাত বুলাবে। অ্যাঞ্জি যত চিল্লাবে, ভোবোদা ততই পছন্দ করবে ব্যাপারটা।

দৃশ্যটা ছিল এরকম– শতাব্দী প্রাচীন প্রাসাদে ভ্যাম্পায়ার সেজে সে অ্যাঞ্জি উইলসনকে ধাওয়া করবে। তার ঘাড়ে ফুটিয়ে দেবে দাঁত। অ্যাঞ্জি সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় গাউনে পা বেঁধে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যায়। লিওন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর, টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে পোশাক। তার নখ বসে যায় অ্যাঞ্জির নরম মাংসে। তার নাকে ভেসে আসে অ্যাঞ্জির শরীরের সুঘ্রাণ, পারফিউমের গন্ধ।

অ্যাঞ্জি তার কবল থেকে মুক্তি পেতে ধস্তাধস্তি করছিল। সে কামড়ে ধরে অ্যাঞ্জির ঘাড় এবং যৌন আনন্দ পাবার মতো শীৎকার দিয়ে ওঠে। আর তখন তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে হাজারটা তারা, বিস্ফোরিত হয় যেন মগজ।

'হারামজাদাকে আচ্ছাসে চোয়ালে দিয়েছি বাড়ি,' চিফ ক্যামেরাম্যান টেড ফারব্যাঙ্ক চেঁচিয়ে উঠল পরিচালক এবং অ্যাঞ্জেলার উদ্দেশ্যে। অ্যাঞ্জেলা উঠে বসার চেষ্টা করছে। 'বাড়ি না মারলে ব্যাটা ওকে মেরে ফেলত অথবা ধর্ষণ করত।'

'আমি ওর বিরুদ্ধে মামলা করব,' বলল অ্যাঞ্জেলা। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। তাকাল ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকায় অভিনয়কারী লিওনের দিকে। তাকে এখন আর ভ্যাম্পায়ারের মতো লাগছে না। বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। রক্তাক্ত রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে।

'বাদ দাও তো, অ্যাঞ্জি,' ধমক দিল ভোবোদা। 'আমি দেখছি ব্যাপারটা।'

'আমি পুলিশকে তো জানাবই,' প্রতিবাদ মুখর অ্যাঞ্জি। 'বলব ও আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে। সাক্ষীর অভাব হবে না।'

'শোনো,' ঘুরল পরিচালক, ঝুঁকল অ্যাঞ্জেলার দিকে, জ্বলছে চোখ। 'তোমার মুখটা আপাততঃ বন্ধ রাখো। ছবি শেষ করার ডেডলাইনের আর মাত্র দু'দিন বাকি। এবং কাজটা আমাকে শেষ করতেই হবে। তোমাকে এবং লিওনকে আমার আর মাত্র দুটো দিনের জন্য দরকার। এবং তোমরা

এ দুটো দিন কাজ করছ।'

'আমি চলে যাচ্ছি,' সোফা থেকে উঠে বসার চেষ্টা করল অ্যাঞ্জেলা, পারল না। বমি বমি ভাব হচ্ছে, ঘুরছে মাথা।

'চলে যাও। তারপর দেখো কত ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। মামলা ঠুকে দেব বলে দিচ্ছি।

'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির গতানুগতিক হুমকি,' হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলা, তবে ফাঁকা শোনাল হাসি। 'এ কাজটা করো নয়তো মামলা ঠুকে দেব। ওটা কোরো না, করলে ঠুকে দেব মামলা। এ হুমকি পুরানো হয়ে গেছে, ফ্রাঙ্ক।'

'আমার সাথে একবার ফাজলামি করে দ্যাখো কী হয়,' ফ্রাঙ্ক জানে অ্যাঞ্জেলা কিছু করবে না। ফিল্ম কোম্পানির বিরুদ্ধে কেউ মামলা করলে তার পক্ষে পরবর্তীতে কাজ পাওয়া খুব কঠিন হয়ে যায়।

'আমাকে দিয়ে দু'দিনের বেশি কাজ করালে ঠিকই মামলা ঠুকে দেব।' বলল অ্যাঞ্জেলা, তবে তার কণ্ঠে আগের মতো বিষ নেই। 'যেসাস, এ জায়গাটা যে কী বিশ্রী! অথচ লোকে কিনা ছুটির দিনে পয়সা দিয়ে টিকেট কিনে এ প্রাসাদ দেখতে আসে!'

'যে কোনো লাইনেই হরর ভালো বিকোয়,' ভোবোদার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল। এটাই তার হাসি। 'এটা একসময় স্রেফ একটা হোটেল ছিল। লচসাইড হোটেল। কিন্তু হোটেল ব্যবসা না চলার কারণে এটাকে গ্লোব ট্যুরস হরর হাউজে রূপান্তর ঘটায়। তবে আমরাই প্রথম এখানে হরর ছবির শূটিং করতে এসেছি। আমি জানি আমার ছবিটা হিট করবে। মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি আমার ছবির টিকেটের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সামনে লম্বা লাইন পড়েছে...'

মুখ বাঁকাল অ্যাঞ্জেলা। আবার তাকাল লিওন ফেলের দিকে। লোকটা একটা উন্মাদ, পারভার্ট।

'তুমি এখন ঠিক আছ তো, অ্যাঞ্জি?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল প্রযোজকের সহকারী রোজালিন টেট।

'ঠিক হয়ে যাব,' জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। তাকাল আয়নায়। গড, ওকে দেখাচ্ছে একটা পেত্নীর মতো। ওর ঘাড়ে ইলাস্টোপ্লাস্ট লাগানো। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। ওর লম্বা কালো চুল আলুথালু। ছেঁড়া নাইটড্রেসটা টেনেটুনে ঠিক করল। পরিচালককে বলল, 'কাল সকালে দেখা হবে।' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ভোবোদা।

নিজের ঘরে ফিরে এলো অ্যাঞ্জেলা। এখনও কাঁপছে। গোসল সারল। তারপর জিনস এবং সোয়েটার পরে নিল। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। দৃশ্যটি মনোহর, শেষ বিকেলের রোদে ঝলমল করছে বিশাল হ্রদটির পানি, বিপরীত দিকের পাহাড়ের গাছপালার পাতা সোনারং আলোয় যেন ঝলকাচ্ছে। উষ্ণ আবহাওয়া। শরতের শেষ। টুরিস্ট সিজন প্রায় শেষের পথে। আর হপ্তাতিনেক বাদে এ জায়গায় কেউ আসবে না। কৃত্রিম হররের এ স্বর্গ ডুবে যাবে আত্ম-একাকীত্বে, প্লাস্টিকের দানবগুলো শুধু নিজেদেরকে সঙ্গ দেবে।

নতুন হোটেলে আরামদায়ক কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে অ্যাঞ্জেলার। জায়গাটা নির্জন, শান্ত। পাহাড়, জলা। গাছের পাতা দোলে ঝিরঝিরে বাতাসে। একাকীত্ব বা প্রাচীন প্রাসাদের নকল হররের জন্য অস্বস্তিতে ভোগে না অ্যাঞ্জেলা। ওর মনে হয় এখানে যেন ভয়ংকর শক্তিশালী, অশুভ কিছু একটা ওঁৎ পেতে আছে। এমন একটা কিছু...যার কথা ভাবলেও বুকে কাঁপ উঠে যায়।

তবে ওকে আর মাত্র দুটো দিন এ অস্বস্তিকর ভয় নিয়ে থাকতে হবে। বুধবারের শূটিংয়ের পরে ওর ছুট্টি। জানালার পর্দা টেনে দিল অ্যাঞ্জেলা, জ্বেলে দিল বাতি। তারপর কী ভেবে বন্ধ করল দরজা।

দুই

'কেমন গা ছমছমে করছে আমার,' গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে কিম আর্মস্ট্রং।

'আমাদের হানিমুন করার মতো উপযুক্ত জায়গা এটা নয়, এরিক।'

'অবশ্য আমাদের মতো হরর ছবি প্রেমিক ছাড়া অন্য কারও জায়গাটা ভালো না লাগারই কথা,' হেসে উঠল এরিক। ভুরু কুঁচকে তাকাল। ঝিরঝির বৃষ্টিতে ওয়াইপার পরিষ্কার করে চলেছে কাচ। এরকম বৃষ্টিতে ভালোভাবে কিছু ঠাহর হয় না। তবে কিম ঠিকই বলেছে। এ জায়গাটার মধ্যে গা ছমছমে একটা ব্যাপার আছে। অবশ্য রোদ উঠলে উজ্জ্বল সূর্যালোকে লচসাইড হোটেল আর দশটা হোটেলের মতোই নির্দোষ এবং নিরীহ মনে হবে।

'আমরা আসলে পাগল, এরিক,' কিম স্বামীর হাঁটুতে হাত রাখল। 'অবশ্য পাগল হলে কার কী এসে যায়? আমাদের একজন যদি মাথা খারাপ টাইপের না হতো তাহলে বোধহয় বিয়েটা হতো না, তাই না?'

এরিক আর্মস্ট্রং আড়চোখে দেখল তার বধূকে। কিমের উচ্চতা টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে। তবে তার শরীরি সম্পদের কোথাও কোনো ঘাটতি নেই। কিমের মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, খাটো নীল চোখ জোড়া দিয়ে যেন জীবনের কাছ থেকে আহরণ করা দ্যুতি ছড়ায়। ওর নাকের ডগাটা সামান্য ওপরের দিকে বাঁকানো। তবে এতে কিমকে খারাপ তো লাগেই না বরং চেহারায় এনে দিয়েছে দুষ্টু একটা ভাব। সদ্য ধোয়া জিনস প্যান্ট খানিকটা কুঁচকে আছে, বেরিয়ে পড়েছে সুগঠিত গোড়ালি।

কিম বেঁটে বলেই এরিককে তার পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা কাঠামোতে বউর পাশে বেশ লম্বা মনে হয়। তার শরীরে এক আউন্স বাড়তি মেদ নেই। কিমের মতোই সে কখনও নিজের ওজন বাড়তে দেয়নি। তার বাদামী চুল কোঁকড়ানো, মুখে দাড়ি। তার মা আপত্তি তুলেছিলেন দাড়িতে নাকি ছেলেকে বয়সী লাগে। পাত্তা দেয়নি এরিক। ওর পঁচিশ চলছে,

দাড়িতে যদি ত্রিশ মনে হয়তো কী এসে যায়। তার শরীরে ত্রুটি একটাই– আঙুলগুলো মোটা এবং কর্কশ। অবশ্য তার যে পেশা, গার্ডেনিং কন্ট্রাক্টর, তাতে চম্পক অঙ্গুলির আশা না করাই উচিত। অ্যাকসেলেরেটর থেকে পা তুলে নিল এরিক। মন্থর হয়ে এলো গাড়ির গতি। ঢাল বেয়ে নামছে ওরা।

'এমনকি হোটেলের নতুন অংশটাও দেখে ভৌতিক মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল কিম। স্থির দৃষ্টি হ্রদের তীরের ভবনের দিকে। 'কেউ কেউ ভাবতে পারে ওটাকে বিসদৃশ দেখাচ্ছে। তবে আমার কাছে মন্দ লাগছে না। যেন প্রাচীন এবং আধুনিক সময়ের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন স্থাপিত হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল এরিক। 'ঠিকই বলেছ তুমি। ওরা অবশ্য খুব বেশি পরিবর্তন করেওনি। প্রাসাদটিতে অতিরিক্ত ভাঙচুর চালালে ওটার বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যেত। তাই ওরা আধুনিক এবং প্রাচীন সময়ের মধ্যে সমন্বয় করেছে। প্রাসাদের ভুতুড়ে অংশটি তোমার পছন্দ না হলে আধুনিক অংশে রাত কাটাতে পার। পুরো জিনিসটাই তো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা।'

অ্যাকসেলেটরে আবার পা দাবিয়ে ধরল এরিক, বেড়ে গেল গাড়ির গতি। 'আজ আমরা মধুচন্দ্রিমা যাপন করব এবং কাল নেব ভুতুড়ে আবহের স্বাদ।'

'ওদের এখানে লোকজন বোধহয় কমই আসে,' পাইন-প্যানেলের ডাইনিংরুমের চারপাশে চোখ বুলাল কিম। ওরা ছাড়া মাত্র দু'জন মানুষ দেখা যাচ্ছে ঘরে। একজন ধূসর চুলের, মুখে গুচ্ছ দাড়িঅলা বুড়ো। দূর প্রান্তে বসে খাচ্ছেন। আর চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের এক স্বর্ণকেশী, খবরের কাগজে মনোযোগ, মাঝে মাঝে চামচে সুপ তুলে নিচ্ছে মুখে।

'এখন ভ্রমণের সময় নয়,' এরিক আর্মস্ট্রং গলা নামিয়ে বলল, 'বুড়ো লোকটাকে দ্যাখো। উনি জর্জ ভ্যালান্স।'

'কে উনি?'

'এক সময় ভুতুড়ে প্রাসাদ নিয়ে বই লিখেছেন। ব্যাক কভারে লেখকের ছবি ছিল বলে চিনতে পেরেছি।'

'উনি বোধহয় নতুন এবং পুনমার্জিত একটা এডিশন লিখছেন লচসাইডকে নিয়ে,' খিলখিল হাসল কিম। 'মহিলাটি কে?'

'দেখতে তো মন্দ নয়,' মুচকি হাসি এরিকে ঠোঁটে। 'হয়তো পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'তাহলে বুড়ো ভ্যালান্সের কাছে গেলেই পারে,' টেবিলের নিচ দিয়ে স্বামীর হাঁটুতে চিমটি কাটল কিম। 'এখানে তো ভৌতিক কিছুই চোখে পড়ছে না। সবই অতি সাধারণ।'

'তুমি কি আশা করেছিলে জিন্দালাশের দল তোমাকে খাবার পরিবেশন করবে? এটা একটা কমার্শিয়াল হোটেল, বুঝলে?'

'তা জানি,' হতাশা কিমের কণ্ঠে। 'আশা করি একটা হপ্তা খুব বেশি দীর্ঘ মনে হবে না।' নাক কোঁচকাল ও। ধোঁয়ার একটা মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। জর্জ ভ্যালান্স টার্কিশ সিগারেট ফুঁকছেন।

কিম আর্মস্ট্রংয়ের কাছে হোটেলটি মোটেই অসাধারণ মনে হচ্ছে না। তবে হতাশা গোপন করে রাখল সে স্বামীকে আশাহত করতে চায় না বলে। শত হলেও এটা ওদের প্রথম হানিমুন।

লাউঞ্জ বারটি বেশ প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে দিনের বেলায় হ্রদের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। রাত বলে লাল টকটকে মখমলের পর্দা টেনে বন্ধ করে রাখা হয়েছে জানালা, মৃদু লয়ে বাজছে সঙ্গীত। বাইরে বাতাসের দাপাদাপি অনেকটাই ঢাকা পড়েছে সুরের মূর্ছনায়।

জর্জ ভ্যালান্সকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো সকাল সকাল ঘুমাতে যান তিনি। অথবা পাশে ঘরে বসে টিভি দেখতেও পারেন। বুড়োর একটা অটোগ্রাফ নেবে ভাবছিল এরিক। সে ভ্যালান্সের 'হন্টেড ক্যাসলস অ্যান্ড আদার ক্রিপি প্যালেসেস' কিনেছে অনেক আগে।

সেই স্বর্ণকেশী বার-এর অপর প্রান্তে একটি টুলে বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। চোখ এখনও নিবদ্ধ খবরের কাগজে। তার পরনে দামী টুইড স্কার্ট এবং সুতোর সবুজ জ্যাকেট। যদিও স্কার্টের সাথে সস্তা জ্যাকেটটি একদম মানায়নি। মেয়েটির গড়ন দোহারা, তবে অনাকর্ষণীয় নয়। বহু লোকের ভিড়ে এ নারী নজর কাড়ার মতো নয় তবে কিম ছাড়া সে-ই এখানে একমাত্র নারী বলে সহজেই তার দিকে চলে যাচ্ছে দৃষ্টি।

'হ্যালো,' মুখ তুলে চাইল মেয়েটি। ওরা ঘরে ঢুকেছে। হাসল সে।

'এখানে লোকজন খুব কম। তাই বসে আছি। আমি ক্যারোলিন। ক্যারোলিন চাডারটন।'

'আমি এরিক ও কিম,' স্ত্রীকে দেখাল এরিক। 'আমরা হানিমুন করতে এসেছি।' না বলে বলল, 'আমরা দু'জনেই হরর ভক্ত। এ কারণেই এখানে আসা।'

‘আমি সাংবাদিকতা করি,’ গর্ব ফুটল মেয়েটির কণ্ঠে। ‘ফ্রিল্যান্স। এ জায়গাটির ওপর রিসার্চ করছি। এ জায়গাটা ভুতুড়ে।’

‘চমৎকার,’ বলল এরিক। ‘কাল আমরা ক্যাসল দেখতে যাব।’

‘রাতের বেলাও খোলা থাকে প্রাসাদ,’ বলল ক্যারোলিন। ‘আমি আজ রাতে যাচ্ছি ওখানে। এ সময়ে গা ছমছমে একটা ভাব থাকে। আপনারা যদি আমার সাথে যেতে চান...’

‘ধন্যবাদ, তবে–’ এরিক চট করে একবার কিমের দিকে তাকাল ‘হানিমুনে এসেছে’ কথাটা বলা থেকে আবার বিরত রাখল নিজেকে।–‘কাল আমরা ওখানে যাব। এখানে হপ্তাখানেক আছি।’

‘বেশ। সেক্ষেত্রে ক্যাসল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না বলাই ভালো। তাহলে আপনাদের দেখার মজাটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে,’ বলে চলল ক্যারোলিন। ‘তবে এটুকু বলতে পারি সবকিছু এমন নিখুঁতভাবে তৈরি যে মনে হবে বাস্তব। এমনকি এখানকার মমির গা থেকে পচা গন্ধও আসে।’

‘মমির গায়ে বোধহয় দুর্গন্ধ ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে, না?’

‘তাতো বটেই। এজন্যই তো মজাটা পাবেন। গ্লোব ট্যুরস তাদের শো জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নানান আয়োজন করেছে। ওদের ম্যানেজার আমাকে বলেছে শো নাকি দারুণ হিট। আপনারা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসুন আমি সত্য বলেছি না মিথ্যা। ভালো কথা, ডাইনিংরুমের ওই ভদ্রলোককে চেনেন? উনি জর্জ ভ্যালান্স। লেখক।’ মেয়েটা খুব দ্রুত কথা বলে এবং কোনোরকম বিরতি ছাড়াই।

‘হ্যাঁ, আমি ওর বই কিনেছি।’

‘ফালতু জিনিস। লোকাল গাইড বই থেকে ধার করা তথ্যে ঠাসা।’

‘তবু আমি ওনার একটা অটোগ্রাফ নিতে চাই।’

‘সময় নষ্ট হবে,’ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠল ক্যারোলিন।

‘ওই লোক সম্পর্কে আমার ধারণার কথা জানিয়ে দিয়েছি। বুড়োটা ভারী বিরক্তিকর। সারাক্ষণ সিগারেট ফুঁকে ধোঁয়ায় অন্ধকার করে রাখে ঘর। ব্যাটার আশংকা এ জায়গাটি নিয়ে তার আগেই না আমি লিখে ফেলি। তবে আমি সে কাজটাই করব। কেউ ওই লোকের ওইসব জিনিস আর ছাপবে না। কেউ তার বইও কিনবে না।’

গভীর দম নিল এরিক, বাতাস ছাড়ল ধীরে ধীরে। ও কারও ঝগড়ার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায় না। কারও পক্ষ নিতেও আগ্রহী নয়। এদের শিশুতোষ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া মানে নিজেদের হানিমুনের বারোটা বাজানো।

'আসুন, আমার তরফ থেকে একটা ড্রিংক নিন,' বলল সাংবাদিক। 'বেশ কয়েকদিন পরে আপনাদের মতো শিক্ষিত মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে ভাল্লাগছে।'

বারম্যানের বয়স কুড়ির কোঠায়, যদিও ঠোঁটের ওপর ঘন গোঁফের কারণে বয়সী লাগে। সে সাদা জ্যাকেট এবং বো-টাই পরেছে। ফর্মাল ড্রেস। স্বল্পবাক। ক্যারোলিন তাকে ড্রিংক দিতে বললে সে শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'আমার আসলে একা এবং রাতে প্রাসাদে যেতে তেমন ইচ্ছে করছে না,' ঠোঁট কামড়াল ক্যারোলিন।

'কেমন ভৌতিক জায়গাটা। অবশ্য গা ছমছম করারই কথা, না?' হাসল সে। চেহারা দেখে মনে হলো ভয় পেয়েছে মহিলা। 'আপনারা সত্যি আমার সাথে যাচ্ছেন না?'

'না, ধন্যবাদ,' বলে উঠল কিম। 'আমরা আসলে...হানিমুনে এসেছি,' এ কথা না বলে উপায় ছিল না। এখন যদি মহিলা ওদের পিছ ছাড়ে। তবে কথাটা বলে লাজে রাঙা হলো কিম।

'হানিমুনে এসেছেন!' চিলের গলায় চেঁচাল ক্যারোলিন, প্রায় হিস্টিরিয়া রোগীর হাসির মতো শোনাল। 'মাই গড, আপনারা এখানে এসেছেন হানিমুন করতে! নাকি আপনার স্বামী আপনাকে জোর করে এখানে নিয়ে এসেছে? আমি একবার বিয়ে করেছিলাম। জেসাস ক্রাইস্ট, আমার স্বামী সারাদিন শুধু খাওয়া আর আমাকে বিছানায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারত না। আমি তাকে বলে দিই আমি রাঁধতে পারব না, বাসন ধুতে পারব না এবং যখন তখন পা ফাঁক করে শুয়েও পড়তে পারব না। আমার কথা শুনে সে মুখের রা হারিয়ে ফেলে। দু'বছর তার সাথে ছিলাম আমি। কবে সংসার ছাড়ব তা-ই চিন্তা করতাম। নাহ্, ভুল বললাম। ভাবতাম ছাতার বিয়েটা করা মোটেই উচিত হয়নি। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম জীবনেও এ ভুল আর করব না। তবে এখন ভাবছি ভালো কোনো ছেলে পেলে তার গলায় ঝুলে পড়তে দ্বিধা করব না। তার সাথে যখন তখন বিছানায় যেতে আমার আপত্তি নেই তবে যদি রান্না করতে হয় এবং তার নোংরা আন্ডারওয়্যার ধুয়ে দিতে হয় তাহলেই আমি গেছি।'

এরিক মনে মনে প্রার্থনা করল জর্জ ভ্যালান্স যেন এখনই এখানে এসে পড়েন। বুড়ো লোকটির উপস্থিতিতে যদি এই মহিলার বকবকানির কবল থেকে রেহাই মেলে। বুড়ো তুমি আসো। এসে টার্কিশ ধোঁয়ায় ভরিয়ে দাও

লাউঞ্জ বার এবং ঝেটিয়ে বিদায় করো বাচাল এই নারীকে।

'রাতের বেলা প্রাসাদে যেতে সত্যি কেমন ভয় ভয় লাগছে,' ক্যারোলিনের ফরফর হঠাৎ মিইয়ে গেল, আবার ভীত দেখাল তাকে। 'আমরা তিনজনে মিলে যদি যাই, চট করে ঘুরে দেখে এলাম...'

'না, দুঃখিত,' এরিক এক ঢোকে গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু গিলে ফেলল। আড়চোখে তাকাল কিমের গ্লাসে ওর মার্টিনি এবং লেমোনেড শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে দেখার জন্য। 'বললামই তো আমরা হানিমুনে এসেছি।'

'আমিও অবশ্য এমন জবাব পাব ভেবেছি,' সাংবাদিকের চেহারায় হতাশা। 'ঠিক আছে, এনজয় ইয়োরসেলভস। আপনারা কাল যখন প্রাসাদ দেখতে যাবেন, টর্চার চেম্বারে টুঁ মারতে ভুলবেন না। তবে ওখানে একটা লোক আছে। সে আপনাদের হানিমুনের মজাটা আবার নষ্ট করে দিতে পারে।'

'রাবিশ!' কিম এক ঢোকে শূন্য করে ফেলল গ্লাস। দেখল ক্যারোলিন লঘু পায়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। 'ওই মহিলার সাথে কথা চালিয়ে যাওয়া এবং শোনা দুটোই কষ্টের। আমার মাথাটা রীতিমতো ঘুরছে!'

'আবার মাথাব্যথা বাধিয়ে বোসো না যেন। এই ছুতো কিন্তু মাফ করা যাবে না।'

'ও নিয়ে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না, অন্তত আজ রাতে আমি কোনো ছুতো তুলছি না।' খিলখিল হাসল কিম। 'তবে ক্যারোলিন চাডারটনের সাথে যত কম দেখা হয় ততই মঙ্গল। সে কদ্দিন এখানে আছে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।'

'সবকিছু ঠিক আছে তো, স্যার, ম্যাডাম?'

ওরা দু'জনেই লাফিয়ে উঠল একসাথে। সান্ধ্য পোশাক পরা লম্বা, গম্ভীর মুখের মানুষটি কখন ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি কেউই। লোকটার ভুরুতে চুল কম, মাথায় টাক। কেমন অশুভ একটা চেহারা।

'ঠিক আছে, হ্যাঁ...সব ঠিক আছে,' বলল এরিক। ঢোক গিলল সে, টের পেল কিম শক্ত করে চেপে ধরেছে ওর বাহু।

'বেশ,' লোকটার মুখে হাসি নেই। 'আমাদের উদ্দেশ্য হোটেলের মেহমানদেরকে খুশি রাখা। আপনাদের যখন যা প্রয়োজন হবে চাইতে দ্বিধা করবেন না। আপনারা কি প্রাসাদে টুঁ মেরেছেন, স্যার?'

'না, এখনও যাইনি। মাত্র তো এলাম। কাল একবার যাব ভাবছি।'

'ওটা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে, স্যার।'

'তা জানি। তবে কাল যাব।'

'সে আপনাদের ইচ্ছে, স্যার।' আরেকবার বো করল লোকটা, তারপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চলে গেল। যেন ঘন কার্পেটের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে গেল।

ঘড়ি দেখল এরিক। লক্ষ করল হাত কাঁপছে। 'সাড়ে নটা বাজে। আমরা কি এখানে আরেকটু থাকব? ড্রিংক নেবে আরেকটা? নাকি...'

'না, শুতে চলো।' কিম স্বামীর আস্তিন আঁকড়ে ধরল।

'এখানে থাকলে ওই ফিচেল মহিলা আবার চলে আসতে পারে। আমার তাহলে সত্যি মাথা ধরে যাবে। অথবা অন্য কেউ হাজির হয়ে আবার চমকে দিতে পারে পিলে। হোটেলটা আমার কাছে লাগছে পাগলা গারদের মতো।'

'তাহলে শুতেই যাই চলো,' বউকে নিয়ে হলওয়েতে পা বাড়াল এরিক। 'তবে ডার্লিং, ভুলে যেয়ো না এটা কিন্তু সাধারণ কোনো হোটেল নয়।'

বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিল ওরা। দু'জনেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে, যেন এবারই প্রথম মিলিত হতে যাচ্ছে ওরা। অস্বস্তি এবং লজ্জা নিয়ে কাপড় ছাড়ল। তবে দু'জনেই বুঝতে পারছে আসলে জায়গাটা ওদের মনের ওপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। এখানকার পরিবেশ এবং মানুষজন যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে ওদের ওপর। যে উষ্ণতা নিয়ে এখানে এসেছিল তাতে কেউ এক বালতি বরফ জল ঢেলে দিয়েছে।

শোঁ শোঁ শব্দে বইছে বাতাস, হাওয়ার ঝাপটায় কোথাও ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলছে জানালা। ওরা বিছানায় উঠে পড়ল। দু'জনেই কান পেতে শুনছে বাইরের বিচিত্র সব শব্দ। ধাতব কী একটা যেন গড়িয়ে যাচ্ছে, বোধহয় ডাস্টবিনের ঢাকনা মচমচ শব্দ উঠল ফ্লোর বোর্ডে। প্রতিটি ভবনের, সে পুরানো কিংবা নতুন যা-ই হোক, রয়েছে রাতের নিজস্ব কিছু শব্দ, মনে মনে বলল এরিক।

এরিক কাছে টেনে নিল কিমকে। শক্ত হয়ে আছে মেয়েটা। স্বাভাবিক হতে সময় লাগল। ও নিশ্চয় ক্যারোলিন চাডারটনের কথা ভাবছে। কোথাও ঠং করে একটা শব্দ হলো, খড়খড় করে উঠল কিছু। হয়তো ডাস্টবিনের ঢাকনিটা আবার শুরু করেছে তার ভ্রমণ। জানালার কাচে বাড়ি খাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা, তারপর বেড়ে গেল গতি।

অবশেষে রিল্যাক্সড হলো কিম, এরিকও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা

করল। ওরা মিলিত হলো। তবে খুব দ্রুত যেন শেষ হয়ে গেল মিলন।

ওরা আবার কান পেতে শুনতে লাগল বাতাসের গর্জন। হ্রদ থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে বাতাসের ঢেউ, আছড়ে পড়ছে হোটেলের গায়ে। যেন ভেঙে ফেলবে। দমকা হাওয়ার আর্তনাদ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

এরিক স্বপ্ন দেখল আবার ওর সাথে কথা বলতে শুরু করেছে ক্যারোলিন। তীক্ষ্ণ, চিলের মতো গলার কবল থেকে মুক্তি পেতে কানে হাত চাপা দিল সে। কিন্তু কাজ হলো না তাতে। এরিক বুঝতে পারছে না কী বলছে ক্যারোলিন। সম্ভবত প্রাসাদে তার নৈশ অভিযানের ব্যাপারে কিছু বলছে। ওকে অত্যন্ত ভয়ার্ত লাগছে, সে চিৎকার দিতে লাগল, এরিকের নাম ধরে ডাকছে, ওকে জাপ্টে ধরেছে, ঝাঁকাচ্ছে দু'হাত দিয়ে। এরিক ওকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। পারল না। কী শক্তি ক্যারোলিনের গায়ে!

'এরিক!'

মোচড় খেয়ে ঘুরল এরিক। কিন্তু ক্যারোলিন তাকে ছাড়ছে না। ধ্যাত্তেরি, ম্যানেজারটা কই গেল?

'এরিক!'

এবার সত্যি সত্যি নিজের নামটা শুনতে পেল ও, টের পেল কেউ ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তবে বদলে গেছে ক্যারোলিনের কণ্ঠ, স্বরটা এখন রিনরিনে, অল্প বয়েসী মেয়েদের মতো, চেনা চেনা গলা। তবে এখনও ভয় ফুটে আছে।

'এরিক, ওঠো, প্লিজ!'

কিম। ঝুঁকে আছে ওর ওপর। ঘরের আবছা আলোয় ঠাহর করা যায় নগ্ন শরীর। ওর নখ বসে গেছে এরিকের বাহুতে।

'কী হয়েছে?' প্রায় সাথে সাথে জেগে গেল এরিক।

'এরিক...কারও গলা শুনতে পেয়েছি আমি...চিৎকার করছে!'

'রাবিশ!' এই ঝড়ো রাতে কিমকে কী বলবে বুঝতে পারছে না এরিক। তবু ওকে আশ্বস্ত করতে বলল, 'ওটা বাতাসের শব্দ।'

'ওটা বাতাসের শব্দ নয়, এরিক,' মৃগীরোগীর মতো কাঁপছে কিমের গলা। 'আমি শুনেছি কেউ চিৎকার করছে। কসম!'

বিছানায় উঠে বসল এরিক। কান পাতল। এখন ও-ও কাঁপছে। নিচে, উঠোনে কিছু একটা গড়াগড়ি খাচ্ছে, তবে ডাস্টবিনের ঢাকনি নয়, নরম কিছু একটা, হয়তো খালি কার্টন। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল অল্পক্ষণের জন্য,

আবার শক্তি সঞ্চয় করে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল জানালায়।

'আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না, ডার্লিং।'

'আমিও এখন কিছু শুনতে পাচ্ছি না। তবে চিৎকার যে একটা শুনেছি তাতে কোনো সন্দেহই নেই।'

ও ঝড়ের আওয়াজ ছাড়া কিছু নয়, মনকে বোঝানোর চেষ্টা করে এরিক।

'বুঝতে পারছি কীসের শব্দ শুনেছ তুমি,' খড়কুটো চেপে ধরার মতো বলল এরিক, 'ওটা এসেছে প্রাসাদ থেকে। টেপ করা চিৎকারের শব্দ। মাঝরাতে টেপটা চালিয়ে দেয়া হয় যাতে আমাদের মতো লোকদের ঘুম ভেঙে যায় এবং ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জেগে থাকে।' ব্যাখ্যাটা নিজের কাছে যুক্তিসংগত মনে হলো।

'হয়তো বা,' তবে কিম এ ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। 'কিন্তু চিৎকারটা মনে হয়েছিল সত্যি।'

'তেমনটাই তো মনে হওয়া উচিত, নয়কি?'

'হয়তো।' আবার শুয়ে পড়ল কিম, শরীর চেপে রাখল স্বামীর গায়ে। অন্যসময় নরম শরীরের স্পর্শ উত্তেজিত করে তুলত এরিককে কিন্তু আজ করল না।

ভোরের প্রথম আলো যখন পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল শুধু তখন কেবল ঘুমাতে পারল আর্মস্ট্রং দম্পতি।

ঘণ্টার শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠল ওরা। বেডসাইড টেবিলের ঘড়ি দেখল। সকাল আটটা কুড়ি।

'গড, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি,' কিম নেমে পড়ল বিছানা থেকে, পা বাড়াল বাথরুমে।

'তাতে কী?' পেছন থেকে বলল তার স্বামী। 'হানিমুন করতে এসে একটু বেশি না ঘুমালে চলে?'

ঝটপট প্রাতঃকৃত্য সেরে পনের মিনিটের মধ্যে ওরা হোটেলের ডাইনিংরুমে চলে এলো। লম্বা জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে। আকাশে ঝড়ো মেঘগুলো একত্রিত হয়ে আবার ভেঙে যাচ্ছে।

এরিক এদিক-ওদিক তাকাল। খুঁজছে ক্যারোলিনকে। গত রাতে ডিনারের সময় যে টেবিলটি দখল করে ছিল ক্যারোলিন, ওটা এখন খালি। মহিলা সাংবাদিকের চিহ্নও নেই কোথাও। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, ভাবল

এরিক। মহিলা যদি সত্যি গত রাতে প্রাসাদে ঘুরতে গিয়ে থাকে, নিশ্চয় দেরিতে ঘুমিয়েছে। হয়তো এখনও ঘুমাচ্ছে।

জর্জ ভ্যালান্স যথারীতি তাঁর নিজের আসনে বসে আছেন। এরিকদের চিনতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। গপগপ করে নাস্তা গিলছেন তিনি। গোঁফে লেগে আছে ডিমের কুসুম। লম্বা চুলে চিরুনি পড়েনি বোঝাই যায়, আলুথালু কেশ।

এরিকদের টেবিলও খালি। বাকি টেবিলগুলোরও একই দশা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে লচসাইড হোটেল ট্যুরিস্ট সিজনের প্রায় সমাপ্তির কারণে মেহমান সংকটে ভুগছে। ভ্যালান্সের পাশের টেবিলটি শূন্য। একমুহূর্ত ইতস্তত করে ওদিকে পা বাড়াল এরিক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীকে অনুসরণ করল কিম।

টেবিলে বসে আবার লেখকের দিকে তাকাল ওরা। শব্দ করে খাবার চিবাচ্ছেন তিনি, জিভ বের ঠোঁট চাটছেন। গা ঘিনঘিন করে উঠল কিমের। কোঁচকাল নাক। ওয়েটারের খোঁজে তাকাল চারপাশে।

'আমি পরিজ এবং কীপার খাবো। ট্রাডিশনাল স্কটিশ ব্রেকফাস্ট,' বলল কিম। এরিকের কাছে নীরবতাটা অস্বস্তিকর এবং অসহ্য ঠেকছে। সে জর্জ ভ্যালান্সের দিকে ঘুরল।

'গুডমর্নিং, স্যার। আপনি নিশ্চয় লেখক জর্জ ভ্যালান্স?' জিজ্ঞেস করল সে।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে চাইলেন ভ্যালান্স। দ্রুত চোয়াল নড়েই চলেছে। মোটা কাচের চশমার ফাঁক দিয়ে তাকালেন ওদের দিকে। খাওয়ার সময় বাধা পড়ায় বিরক্ত। তাঁর ঝোঁপের মতো ভুরুজোড়া কুঁচকে রইল তবে মুখের খাবারটা গিলে ফেলার পরে মাত্র একটি শব্দে প্রশ্নের জবাব দিলেন। 'হ্যাঁ।' আবার তাঁর দৃষ্টি ফিরে গেল প্লেটের ডিম এবং সসেজের দিকে।

'আ...ইয়ে...আমি আপনার একটি বই পড়েছি...ভুতুড়ে প্রাসাদ নিয়ে লেখা বইটি,' বিব্রত বোধটা দূর করার জন্য লড়াই করছে এরিক। 'চমৎকার বই। প্রতিটি পৃষ্ঠা উপভোগ করেছি।' মিথ্যা কথা।

আবার শানিত চাউনি নিবদ্ধ হলো এরিকের দিকে। খাবার গিললেন লেখক, হাতের ছুরি এবং কাঁটা চামচ চেপে ধরে রাখলেন প্রায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে। 'আমি বেশিরভাগ ভুতুড়ে প্রাসাদের কথা লিখে ফেলেছি।' ক্যাটকেটে গলা। 'এজন্য প্রচুর গবেষণা করতে হয়েছে আমাকে।'

'তা তো হবেই। আমি কি আপনার একটি অটোগ্রাফ পেতে পারি?'

ভ্যালান্সের কঠোর চাউনি নরম হলো, মারমুখি ভাবটার বিদায় ঘটল। সম্ভবত জীবনে এই প্রথম কেউ তাঁর কাছে অটোগ্রাফ প্রার্থনা করেছে। 'অটোগ্রাফ দিতে কোনো আপত্তি নেই আমার। তবে ব্রেকফাস্টের পরে, অবশ্যই।'

'জ্বী, আচ্ছা। ধন্যবাদ। আমি এরিক আর্মস্ট্রং। এ আমার স্ত্রী কিম। আপনি বোধহয় নতুন আরেকটা বই লেখার জন্য গবেষণা করছেন?'

'হুঁ,' হঠাৎ লেখকের কণ্ঠ ধপ করে নেমে গেল নিচে, প্রায় অস্পষ্ট ফিসফিসানির মতো শোনাল। তিনি ডাইনিংরুমের চারপাশে চোখের মণি ঘোরালেন। শুরু হলো এরিকদের টেবিল থেকে, সমাপ্তিও ঘটল সেখানে এসে। 'আপনারা ক্যাসলে গিয়েছিলেন?'

'না, মাত্র গতকাল বিকেলে এলাম। এখনও আমরা–'

'ভালো চান তো জলদি এখান থেকে কেটে পড়ুন, মিস্টার।' ঘ্যাসঘেসে কণ্ঠে বললেন ভ্যালান্স। তাঁর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, কিমের ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। আঙুলগুলো বেঁকে গিয়ে পরিণত হলো শক্ত মুঠিতে, ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল হৃৎপিণ্ড। এরিকের দৃষ্টিতে ফুটল সরল বিস্ময়।

'এখানে শয়তান বাস করে,' সামনে ঝুঁকে এলেন ভ্যালান্স, তাঁর টাই ঝুলছে প্লেটের ওপর ক্ষুধার্ত সাপের মতো, যেন ছোবল দেবে ডিমের ভগ্নাবশেষে। 'এই লোকগুলো এখানে নানান অশুভ জিনিস তৈরি করেছে। এখন ওগুলোকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।'

লোকটা পাগল, ভাবল এরিক। নিজের কাজের মধ্যে এমন ডুবে থাকে যে এর বাইরে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। অথবা তাঁর পরের বইটি বিক্রির এটা একটা কৌশল মাত্র।

'কিন্তু প্রাসাদের দত্যিদানোগুলো তো কৃত্রিম...'

'অবশ্যই। তবে আমি কার্ড বোর্ডের তৈরি কিম্ভূতকিমাকার জিনিসগুলোর কথা বলছি না, বন্ধু, বলছি শয়তানের কথা যাদেরকে আপনারা দেখতে পান না। যারা ওঁৎ পেতে থাকে ছায়ায়। ক্যাসলের ধ্বংসাবশেষের ওপর জাদুঘর তৈরি করেছে কতগুলো গর্দভ। কিন্তু অন্ধকারের প্রাণীরা বহু আগে থেকে ওখানে আস্তানা গেড়ে রেখেছে। ওরা সস্তা ট্রিকস ব্যবহার করে ওদেরকে অপমান করে রাগিয়ে দিয়েছে।'

'ও, আচ্ছা,' বুড়োটা আসলেই পাগল, বুঝতে পারছে এরিক, এর সাথে তর্ক করা বৃথা। এর কথায় পাত্তা না দিলেই হলো।

'সেক্ষেত্রে আপনার সাবধানবাণীর কথা স্মরণে রাখব আমরা।'

'রাখতেই হবে,' বুড়োর কোঁচকানো ঠোঁট রক্তশূন্য। আবার ঘরের চারপাশে চোখ বুলালেন তিনি। 'এ জায়গাটা টাইম বোমার মতো। বিস্ফোরিত হওয়ার অপেক্ষা করছে। শয়তানকে নিয়ে যারা হাসাহাসি করে তাদের কপালে খারাবী আছে। শয়তান তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আপনারা ব্যাপারটা টের পাচ্ছে না? পরিবেশ কেমন থম্ মেরে আছে বুঝতে পারছেন না?'

'জায়গাটা একটু গা ছমছমেই বটে,' এই প্রথম মুখ খুলল কিম। 'আমরা কাল রাতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারিনি। একটা চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে যায় আমার।'

'চিৎকারটা আমিও শুনেছি। আমি আর্তনাদ এবং গোঙানি শুনতে পাই, কানে ভেসে আসে আরও নানান বিচিত্র শব্দ। তবে সেসব শব্দ বা আওয়াজ নকল সেট আপের অংশ নয়। এক সাংবাদিক আছে এ হোটেলে, এক নির্বোধ মহিলা। সে চমকপ্রদ একটা গল্প লেখার নিয়ত করে এখানে এসেছে। ভাবছে রবিবাসরীয় কোনো পত্রিকায় বড় অংকের টাকায় বিক্রি করতে পারবে গল্পটি। আমি তাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পাত্তা দেয়নি আমাকে। তার সাথে আপনাদের বোধহয় পরিচয় হয়েছে?'

'জ্বী, পরিচয় হয়েছে,' স্বীকার করল এরিক। 'গত রাতে, বার-এ। তিনি আমাদেরকে নিয়ে ক্যাসলে যেতে চেয়েছিলেন। তবে ভ্রমণ-ক্লান্তির কারণে যেতে পারিনি।'

'সে রাতের বেলা ক্যাসলে যেতে চেয়েছে?' খাবারের কথা বেমালুম বিস্মৃত হলেন ভ্যালান্স, লক্ষই করলেন না রঙের টাইতে মাখামাখি হয়ে গেছে কমলা কুসুম। 'ইস, কী বোকা! আমি তাকে কত মানা করলাম। কিন্তু সে আমার কথা তো শোনেইনি উল্টো অপমান করেছে।' খালি টেবিলগুলোতে ঘুরে এলো তাঁর দৃষ্টি। 'কোথায় সে?'

'আজ সকালে তার সাথে দেখা হয়নি। বেধহয় নৈশ-অভিযানের ক্লান্তি এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ঘুমাচ্ছে।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুললেন ভ্যালান্স তবে সে মুহূর্তে কিচেনের দরজা খুলে যাওয়ায় বাধা পেলেন। সাদা কোট পরা এক লোক ঢুকল ঘরে। এ লোক সেই ম্যানেজার যার সাথে আগের রাতে কথা বলেছে এরিক। লোকটার ইভনিং ড্রেস অদৃশ্য, সে জায়গা দখল করেছে ওয়েটারের পোশাক।

'গুড মর্নিং,' এগিয়ে এলো সে ওদের দিকে। 'ছুটির সিজন শেষ বলে আমরা একটু স্টাফ শর্টেজে আছি। তার ওপর আবার ওয়েটারটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

ছোট প্যাডে এরিকদের অর্ডার লিখে নিল সে, ঘুরল গোড়ালির ওপর ভর করে, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা।

জর্জ ভ্যালান্সের দিকে ফিরল এরিক। কিন্তু ভদ্রলোক ততক্ষণে টেবিল ছেড়েছেন। হনহন করে পা বাড়িয়েছেন হলঘরের দরজায়। হাঁটার তালে ডিমের কুসুম মাখা টাই তাঁর চেক শার্টে বিচিত্র আঁকিবুকি তৈরি করছে। হলঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন লেখক। দড়াম করে তাঁর পেছনে বন্ধ হলো দরজা। আর্মস্ট্রং দম্পতি একা হয়ে পড়ল ডাইনিংরুমে।

'আমার ভয় করছে,' মুখ শুকিয়ে গেছে কিমের। একটা পেপার ন্যাপকিন মুঠো করে ধরল। 'চলো, এখান থেকে চলে যাই, এরিক। অন্য কোনো হোটেলে গিয়ে উঠি।'

'বোকার মতো কথা বোলো না তো!' বউকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল এরিক। 'আমরা এখান থেকে চলে যাব কোন্ দুঃখে? এক মাথাপাগল সাংবাদিক আর উন্মাদ লেখকের ভয়ে যারা কিনা একটা গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে? নো ওয়ে। নাস্তা সেরে আমরা প্রাসাদ দেখতে যাব। দেখব ওর মধ্যে কী আছে। ক্রাইস্ট, গরমের পুরোটা সময় এখানে হাজার হাজার ভিজিটর এসেছে। শুনলাম ওরা দিন পনেরর জন্য জায়গাটা ট্যুরিস্টদের জন্য বন্ধ করে রেখেছে একটা ফিল্ম কোম্পানির জন্য। ওখানে হরর ছবির শূটিং চলছে। আজ পর্যন্ত এখানে কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি।'

'কিন্তু ওই ম্যানেজার লোকটা আমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে,' বলল কিম।

'ওই লোকটার জন্য তো আর আমরা আমাদের হানিমুনের মজা নষ্ট হতে দিতে পারি না,' হাসল এরিক, তবে যেন অনেকটা জোর করেই।

ম্যানেজারের কথা উচ্চারণ করেছে মাত্র, সে নাশতা নিয়ে হাজির। টেবিলে ধোঁয়া ওঠা বৌল রাখল মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে। 'কাল রাতটা বেশ বাজে গেছে, স্যার। অবশ্য এ এলাকায় শরতের এ সময়টাতে একটু ঝড় বৃষ্টি হয়ই।'

'খুবই বাজে কেটেছে গত রাতটা,' লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

তাকাল এরিক। 'ডাস্টবিনের ঢাকনি গড়ানোর শব্দে কে ঘুমাবে? আমার স্ত্রী আবার কার যেন চিৎকারও শুনতে পেয়েছে।'

'ওহ্,' ম্যানেজারের চেহারায় কোনো ভাব ফুটল না, 'নিশ্চয় বাতাসের শব্দ স্যার।'

'হতে পারে,' এরিক আশা করল কিম কথাটা বিশ্বাস করবে।

'আজ আমরা প্রাসাদ দেখতে যাব।'

'আপনাদের যাত্রা আনন্দের হোক, স্যার...ম্যাডাম।' মুখে আবার সংক্ষিপ্ত হাসি ফোটাল ম্যানেজার। ফিরে গেল কিচেনে।

কিমের শিরদাঁড়ার কাছটা কেমন শিরশির করে উঠল। ও জানে না ওর ভেতরে ক্রমে বেড়ে ওঠা ভয়টাকে আর কতক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারবে। যে যাই বলুক ও নিশ্চিত গত রাতে কেউ চিৎকার দিয়েই উঠেছিল।

তিন

কিছুক্ষণের জন্য কালো মেঘগুলো বিশ্রামে গেল ঝড়ো আকাশের বুক থেকে। তবে নিচু মেঘের ঘন স্তর ছুটে যাচ্ছিল পশ্চিম অভিমুখে। আরেকটা মেঘের খণ্ড ঝুলে ছিল হ্রদের তীরে পাহাড়সারির ওপরে। এদিকে সূর্য জলের মতো স্বচ্ছ, সোনালি আলো ছড়িয়ে চলেছে। মরা পাতা যেন উড়ছিল তুষার ঝড়ের মতো, স্তূপ হয়ে জমে উঠছে রাস্তার কিনারে। অটল গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাসল বা প্রাসাদ, যেন সুরক্ষিত সামরিক একটি ঘাঁটি, আশপাশের সবকিছুর প্রতি ছুড়ে দিচ্ছে চ্যালেঞ্জ। পাঁচশোরও বেশি বছর ধরে টিকে আছে এ প্রাসাদ, অপরাজিত। প্রাকৃতিক ক্ষয় বলতে পাথরের চাঙ্ক কোথাও কোথাও খসে পড়েছে, তবে নিজের গোপনীয়তা সে ফাঁস করতে দেয়নি।

কিম এরিকের গায়ের সাথে সেঁটে আছে, প্রবল বাতাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ভবনের ভেতরে প্রবেশের খুব একটা তাড়া নেই। এরিকই অবশ্য বলেছে তারা বাইরে থেকে ভবন দেখতে শুরু করবে। স্বামীর মতের বিরুদ্ধাচারণ করেনি কিম। যা বাতাস! জোরে কথা বললেও প্রায় শোনা যায় না।

ওদের বাম দিকে প্রাচীন উঠোনের দেয়ালের মাঝখানের ফাঁকে একটা পরিখা। গভীর কালো জল, তীরে নলখাগড়ার ঝোপ। একটা জলকুক্কুট কুইকুই করে ডেকে উঠে ডাইভ দিল পানিতে। যাক তবু জীবনের একটা চিহ্ন তো অন্তত মিলল। পরিখা কতটা গভীর অনুমানের চেষ্টা করল কিম– পাঁচ ছয় ফুট তো হবেই। তীর বেশ খাড়া, কেউ পা ফস্কে পানিতে পড়ে গেলে ওপরে উঠতে বেরিয়ে যাবে জান। অন্ধকার এবং নিষিদ্ধ, বৃত্তাকার পানির এই অংশটুকু প্রাসাদকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যেন রক্ষা করছে তার অশুভ গোপনীয়তা।

হঠাৎ ওরা নিজেদের আবিষ্কার করল একটি চাঁদোয়ার নিচে, দেয়ালটা বাতাসের ঝাপটা থেকে রক্ষা করছে ওদেরকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল কিম,

মুছল চোখের জল। দমকা হাওয়ার হামলা চোখে জল এনে দিয়েছে। ওহ গড, আমাদেরকে কি প্রাসাদের ভেতরে যেতেই হবে?

এরিক ইতিমধ্যে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে, প্যাসেজওয়ের নিচু ছাদে গলিয়ে দিয়েছে মাথা। দেয়াল জোড়া সারিসারি বাতি দেখতে পেল গম্ভীর চেহারার ঘরে। আলো যেটুকু আছে তাতে বোঝা যায় কোথায় যাচ্ছি, তবে অন্ধকার এতে পুরোপুরি দূর হয়নি। কিম দ্রুত পা চালাল সামনে, শক্ত মুঠিতে ধরে রেখেছে স্বামীর হাত। এরিক হয়তো বুঝতে পারবে ওর কলজে কেমন ধুকপুক করছে।

প্যাসেজ হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। কিনারে আলো নেই, পরের বালব্ এবং ওদের মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করছে অন্ধকার। কিছু একটা হালকাভাবে ছুঁয়ে গেল কিমের মুখ, আঠালো এবং ঠাণ্ডা। চিৎকার দিল কিম, থাবা মারল, ফিনফিনে জালের মতো কিছু একটা জড়িয়ে গেল আঙুলে।

'ভয়ের কিছু নেই,' স্ত্রীকে অভয় দিল এরিক, হাত বাড়িয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য কিছু একটা সরিয়ে দিতে লাগল। 'নকল মাকড়সার জাল, নাইলনের তার।' হেসে উঠল সে। কিমের গা থেকে ছাড়িয়ে নিল জাল।

'অ্যাক থু! কী জঘন্য,' আশপাশে দানব কোনো মাকড়সা ওঁৎ পেতে আছে কিনা কে জানে। রাবার কিংবা প্লাস্টিকের মাকড়সা দেখলেও ও ভয় পাবে।

'এরিক, আমি এখানে আর থাকব না,' বলল কিম। 'চলো, যাই।'

'বোকার মতো কথা বোলো না,' বলল এরিক। 'এখানকার সবকিছুই নকল। তোমার ওপর কোনো কিছু হামলে পড়বে না। আহত হবার সম্ভাবনা থাকলে বহু আগেই কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লোকে মামলা ঠুকে দিত।'

মুখ বেজার করে এরিকের সাথে চলল কিম। কয়েক গজ সামনে এক সারি সিঁড়ি। নেমে গেছে নিচের দিকে। একটা সাইন বোর্ড টাঙানো। সাদা কাগজে লাল অক্ষরে লেখা 'THE TORTURE DUNGEONS' দুর্বলচিত্তদের জন্য নয়। এখানকার কিছু জিনিস অনেকের কাছে ভীতিকর মনে হতে পারে। যদি তাই হয়, তাহলে বামে মোড় নিন। আপনাকে কিন্তু সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

'আমরা কি বামে যাব?' কিমের ফিসফিসানি ওদের বাম দিকের প্যাসেজে প্রতিধ্বনি তুলল। বামে...বামে...বামে।

'আমি জায়গাটাতে একবার উঁকি দিতে চাই,' বলল এরিক। 'ইচ্ছা হলে

এখানে অপেক্ষা করতে পার। আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরব।'

'না!' কিম এরিকের হাত আঁকড়ে ধরল। 'না। আমি এখানে একা থাকতে পারব না।'

'তাহলে আমার সাথে চলো,' ওকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলল এরিক। না গিয়েও উপায় নেই; সে সত্যি এখানে একা থাকতে পারবে না।

'ওহ্, মাই গড!' কিম স্বামীর মোটা উলেন সোয়েটারে মুখ লুকালো। দেয়ালে একটা কংকাল ঝুলছে। খড়খড় শব্দে বাজছে প্লাস্টিকের সাদা হাড়, বড় বড় দাঁত বের করে হাসছে, যেন বলছে টর্চার চেম্বারে স্বাগতম। দ্যাখো, ওরা আমার কী দশা করেছে!

'এগুলো সব রদ্দি জিনিস!' বিরক্তি প্রকাশ পেল এরিকের কণ্ঠে। 'এরচেয়ে ভালো কিছু দেখতে না পেলে টিকেটের টাকা ফেরত চাইব আমি।' গুমোট, ভীতিকর পরিবেশ হালকা করার জন্য মশকরা করছে এরিক যাতে কিমের ভয়টা কেটে যায়। তবে সত্যি যদি ভয়ের কিছু না থাকে...আছে তো!

পাথরের মেঝেতে কৌশলে স্প্রিং লাগিয়ে রাখা হয়েছে। কেউ ওতে পা দেয়া মাত্র ছায়াঘেরা চোরকুঠরি থেকে ঝট করে বেরিয়ে আসে পাতালঘরের প্রহরী! মুখোশ পরা, পেশীবহুল টর্চারারকে দেখে লোকে লাফ দিয়ে ওঠে, তারপর হেসে ফেলে। কিন্তু একে দেখে মোটেই হাসি আসছে না। এ বিকলাঙ্গ বামন কিংবা রাক্ষস নয়, নয় হরর উপন্যাসে পড়া এক চোখো দানব; এসবের যে কোনো একটাকে দেখলেই হাসি পেয়ে যেত। এ সাধারণ এক লোক, পরনে শতছিন্ন পোশাক, তার চেহারায় ফুটে আছে নির্দয় এবং শয়তানী, মুখের হাসি যেন নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষ্য বহন করছে। ভয়ঙ্কর এক জোড়া চোখ, যেন সত্যি সত্যি ওদেরকে দেখছে, আধো আলোয় জ্বলজ্বল করছে। নাকের ফুটো দিয়ে পিচ্ছিল কিছু একটা ঝরে পড়ছে, একটা হাত সামনের দিকে বাড়ানো। হাতে কিছু একটা ধরে আছে লোকটা, নীরবে যেন হুকুম করছে, 'এসো...দ্যাখো!'

চিৎকার দেয়াটা যেন কিমের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এবং এবারও চিৎকার দিল সে। খুব পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও–সকালের নাস্তার পুরোটা বমি করে প্রায় ভাসিয়ে দিচ্ছিল স্বামীকে। চট করে কদম পেছাল এরিক, কিমকে ওর পেছনে আড়াল করার চেষ্টা করল। বাড়ানো হাতটা আরও দু'এক ইঞ্চি প্রসারিত হলো ওদের দিকে, আঙুলগুলো ছড়ানো, হাতের

তালুতে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাংসল, রক্তাক্ত, জ্যান্ত একটা জিনিস।

ওরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে, ঘোর লাগা আতংকের চোখে হাতটার দিকে তাকিয়ে আছে। ক্যারোলিন চাডারটনের কণ্ঠ বাড়ি মারছে এরিকের মস্তিষ্কে। 'ওখানে একটা লোক আছে। তাকে দেখলে হানিমুনের মজাই যাবে নষ্ট হয়ে...

লোকটার হাতে ভিক্টিমের শরীর থেকে ছিঁড়ে আনা প্রত্যঙ্গ অশ্লীল এবং কদর্য লাগছে। ভৌতিক কাঠামোটা লাফ মেরে পিছিয়ে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকার কোনো কুঠরীতে, ওঁৎ পেতে রইল নবাগত আরও কাউকে আতংকিত করে তোলার জন্য।

'এরিক, আমি আর এসব সহ্য করতে পারছি না।'

'দৃশ্যটা অবশ্য বীভৎসই ছিল,' স্বীকার করল এরিক। ও নিজেও কাঁপছে। 'পাতাল ঘরে শুধু একবার উঁকি দেব এবং...'

'আর না, প্লিজ।'

'ক্যারোলিন চাডারটন এখানে ঠ্যাং ভেঙে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে কিনা একটু দেখে যাই,' অবশ্য মহিলার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পেছনে হাজারটা কারণ থাকতে পারে। এমন হওয়াটাই বরং স্বাভাবিক যে সে নিজের বেডরুমে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

এরিক যা ভেবেছিল তার চেয়ে আয়তনে অনেক বড় প্রাসাদের অভ্যন্তরে। এদিকের দেয়ালগুলো কালো এবং অমসৃণ। মেঝেতে ছিটিয়ে রয়েছে ছিন্নভিন্ন লাশ, শরীর এবং কংকাল।

একটি কাঁটাঅলা চাকা ঘুরছে তার অক্ষদণ্ডে, ওতে বেঁধে রাখা মানব শরীর দৃষ্টির গোচরে আসা মাত্র চিৎকার দিতে চাইল কিম। ওটা এক মহিলা, সুন্দরী এবং অভিজাত। মুখে শুকিয়ে আছে রক্ত। তার একটা কাটা বক্ষ ঝুলছে, তাতে ফিতে বাঁধা, পেট ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে, ফাঁক দিয়ে চুইয়ে পড়ছে রক্ত। গোঙাচ্ছে মহিলা, প্রায় অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। এরিক সাহস করে মহিলার ম্লান নীল চোখে তাকাল, তাতে বাঁচার আকুতি। এরিকের ইচ্ছে করল এক লাফে সামনে বাড়ে, চাকার বাঁধন খুলে মুক্ত করে মেয়েটিকে। যদিও যুক্তিবাদী মন বলছে ওটা একটা ডামি, গায়ের মাংস রাবারের, শরীরের মধ্যে ফিট করা টেপ রেকর্ডার থেকে বেরিয়ে আসছে যন্ত্রণাকাতর গোঙানি, আর রক্তটা ঘন তরল কিছু। অবশ্য ব্যাপারটা বিশ্বাস হতে চাইল না এরিকের। তবে নাক গলানোর সাহস হলো না। সে অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখল মুখ, চট করে মহিলার পাশ কাটাল।

কংকাল এবং লাশ দেখে বোঝা গেল এরা পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে অনেক আগেই। এরিক কিমের কোমর জড়িয়ে রেখেছে এক হাতে, স্বামীর সোয়েটারে মুখ ডুবিয়ে রেখেছে কিম। নীরবে আকুতি জানাচ্ছে, জলদি এখান থেকে চলো।

বিকৃত শরীরগুলো দেখে এরিকের গা গোলাচ্ছে। এক জোড়া অপুষ্ট, দুর্বল পা দাপাদাপি করছে দেয়ালে, শরীর দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার গ্রাস করে রেখেছে ঊর্ধ্বাংগ। ভীতিকর আর্তনাদ করছে পা জোড়ার মালিক। এমন সময় ওদের পথ আটকে দাঁড়াল ভ্যাম্পায়ার।

সিনেমায় দেখা সাধারণ চেহারার ভ্যাম্পায়ার সে, লম্বা, অভিজাত। গায়ের আলখেল্লা বাতাসে পতপত করে উড়ছে, ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট, বেরিয়ে পড়েছে শ্বদন্ত, ফ্যাকাশে চেহারা, ভাঁটার মতো জ্বলছে একজোড়া লাল চক্ষু। ভ্যাম্পায়ার হঠাৎ চট করে সরে গেল একপাশে, আঙুল তুলে পেছন দিকটা দেখাচ্ছে। ওখানে টিমটিমে বৈদ্যুতিক বাতি ছায়া তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আঙুলের নির্দেশিত দিক লক্ষ করে তাকাল। আরেক সারি পাথরের সিঁড়ির নিচে কুণ্ডুলি পাকিয়ে পড়ে আছে একটা শরীর। রক্তাক্ত। ওটা নিশ্চয় ডামি, বারবার কথাটা নিজেকে শোনাল এরিক। এটা আরেকটা ট্রিকই হবে। সে শরীরটাকে দেখছে। শুরু করল পা থেকে। পায়ে চকচকে জুতো, তবে একটি পাটি অদৃশ্য। তবে খালি পা-টা বিশ্রীভাবে বেঁকে আছে। সম্ভবত ভেঙে বা মচকে গেছে। গভীর একটা কাটা দাগ পায়ে। রক্ত ঝরছে। গোড়ালি মোটামুটি সুগঠিতই বলা যায়, যদিও তারপর স্থূল হতে শুরু করেছে পদযুগল, টুইডের স্কার্টের কিনারার নিচে জমেছে অতিরিক্ত চর্বি...

হাত মুঠো করা, সম্ভবত প্রচণ্ড বেদনায়, আঙুলের গাঁটগুলো সাদা হয়ে আছে। সবুজ সুতির জ্যাকেটে কাদা, সিঁড়ি দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ার সময় ময়লা লেগেছে। কুঁচকেও গেছে, পকেট থেকে বেরিয়ে আছে টিস্যু।

ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে এরিকের হৃৎপিণ্ড, তালুতে যেন ড্রামের বাড়ি পড়ছে। ওদিকে আমি আর তাকাব না, ওটা একটা ডামি, মনে মনে বলল এরিক। ওটা প্লাস্টিকের রক্তাক্ত একটা শরীর ছাড়া কিছু নয়। মুখটা যারই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সে কিমের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাইল। দৃশ্যটা কিমকে দেখতে দিতে চায় না। ফর ক্রাইস্টস শেক, কিম, তাকিয়ো না। অবশ্য কিম তাকালও না। সে এখনও মুখ ডুবিয়ে রেখেছে স্বামীর জামার ভেতরে।

এবার অবয়বটা দেখতে পেল এরিক। মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে সোনালি চুলে; নীল চোখ জোড়া বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে, মরা অক্ষি গোলকে এখনও ফুটে আছে আতংক। খাড়া নাকের ফুটো ছড়িয়ে রয়েছে, যেন নিশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে। তীব্র ভয় এবং যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা, হাঁ হয়ে আছে মুখ, রিগর মর্টিসের প্রভাবে শক্ত। এখনও নীরব চিৎকার করছে।

লাশটাকে না চেনার ভান করল এরিক। মনকে আবার বোঝাতে চাইল ওটা রক্তাক্ত ডামি ছাড়া কিছু নয়। না, ওটা ডামি নয়, মন বলল এরিককে। তুমি ভালো করেই জানো ও কে! আড়চোখে দেখল ভ্যাম্পায়ারের মূর্তিটি, আলখেল্লা পরা শয়তানের প্রতিমূর্তি এখনও উঁচিয়ে আছে আঙুল। আড়াল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওকে নিয়ন্ত্রণ করা যন্ত্রের সাহায্যে আস্তে আস্তে মিশে গেল অন্ধকারে।

এরিক আবার তাকাল ভিক্টিমের দিকে। ওর শরীর হঠাৎ কাঁপতে লাগল থরথর করে। কাঁপুনি টের পেল কিম। মুখ তুলে চাইল। ঘুরল এবং দেখে ফেলল ভয়ংকর দৃশ্যটি। তবে এবারে আর চিৎকার দিল না, বোধহয় আতংকের সীমা ছাড়িয়েছে মেয়েটি।

'ও...ও...' কথা বলতে চাইল কিন্তু রা ফুটল না মুখে। শব্দগুলো উচ্চারণ করতে চায় না।

'হ্যাঁ,' অবশেষে বলল এরিক। অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এলো কণ্ঠ। 'ও-ই। ওটা ক্যারোলিন চেডারটন।'

চার

পুলিশের সাথে আর্মস্ট্রং দম্পতির জেরা শেষ হতে হতে সন্ধ্যা ছ'টা বেজে গেল। সহানুভূতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে জেরা চললেও ওরা খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। প্রাসাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা ওরা জীবনেও ভুলবে না।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাচিন সিনিয়র অফিসার। অবসরে প্রত্যন্ত গ্রামে মাছ ধরে সময় কাটাতে পছন্দ করে সে। টুইডের সুট, মাথায় জীর্ণ হ্যাট, টকটকে লাল গাত্রবর্ণ এবং মুখে সবসময় ঝুলে থাকা পাইপে তাকে গাঁয়ের কোনো বাসিন্দাই মনে হয়, জাঁদরেল গোয়েন্দা নয়। মাচিন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং ধূর্ত এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা। তার অন্তর্ভেদী চোখ কোনোকিছুই এড়িয়ে যায় না। পেশীবহুল একটা শরীরের অধিকারী মাচিন, ভূত-প্রেতে একদমই বিশ্বাস নেই। সে অত্যন্ত বাস্তববাদী মানুষ, তার শত্রুরা সব রক্তমাংসের। এবং এদেরকে সে ডরায় না।

এরিক এবং কিমের দেয়া স্টেটমেন্ট লিখে নিল সে, তারপর ধীরে ধীরে পড়ে শোনাল। শেষে বলল, 'আমার ধারণা মিসেস চাডারটন সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেছেন। এমন দুর্ঘটনা যে কারও জীবনে ঘটতে পারে। তবে শুধু রাতের বেলাতেই যে এমনটি ঘটবে তা নয়। তবে এ মৃত্যুতে আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাচ্ছি না, অন্তত: এ মুহূর্তে নয়...'

'কিন্তু...কিন্তু...এর সাথে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার কি জড়িত থাকতে পারে?' নার্ভাস গলায় প্রশ্ন করল কিম।

'সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এবং আমরা সে সম্ভাবনা উড়িয়েও দিচ্ছি না।' কর্মকর্তা আবার হাসল। 'তবে এ মুহূর্তে এরকম কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি রিপোর্ট সাবমিট করে আবার আসব। সেক্ষেত্রে,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে খুকখুক কাশল। 'আমি খুশি হবো যদি আরও দু'একটা দিন আপনারা এখানে থেকে যান।'

'আমরা হপ্তাখানেকের জন্য ঘর ভাড়া করেছি,' চট করে বলল এরিক।

জিভ দিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে ঠোঁট চাটল কিম, 'আ...আমি এখানে থাকতে চাইছি না... অন্য কোনো হোটেলে যদি যাই...

'কাছাকাছি কোনো হোটেল থাকলে আপনাদেরকে সেখানে যেতে বলতাম,' থুতনি চুলকাল মাচিন। 'কিন্তু বছরের এ সময়ে বেশীরভাগ হোটেল থাকে বন্ধ। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে ট্যুরিস্ট ব্যবসার মন্দাকাল। হ্রদের ওপারে একটা উইকেন্ড কটেজ আছে বটে তবে ওতে দেখলাম 'বিক্রি হইবে', সাইনবোর্ড ঝুলছে। কাজেই ওখানে গিয়েও খুব একটা লাভ হবে না।'

'আমাদের এখানে কোনো অসুবিধে হবে না।' এরিক কিমের হাতে একটা চাপ দিল।

'একটা কথা,' আবার নোট বুকে তাকাল ইন্সপেক্টর। 'আপনারা দু'জনেই বলেছেন মিসেস চাডারটনের সাথে ভ্যালান্স নামের লোকটির একটা রেষারেষি চলছিল।'

'মারাত্মক কোনো রেষারেষি নয়,' এরিক মনে মনে ভাবল কেন যে ও কথাটা বলতে গেল। আসলে মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে। 'ওরা দু'জনেই লেখক। পরস্পরকে ঈর্ষা করতেন।'

'ও, আচ্ছা,' পুলিশ কর্মকর্তা তার ফোল্ডার বন্ধ করল।

'আমরা চোখ-কান খোলা রাখব। আপনারা ইচ্ছে করলে এই ফাঁকে পাহাড়-টাহাড় ঘুরে আসতে পারেন। এ বিষয়ে তদন্ত শেষ করার আগে আবার আপনাদের সাথে একটু বসতে চাই।'

'ঈশ্বর, মনে হচ্ছে এখানে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি,' হাত মোচড়াচ্ছে কিম, জানালা দিয়ে বাইরের ঝড়ো রাত দেখছে, নিচে ডিনারের ঘন্টি পড়ার শব্দে চমকে উঠল। 'এখানে আরও কয়েকটা রাত থাকতে হবে মনে করলেই হিম হয়ে যাচ্ছে বুক।'

'শোনো,' এরিক কিমকে কাছে টেনে নিল, চুমু খেল। 'জায়গাটা যত খারাপ ভাবছ ততটা খারাপ নয়। ওটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। মনে আছে আমরা একটা লরির পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক বুড়ি লাফ দিয়ে পড়েছিল গাড়ির সামনে?'

'ইস্, ওই বুড়ির কথা জীবনেও ভুলব না আমি। তার চিৎকার এখনও মাঝে ঘুমের মধ্যে শুনতে পাই আমি।'

'প্রাসাদের পাতাল ঘরের চেয়েও ভয়ঙ্কর ঘটনা ছিল ওটা। ওটা ছিল সত্যিকারের হরর। মিসেস চাডারটন সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরেছে।'

'ওই ভ্যাম্পায়ারটা...'

'ওটা ছিল প্লাস্টিকের। হুট করেই ওটাকে ওখানে হাজির করা হয়। ভ্যাম্পায়ারের সাথে অ্যাক্সিডেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভুলেও এই প্রাসাদের ধারে কাছে ঘেঁষছি না।'

'আচ্ছা, তোমাকে যেতে হবে না।'

'কিন্তু তুমি যাবে, না?'

জবাব দিল না এরিক। বিষয়টি নিয়ে সে এখনও কিছু ভাবেনি। বউর কাছে মিথ্যা বলতে চায় না এরিক।

'তুমি আবার ওখানে যাবে, না, এরিক? তোমাকে আমি চিনি তো। এখানকার সমস্ত হরর শো না দেখা পর্যন্ত তোমার মনে শান্তি নেই।'

'যাওয়ার আগে একবার হয়তো উঁকি দিতে পারি। তবে তোমাকে আমার সাথে আসতে হবে না।'

'আমি জানতাম,' স্বামীর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কিম। 'তুমি ওই ইন্সপেক্টরের মতোই বলবে যে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল এবং এরকম দুর্ঘটনার শিকার যে কেউই হতে পারে। কিন্তু রাতের বেলার ওই চিৎকারটার কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়। আমি পুলিশকে চিৎকারের কথা বলেছি।'

'এবং সে বলেছে ওটা যদি বাতাসের আর্তনাদ না হয়ে থাকে তো ক্যারোলিনের চিৎকারও হতে পারে। ক্যারোলিন ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাবার সময় চিৎকার দিয়ে উঠেছিল। যদিও পাতালঘর থেকে চিৎকার শোনাটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'তোমাকে কিছু বোঝানো খুব মুশকিল,' বিছানা থেকে একটা পনচো তুলে নিল কিম। 'চলো, ডিনার সেরে আসি। যদিও খেতে মোটেই ইচ্ছে করছে না।'

জর্জ ভ্যালান্স ইতিমধ্যে চলে এসেছেন ডাইনিংরুম। শব্দ করে টমেটো সুপের বাটিতে চুমুক দিচ্ছেন। তাঁর মাথার চুল এলোমেলো, গভীর ভাবনায় ডুবে গেছেন। এরিক এবং কিম ডাইনিংরুমে ঢুকেছে, লক্ষ করলেন না। তবে ওরা চেয়ার টেনে বসার শব্দে ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন।

'হ্যালো,' পুরু কাচের চশমার ফাঁক দিয়ে আর্মস্ট্রং দম্পতির দিকে তাকালেন ভ্যালান্স। যেন ওদেরকে দেখবেন বলে আশা করেননি। 'কী সব যে ঘটছে এখানে। পুলিশকে একটা ঘণ্টা ধরে বোঝানোর চেষ্টা করলাম গত রাতে আমি নিজের বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলাম এবং ওই বোকা মহিলাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিইনি। মহিলা কি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল নাকি কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে? হা হা। বেশ, যদি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া হয়, ধরে নিতে হবে ওটা শয়তানের কাজ তাহলে ওদেরকে শয়তানের সাথে মোকাবেলা করতে হবে, কী বলেন?'

'ব্যাপারটা সেরকম কিছু না।' ক্রুদ্ধ গলায় বলল এরিক। বুড়ো উল্টোপাল্টা কী বলছে। 'মহিলা পা পিছলে পড়ে গেছে। পুলিশের তা-ই ধারণা।'

'পুলিশের এই লোকগুলো মাথামোটা,' সুপের চামচে আবার সুড়ুৎ করে শব্দ হলো। 'এদেরকে কিছু বলে লাভ নেই।'

'আপনার কি ধারণা মহিলাকে ভ্যাম্পায়ারটা মেরে ফেলেছে?' তীব্র ব্যঙ্গাত্মক স্বরে প্রশ্ন করল এরিক।

'ওটাকে ব্যবহার করার প্রয়োজন ওদের হয়নি। যদিও অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে কাজটা সে-ই করেছে। মহিলা যেখানে পড়ে ছিল, ওই জায়গা থেকে ভ্যাম্পায়ার ছিল অনেক দূরে। সে অন্যপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল। অপেক্ষা করছিল মহিলা বড় চাকাটার ওপর কখন আছড়ে পড়ে।'

'সে...' থেমে গেল কিম। এরিক টেবিলের নিচ থেকে ওর পায়ে ধাক্কা মেরেছে।

'ওরা খুব চালাক,' বলে চললেন ভ্যালান্স। 'পুলিশকে পর্যন্ত বোকা বানিয়েছে। হা হা। তবে আমাকে বোকা বানাতে পারেনি। এখন থেকে চোখ কান খোলা রেখে চলাফেরা করতে হবে। আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো বলব আপনারাও সাবধানে চলাফেরা করবেন। ওরা যদি আপনাদের ঘাড় মটকে দিতে চায় তো কিছুই করতে পারবেন না।'

'মি. ভ্যালান্স,' চাবুকের মতো ঝলসে উঠল এরিকের গলা। 'আপনি ছেলেমানুষী এবং হাস্যকর সব যুক্তি দিয়ে বোকার মতো আমার স্ত্রীকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন। মিসেস চাডারটন যেখানে পড়ে ছিল, ভ্যাম্পায়ার সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে ছিল। কাজেই আপনার যুক্তি ধোপে টেকে না। যা হোক, আমি খুব খুশি হব যদি খাওয়ার সময় এসব ফালতু কথা বলা থেকে বিরত থাকেন।'

'আপনারা কি অর্ডার দেবেন, স্যার, ম্যাডাম?'

লাফিয়ে উঠল ওরা। ভূতের মতো নিশব্দে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যানেজার টেরই পায়নি। ভাবলেশশূন্য মুখ, যেন লেখকের সাথে ওদের তর্ক শুনতেই পায়নি। ভ্যালান্স আবার সুপ খেতে শুরু করলেন। এবারে আরও শব্দ করে।

'আমাদের জন্য সুপ এবং চিকেন সুপ্রিম নিয়ে আসুন,' বলল কিম। দুটো খাবারই কিমের বেশ পছন্দ। তাছাড়া ম্যানেজার ব্যাটা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেলেই বাঁচে। জর্জ ভ্যালান্স চুপ মেরে গেছেন। এখন যদি শান্তিতে একটু খাওয়া যায়। হানিমুনের বারোটা বাজতে চলেছে। ওরা আগামী দু'একদিন তো ঘর থেকেই বেরুতে পারবে না। ও যদি কিমকে বোঝাতে পারে যে গোটা হরর শো আসলে বানোয়াট, তাহলে হয়তো কিমের ভয়টা কেটে যাবে। ওরা উপভোগ করতে পারবে সময়। ক্যারোলিন চাডারটন জাহান্নামে যাক। বুড়িটা সিঁড়ি বেয়ে পা পিছলে মরার আর সময় পেল না! কিন্তু মনকে ও যতই বোঝানোর চেষ্টা করছে, মন বুঝতে চাইছে না। কোথাও খচখচ করছে সন্দেহের কাঁটা!

আজকের রাতটা মধুচন্দ্রিমার রাতের মতো নয়, মনে মনে ভাবল এরিক আর্মস্ট্রং। বাতি নেভানো। কিম ওর পাশে। শক্ত এবং আড়ষ্ট। বার দুই এরিক চেষ্টা করেছে বউ'র সাথে কথা বলতে। হা হুঁ ছাড়া জবাব পায়নি। কিম আসলে শিঁটিয়ে আছে ভয়ে। এরিক প্রাণপণ চেষ্টা করেছে ওর মন থেকে ভয় দূর করতে। পারেনি। জানে আজ ঘুমাবে না কিম। ঘুম আসবে না এরিকেরও। ওরা শুধু শোনার ভান করছে। শুনবে বাতাসের আর্তনাদ, বৃষ্টির কান্না, আর কিছু না শোনার চেষ্টা করবে, ভাববে অন্য কোনো শব্দের কোনো অস্তিত্ব নেই।

হঠাৎই পড়ে গেছে বাতাস, যদিও ব্যাপারটা মাত্র টের পেল এরিক। জানালায় অনবরত মাথা ঠুকছে না বৃষ্টির ফোঁটা। শুধু ছলছল জলের আওয়াজ। বৃষ্টির জল নিচের প্যাশিওতে আছড়ে পড়ছে। ওরা কোথায় নববিবাহিতের মতো পরস্পরকে আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠবে তা না, বদলে সংসার জীবন ক্লান্ত দম্পতিদের মতো মুখ গোমড়া করে শুয়ে আছে। এ জন্য জর্জ ভ্যালান্সই দায়ী। ওই লোকটা ওইসব আজগুবী গল্প না বললে কিমের মুডটা এরকম অফ হয়ে যেত না।

প্রাসাদ নিয়ে কথা বলার চাইতে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। ওরা যে যা

নিয়ে ভাবছে তা নিয়ে জোরে জোরে কথা বলাই ভালো। নীরবতা মোটেই সহ্য হচ্ছে না।

'ম্যানেজারের নাম উইভার,' বলল এরিক। 'সিমন উইভার।'

'শুনে প্রীত হলাম,' শুকনো গলা কিমের। 'কী করে জানলে?'

'রিসেপশনের ব্রুশিয়ারে লেখা।'

আবার নীরবতা ভংগ করল কিম। 'একটা কথা ভাবছিলাম। ভ্যালান্স বললেন ভ্যাম্পায়ারটা চাকার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ আমরা দেখলাম...'

'ওই পাগলটার কথা বাদ দাও। সে যাই বলুক পাত্তা দিও না। তার মাথার কোনো ঠিক নেই। ক্যারোলিন এখন আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কাজেই সে যদি একটি বেস্ট সেলার তৈরির জন্য মন গড়া নানান কাহিনী বানাতে থাকে, কে তা খতিয়ে দেখতে যাবে?'

'এটা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি,' আকস্মিক স্বস্তি ফুটল কিমের কণ্ঠে। 'লোকটা জড়বুদ্ধি নয়, খুব চালাক।'

'আমি কাল আরেকবার পাতালে ঢুঁ মারতে চাই।'

'না, এরিক। প্লিজ যেয়ো না।'

'তোমাকে নিয়ে যাব না। তুমি লাউঞ্জে বসে টিভি দেখো। নিচে ভয়াবহ কিছু নেই, ভুতুড়ে কিছু ব্যাপার ছাড়া।

'তোমাকে বাধা দিয়েও লাভ হবে না জানি। কিন্তু গিয়ে কী লাভ হবে?'

'আমি দেখতে চাই ভ্যাম্পায়ারটাকে কোনো কারণে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে কিনা। ভ্যালান্স যদি কোনো চালাকির আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাকে ধরে ফেলব হাতেনাতে।'

'ওটা পুলিশের কাজ,' কিম ফিরল এরিকের দিকে। 'তোমার নয়।' আর ইন্সপেক্টর লোকটাকে আমার চালাক-চতুরই মনে হলো।'

'হতে পারে, তবু আমি একবার দেখতে চাই।'

'আ...এক মিনিট, কোনো শব্দ শুনেছ?'

ওহ, ঈশ্বর আবার! আমি মাত্র ওর মন থেকে ভয় দূর করার চেষ্টা করছি, ভাবল এরিক। দম চেপে কান পাতল ও। ছরছর করে এখনও জল ঝরছে ছাদ থেকে, বাতাসের শব্দও নেই। কিছুই নেই...'

'আবার শুরু হয়েছে। ওহ, এরিক, কী ওটা?' কিম খামচে ধরল স্বামীর হাত। 'আমি আর সহ্য করতে পারছি না...'

'চুপ করো। আমাকে শুনতে দাও।'

খসখস শব্দ করে কিছু একটা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। থামল। আবার শুরু হলো গড়ানো। শব্দটা কী বোঝার চেষ্টা করল এরিক। নানান কারণে শব্দটা হতে পারে। তবে শব্দটা ঘরের ভেতরেই হচ্ছে এবং খুব বেশী দূরেও নয়।

কীসে শব্দ করছে? কুকুর? উচ্ছিষ্ট খুঁজছে? হঠাৎ চমকে উঠে এরিক আবিষ্কার করল শব্দটা করিডর থেকে আসছে, ওদের রুমের কাছাকাছি। কিছু একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে?

দরজার ঠিক বাইরে এসে থেমে গেল শব্দটা। কিম স্বামীর গায়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। আবার শুরু হলো ওটা। করিডরে নখ দিয়ে যেন কিছু আঁচড়াচ্ছে। শব্দটা ক্রমে বেড়ে চলল, বাড়ছে, বেড়ে যাচ্ছে। তারপর কমে এলো শব্দ। ওটা যাই হোক দরজার ধারে এসেছিল এবং তারপর শরীরটাকে টেনে টেনে নিয়ে চলে গেছে।

'ওটা বোধহয় কোনো মানুষ,' দম বন্ধ করে বলল এরিক। 'পশমি চটি পায়ে কেউ ঘষটে ঘষটে হেঁটেছে করিডরে। তাই অমন শব্দ হয়েছে। তবে ভয় পাবার কিছু নেই। হোটেলের করিডরে বহু লোক এরকম হাঁটাহাঁটি করে।'

'তবে আমাদের হোটেলে একজন অতিথি এবং একজন ম্যানেজার ছাড়া কেউ নেই।' বলল কিম। 'কাজেই ওটা হয় উইভার হবে নয়তো ভ্যালান্স। দাঁড়াও, কীসের গন্ধ ওটা?'

নাক টানল এরিক। বলল, 'তামাকের গন্ধ। টার্কিশ। বুড়ো ভ্যালান্স। সে-ই চটি পায়ে ঘসর ঘসর শব্দ করে হেঁটেছে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে। কিন্তু লোকটা যাচ্ছে কোথায়? তার ঘরতো ওপর তলায়। আর এ করিডরের শেষ মাথার সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। নিচতলায় যাওয়ার দরকার হলে তার তো এখানে আসার দরকার ছিল না।'

'ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে বোধহয়,' হেসে ফেলল কিম। 'যতই ভূতের গল্প বলুক আর তামাকের বিশ্রী গন্ধ ছড়াক, আমার মনে হয় না লোকটা ভয়ানক কিছু।'

বউর মুখের হাসির শব্দ শুনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এরিক। জর্জ ভ্যালান্স জাহান্নামে যাক। তাতে ওদের কী? এখন মনে একটু শান্তি এসেছে। এখন কিমের সাথে প্রেম করা যায়।

পুলিশের ইন্সপেক্টরের আচরণে খুবই বিরক্ত জর্জ ভ্যালান্স। লোকটা তাঁর কোনো কথা শুনতেই চায়নি। বারবার জিজ্ঞেস করছিল গত রাতে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন। লোকটা যেন ভ্যালান্সকে সন্দেহ করছিল।

ভ্যালান্সের কোনো সন্দেহই নেই শয়তান হত্যা করেছে ক্যারোলিন চাডারটনকে। সে শয়তানের শক্তিকে পরোয়া করেনি এবং কোনোরকম প্রটেকশন ছাড়াই তাদের আস্তানায় প্রবেশ করেছিল। কপালে যা ছিল তাই ঘটেছে। অন্ধকারের শক্তি একদিক থেকে জর্জ ভ্যালান্সের একটা উপকারই করেছে। কিন্তু তাঁর কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না। ওই তরুণ দম্পতিও না। নিজের মঙ্গলের জন্যই মেয়েটির উচিত ছিল ভ্যালান্সের কথা শোনা। কিন্তু ওর স্বামীটা বারবার তাঁকে বাগড়া দিয়েছে, ভ্যালান্সকে কথা বলতে দেয়নি। তাঁকে, জর্জ ভ্যালান্সকে, যিনি কিনা ভূতের ওঝা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিমান। লোকটা তাঁর 'ভুতুড়ে প্রাসাদ' বইটি পড়েছে। তারপরও তার ওরকম আচরণ মেনে নেয়া যায় না।

জর্জ সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে চলে এলেন। জানালা দিয়ে অন্ধকার, বৃষ্টিভেজা রাতের দিকে তাকালেন। মুঠো পাকালেন তারপর দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিলেন জানালার গরাদে। আবারও ঘুসি মারলেন। প্রচণ্ড রেগে গেলে রাগ কমাতে এভাবেই নিজেকে শারীরিক কষ্ট দেন ভ্যালান্স। দশ মিনিট পরে আস্তে আস্তে রাগ পড়ে এলো তাঁর। তিনি কড়া গন্ধঅলা একটি সিগারেট জ্বালালেন, বুক ভরে ধোঁয়া নিলেন। তারপর যুক্তি দিয়ে পুরো বিষয়টি বিশ্লেষণ শুরু করলেন।

পাতাল ঘরে যাবেন তিনি। স্বচক্ষে দেখে আসবেন ভ্যাম্পায়ারটার অবস্থান। ওটার তো টর্চারের চাকার কাছে থাকার কথা; ওটা সিঁড়ি গোড়ায় কী করছিল? ওটাকে কি এখন প্রাসাদের প্রাচীন বাসিন্দা স্বয়ং শয়তান নিয়ন্ত্রণ করছে? হয়তো বা। কিন্তু পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী মৃত মহিলার ঘাড়ে ভ্যাম্পায়ারের কামড়ের কোনো চিহ্ন ছিল না।

জর্জ তাঁর অগোছালো সুটকেস খুললেন (তাঁর সুটকেস সবসময়ই অগোছাল থাকে। কারণ সুটকেসে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখাটা তাঁর কাছে সময়ের অপচয় মনে হয়। কারণ একবার জিনিসপত্র গোছাও, বেরিয়ে পড়ো, আবার ফেরার পথে একই কাজ করো– ওহ্, অসহ্য!) পেয়ে গেলেন দরকারি জিনিসগুলো: রুপোর একটি ক্রস, রসুনের মালা এবং তাঁর প্রিয় কুকুরের কানের মতো সুচালো প্রার্থনা গ্রন্থ। শয়তান তাড়াতে এগুলোই

যথেষ্ট। তিনি এসব দিয়ে আগেও ভূত তাড়িয়েছেন। বিখ্যাত বই 'হন্টেড ক্যাসলস' লেখার সময় তাঁকে একবার ভূত তাড়াতে হয়েছিল....

রাত বারোটা পঁচিশ মিনিটে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন জর্জ। পরনে বহুবার ব্যবহৃত নরফোক জ্যাকেট, পায়ে চটি। চটিতে হিল নেই। পা ঘষটে ঘষটে হাঁটেন জর্জ। সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন তিনি। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওই যুবক, যে নিজেকে সবজান্তা বলে মনে করে, সে যা জানে না তার মধ্যেও নাক গলাতে পারে। এরিক আর্মস্ট্রং আজ পাতাল ঘরে গেলে সব কিছু গুবলেট করে ফেলতে পারে। তার কারণে তাদের দু'জনেরই বারোটা বেজে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্যালান্স দেখে আসবেন ছোড়াটা তার রুমে আছে কিনা। ওরা একতলার ল্যান্ডিংয়ের শেষ মাথার ঘরটিতে থাকে।

ভ্যালান্স নিশ্চিত ছোকরা এখন তার ঘরেই আছে। নাহ্, নিশ্চিত হওয়া ঠিক হলো না। যদিও দরজার ফাঁক দিয়ে কোনো আলো দেখা যাচ্ছে না। জর্জ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জ্যাকেটের পকেটে ঢোকালেন হাত। যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন। কাঠের পালিশ করা একটি পেন্ডুলাম। পকেট নাইফ দিয়ে ওটার ডগা সরু করে কেটেছেন জর্জ। এটা যেন দৈববাণীর মতো, বেশীরভাগ প্রশ্নের সরাসরি জবাব মেলে এ থেকে– হ্যাঁ অথবা না।

পেন্ডুলামটা দোলাতে লাগলেন জর্জ ভ্যালান্স। অনুভব করলেন ওটার ভেতরে যেন ভর করেছে জীবন, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। পেণ্ডুলামকে প্রশ্ন করার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠল মনে। তিনি ওটাকে হাতে ধরে রাখলেন। ওটা ডানে-বামে দুলছে। চোখ বুজলেন জর্জ। মনে মনে প্রশ্ন করলেন–এরিক আর্মস্ট্রং কি এ ঘরে আছে?

পেন্ডুলামের গায়ে বাঁধা সরু সুতোয় যেন কম্পন উঠল, যেন প্রশ্নটা তাঁর শরীর থেকে সরাসরি ঢুকে গেছে কাঠের জিনিসটিতে। ভ্যালান্স পুরোপুরি মনোযোগ দিলেন ওটার প্রতি। জবাবের অপেক্ষা করছেন। পেণ্ডুলামের দুলুনি আস্তে আস্তে কমে এলো।

দশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল। মনে হলো অনন্তকাল ধরে জবাবের প্রতীক্ষায় আছেন তিনি। টের পেলেন আবার দুলতে শুরু করেছে পেণ্ডুলাম। চোখ মেলে চাইলেন জর্জ। পেণ্ডুলাম দুলছে ঘড়ির কাঁটার মতো। এর মানে জবাব হলো হ্যাঁ। তিনি একটি সিগারেট ধরালেন। তৃপ্তি নিয়ে টান দিলেন। এবারে তিনি অভিযানে নেমে পড়বেন।

পাতালঘরটি আগের মতোই আছে। পুলিশের লোকটা কোনো কিছু

স্পর্শ করেনি। পাথরের সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন জর্জ ভ্যালান্স। নামতে ইতস্তত করছেন। এ পথ দিয়ে এসেছিল সেই সাংবাদিক। জর্জের নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠল। তিনি যেন চারপাশের আবহাওয়া দেখতে পাচ্ছিলেন। জ্যান্ত শয়তান, নরকের প্রেত ছাড়া পাবার অপেক্ষায়। তিনি মহিলাকে মানা করেছিলেন। কিন্তু নিষেধ শোনেনি সে। তিনি আর্মস্ট্রং দম্পতিকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছেন ওরা যেন এর ধারে কাছেও না ঘেষে। অন্ধকারের শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

এক এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন জর্জ ভ্যালান্স। তাঁর বাম হাতে রসুনের মালা, ডান হাতে ছোট একটি টর্চ। তবে টর্চের আলোয় অন্ধকার দূর হয়েছে সামান্যই। আলোটা হঠাৎ দপদপ করে উঠল, নিভু নিভু হয়ে এলো। তারপর জ্বলে উঠল আবার। ধক্ করে উঠল ভ্যালান্সের বুক। ওরা টের পেয়ে গেছে। তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর গলায় রুপোর ক্রুস, ডিমের দাগ লাগা টাইয়ের পাশে ঝুলছে। ওরা তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না, ভয় দেখানো ছাড়া। কিন্তু বুড়ো কলজে ওই ভয়টাই বা কতক্ষণ সইতে পারবে...

নিচে নামতে তিন ধাপ বাকি থাকতে ডান পাশের চোরকুঠরীতে টর্চের আলো ফেললেন জর্জ ভ্যালান্স। আর্মস্ট্রং বলেছিল এখানে নাকি ওঁৎ পেতে ছিল ভ্যাম্পায়ার। কিন্তু এটা হতেই পারে না। যদি না...টর্চের আলো আবার দুর্বল হতে শুরু করেছে–আসার আগে নতুন ব্যাটারি ভরে নেয়া উচিত ছিল; আট নম্বর ব্যাটারিগুলোর আয়ু থাকে কম।

ওখানে কিছু একটা আছে। থাকতেই হবে– চার হাত পায়ে উবু হয়ে আছে মায়া নেকড়ে, ওটার গায়ে অ্যালসেশিয়ানের চামড়া লাগানো হয়েছে। আরেকটা পা ফেললেই চালু হয়ে যাবে লিভার, ওটা লাফিয়ে চলে আসবে সামনে। কিন্তু পরের সিঁড়িতে পা রাখার আগেই মায়া নেকড়ে নড়ে উঠল!

অন্ধকার আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলো ওটা, ধীর গতিতে, যেন অশুভ মতলব নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। বরাবরের মতো জানোয়ারটার মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। না, বরাবরের মতো নয়। ওটাকে এবারে অনেক বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে, বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, উদ্যত থাবা, মানুষের মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। শিটিয়ে গেলেন জর্জ, শরীরে তাকত থাকলে ছুটে পালাতেন এখনই। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের জায়গায়। অপেক্ষা করছেন ওটা অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে আসবে। বিপরীতে দেয়াল বাতি হলুদ একটা বৃত্ত সৃষ্টি করেছে মেঝেতে।

মনুষ্য আকৃতি দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন ওটা ভ্যাম্পায়ার, শেয়াল নয়, কারণ কাঠামোটা খাড়া। ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো ওটা। মুখটা দেখে গলা চিরে ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এলো জর্জ ভ্যালান্সের।

খাটো মোটা একটা কাঠামো, প্রায় চৌকোণা মাথা, খুলি বা করোটি এখনও যেন গড়ে ওঠেনি পুরোপুরি। বানরের মতো শক্ত পশমে ঢাকা শরীর, তবে মুখটা লোমশূন্য। খাটো এবং শক্তিশালি হাত-পা। মঙ্গোলিয়ানদের মতো নাকের ব্রিজের ঠিক ওপরে কুঁতকুঁতে ছোট একজোড়া চোখ; হাঁ করা বিরাট মুখে রক্তাক্ত মাংসখণ্ড। কড়মড় শব্দে হাড় চিবুচ্ছে, ঠোঁটের কষ বেয়ে পড়ছে তাজা খুন। মোটা, গাট্টাগোট্টা হাতে ধরা মাংস টান মেরে ছিড়ল সে, পুরে দিল মুখে। জর্জ ভ্যালান্সকে দেখে ইশারায় ডাক দিল সে, এসো, আমার সাথে যোগ দাও। মানুষের মাংস খাব আমি!

'না!' গলা দিয়ে ফোঁপানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে এলো জর্জ ভ্যালান্সের। পেছনে সরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। সামলে নিলেন কোনোমতে।

গঁকগঁক করে হেসে উঠল বিকট প্রাণীটা, আবার মনোযোগ দিল খাওয়ায়।

ভ্যালান্সের মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। হঠাৎ অস্ত্রগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। রসুন দিয়ে কাজ হবে না, তিনি ক্রুস এবং প্রার্থনা গ্রন্থ বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তো তিনিই ভ্যালান্সকে রক্ষা করবেন। যদি; না, ঈশ্বর অবশ্যই আছেন; একমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসই তাঁকে রক্ষা করতে পারে। ভ্যালান্স তারস্বরে চিৎকার দিতে লাগলেন। একের পর এক ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে গলা চিরে।

'তুমি নও। তোমার তো এখানে থাকার কথা নয়। তোমার থাকার কথা গুহায়। এটা তো মায়া নেকড়ের আস্তানা!'

ওটা জর্জ ভ্যালান্সের কথা বুঝতে পারল না। আর বুঝতে পারলেও আমল দিল না। জর্জ ভীত চোখে ওটার গলার দিকে তাকালেন। গলায় প্ল্যাকার্ড থাকার কথা। প্ল্যাকার্ডে ওটার নাম লেখা থাকবে। কিন্তু গলায় কিছু নেই। থাকলেও হয়তো রাগে উন্মত্ত হয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। অবশ্য ওর পরিচয়পত্রের দরকারও নেই। কারণ দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে ওটা মানুষ নয়, নরখাদক!

পাঁচ

শরতের শুরুতে হরিণ উচ্চভূমি থেকে নেমে আসে হ্রদের চারপাশ ঘিরে থাকা বনভূমিতে। এবং চোরা শিকারীদের চোখে পড়ে যায় তারা। অতীতে মাংসের জন্য হরিণ শিকার করা হতো। প্রথমে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো ক্রস বো, তারপর ফ্লিন্টলক মাস্কেট বন্দুক। শতাব্দীর পর শতাব্দী এভাবে হরিণ শিকার করেছে চোরা শিকারীরা। আগে স্রেফ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা কাজটা করলেও পরে টাকার লোভ পেয়ে বসে তাদেরকে। মৃত হরিণ উচ্চ দামে বিকোয় দক্ষিণ সীমান্তে। হরিণ শিকারে ব্যবহৃত হতে থাকে অত্যাধুনিক অস্ত্র। এ শিকারীদের মনে দয়ামায়া বলতে কিছু নেই। প্রয়োজন পড়লেই তারা নেমে পড়ে হত্যাযজ্ঞে। এরকমই দুই হরিণ শিকারী হলো টমি কার্লাইল এবং রয় টাচার্ড।

ওদেরকে প্রথম দেখায় দুই ভাই বলে ভ্রম হতে পারে। দু'জনেরই ত্রিভুজাকৃতির মুখ, নিষ্ঠুর পাতলা ঠোঁট, কুঁতকুঁতে চঞ্চল চোখ। কার্লাইল পাতলা এবং রোগা, টাচার্ডের বেল্ট ছিড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ভুঁড়ি। দু'জনেরই দিনের বেশীরভাগ সময়টা কেটে যায় ঘুমিয়ে, প্রতি সন্ধ্যায় পাবে গিয়ে তাদের মদ গেলা চাই-ই। চোরা শিকার শুরু হয় মাঝ রাতে।

ওদের বাহন নীলরঙের পুরানো একটি ট্রানজিট ভ্যান। সারা গায়ে জং ধরে গেছে, হিনজের গায়ে ল্যাগব্যাস করে ঝুলছে দরজা, যে কোনো সময় ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওদের একজন সঙ্গী আছে– নোংরা, চর্মরোগে আক্রান্ত মহা ধুরন্ধর একটা কুকুর। জানোয়ারটা নিজের কাজ জানে। ছুটে গিয়ে গুলি খাওয়া হরিণ ধরাশায়ী করতে তার জুড়ি নেই। দুই বন্ধু যখন রাতের বেলা নির্জন রাস্তা ধরে হরিণ শিকারে বেরোয়, কুকুরটা তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। তাদের সাথে থাকে শুধু শক্তিশালী একটি ল্যাম্প।

পুলিশ, গেম-কিপার এবং ওয়ার্ডেনরা এ দু'জনকে চেনে। বিভিন্ন সময় এদেরকে রাস্তায় পথ আটকে জেরা করা হয়েছে, সার্চও করেছে। তবে

রাতে কুকুর নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা আইনবিরুদ্ধ কাজ নয় বলে তাদেরকে ছেড়েও দেয়া হয়েছে। যদিও সবাই জানে ওরা কী উদ্দেশ্য এত রাতে বের হয়েছে।

ওরা একটি হরিণ দেখতে পেল। ব্যান্ডার ওটাকে ধাওয়া করল। পেড়ে ফেলল মাটিতে। মটকে দিয়েছে ঘাড়। দ্রুত মৃত জানোয়ারের চামড়া ছাড়িয়ে ওটাকে টুকরো টুকরো করে লুকিয়ে রাখা হলো ঝোপের আড়ালে। আগামীকাল ওটা পৌঁছে দেয়া হবে পার্থে। ওখানকার লোকজনের সাথে দক্ষিণ সীমান্তের ডিলারদের দহরম মহরম সম্পর্ক। এক রাতের অভিযান সফল হলে কার্লাইল এবং টাচার্ড কমপক্ষে তিনশো পাউন্ড আয় করে।

আজ বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাস পড়ে গেছে। বৃষ্টির জল জলপ্রপাতের মতো গড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। কার্লাইল এবং টাচার্ড ছোট গ্রামটি থেকে গাড়ি চালিয়ে ক্রমে পাহাড়ে উঠছে। ওরা পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এলো। ঢাল সোজা গিয়ে মিশেছে নিচে, হ্রদে। বৃষ্টি ভেজা রাত হওয়ায় চোরা শিকারীদের সুবিধেই হয়েছে। কারণ হরিণের দল ভেজা আবহাওয়ায় কম সতর্ক থাকে।

'নিচে নিশ্চয় হরিণ আছে,' মন্তব্য করল টমি কার্লাইল। গাড়ি নিয়ে ঢাল বেয়ে নামছে। রাস্তা এমন সরু, পাশাপাশি দুটো বাহন চলা সম্ভব নয়।

'হ্রদের চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে বিনাহিতে ফিরে আসব,' বলল টাচার্ড। 'কেউ কল্পনাও করবে না আমরা ওদিক থেকে আসব।'

পেছনের আসনে বসা ব্যান্ডার কুইকুই করে তার অসন্তোষ প্রকাশ করল।

'চুপ কুত্তো,' খেঁকিয়ে উঠল কার্লাইল।

মাইল খানেক রাস্তা পার হলো ওরা। এখনও হরিণের দেখা নেই। 'ওগুলো বোধহয় জঙ্গলে সেঁধিয়েছে,' ঘোঁত ঘোঁত করে উঠল টাচার্ড।

'নাহ্, ওরা...আরি, ওটা কী?'

কমে এলো গাড়ির গতি। দু'জনেই ঝুঁকে তাকাল সামনে। রাস্তার পাশে বৃষ্টির সাথে লড়াই করতে করতে হেঁটে আসছে কেউ। তার একটা হাত সামনের দিকে বাড়ানো। যেন চলন্ত গাড়িকে থামতে বলছে।

'ক্রাইস্ট, ওতো একটা লোক!' চোরা শিকারীরা সতর্ক হয়ে উঠল। লোকটা গেমকিপার নয় তো? জঙ্গলের মধ্যে পুলিশ লুকিয়ে রেখে একা হেঁটে আসছে। 'আমাদের সাথে কিছু নেই। কাজেই ওরা কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।'

‘ওতো মহিলা!’ হাঁপিয়ে ওঠার মতো শব্দ করল রয় টাচার্ড। ‘লিফট চাইছে নিশ্চয়।’

অ্যাকসেলেরেটর থেকে পা তুলে নিল কার্লাইল, মন্থর হয়ে এলো ভ্যানের গতি, হালকাভাবে স্পর্শ করল ব্রেক পেডাল। মহিলাই বটে। স্বর্ণকেশী নারী। বৃষ্টি ভেজা কাপড় সেঁটে রয়েছে শরীরে, খাজভাঁজগুলো প্রকট হয়ে ফুটিয়ে তুলেছে। মেয়েটাকে গাড়িতে তুলে নেবে নাকি রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না দুই বন্ধু।

পথচারীটি যদি পুরুষ হতো, পাত্তা দিত না ওরা। চলে যেত পাশ কাটিয়ে। ওরা গাড়ি থামাল। ভদ্রতার খাতিরে নয়, কিছুটা কৌতূহল এবং অনেকটাই নারী সাথের লোভে।

‘ওকে তুলে নাও,’ ড্যাশবোর্ডের আলোয় মেয়েটার প্রতিবিম্বের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাল টাচার্ড। এরকম সুযোগ বারবার আসে না।’

কাঁধে দিয়ে ধাক্কা মেরে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলল টাচার্ড। আহ্বান করল সে, ‘উঠে এসো, সুইটহার্ট।’

‘অনেক ধন্যবাদ,’ মার্জিত কণ্ঠে বলল মেয়েটি। টাচার্ডের বাড়ানো হাত ধরে উঠে পড়ল গাড়িতে। বন্ধ করে দিল দরজা। বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হলেও সুন্দরই লাগছে মেয়েটাকে। তার সবুজ সুতির জ্যাকেট দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়াচ্ছে, সিটে বসার সময় তার সুগঠিত নিতম্বে স্পঞ্জের মতো সেঁটে থাকল টুইডের স্কার্ট।

‘এমন রাতে তোমাকে রাস্তায় আশা করিনি,’ সরাসরি কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলল কার্লাইল।

এমন সময় কুইকুই শুরু করে দিল ব্যান্ডার, নিচু গলায় ভয়ার্ত আর্তনাদ ছাড়ল, ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল ভ্যানের পেছন দিকে। থাবা দিয়ে দরজা খামচাচ্ছে। যেন দরজা খুলতে পারলেই লাফ দিয়ে নেমে পড়বে।

‘চোপড়াও কুত্তো।’

ঘেউ ঘেউ করে উঠল ব্যান্ডার, শোকার্ত আর্তনাদ।

‘চুপ করতে বলেছি না!’ রয় টাচার্ড সিটে উঠে বসল, মেঝে থেকে তুলে একটা লাঠি, ছুড়ে মারল ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা জানোয়ারটার উদ্দেশ্যে। তবে লক্ষভ্রষ্ট হলো টার্গেট। কুকুরের কাছ থেকে হাতখানেক দূরে ছিটকে পড়ল লাঠি। ‘চুপ থাক নয়তো খুন করে ফেলব।’

‘অচেনা মানুষজন ও বোধহয় তেমন পছন্দ করে না,’ বলল মহিলা।

'আমরা গাড়িতে থাকলে ও কিছু বলে না,' বলল কার্লাইল। 'কিন্তু আজ এরকম কেন করছে বুঝতে পারছি না।'

ধীরগতিতে চলছে গাড়ি। দু'জনেই ভাবছে মহিলাকে তুলে নিয়ে ভুলই করল কিনা। মহিলা রাস্তার সস্তা মেয়ে মানুষ নয় তা বোঝাই যায়। একে নিয়ে কোনো বদ মতলব করা যাবে না। একে নিয়ে পোচিংয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়।

'রাস্তায় গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, তাই না?'

'না, আমার গাড়ি নেই,' মহিলা ড্রাইভারের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলতে আগ্রহী নয়, কোনো প্রশ্নও শুনতে চায় না।

'গাড়ি নেই, হাহ্।' কার্লাইলের খুলি চুলকাচ্ছে; কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। 'তোমাকে কোথায় নামিয়ে দেব?'

'যে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হলো।' হাসল মহিলা। তবে ফ্যাকাশে, প্রাণশূন্য হাসি। তার চোখ ঝকঝকে এবং তীক্ষ্ণ, কার্লাইলের চোখে যেন লেসার বিমের মতো ঢুকে যাচ্ছে চাউনি। অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসল সে আসনে।

'তোমার চোরা-শিকারী, তাই না?' বোমা ছোড়ার মতো চট করে এলো প্রশ্নটা।

'আ...ইয়ে...আমরা আসলে বেরিয়েছি...'

'হরিণ শিকারের জন্য,' হিসহিস করে উঠল মহিলার কণ্ঠ। ব্যান্ডার একটানা কুইকুই করেই চলেছে। পেছনের ইস্পাতের দরজা উন্মাদের মতো খামচাচ্ছে।

'না, মিস...'

'এ জায়গাটা লেয়ার্ড অব বিনাহির। তোমরা জান না?'

'এগুলো...ন্যাশনাল ট্রাস্ট। কিছু বনভূমির মালিক ফরেস্ট্রি কমিশন।' ঢোক গিলল টমি কার্লাইল। এই মহিলা পাগল, মনে মনে ভাবল সে। বোধহয় পশুপ্রেমী। একে নিয়ে ঝামেলা হতে পারে।

'এ জায়গার মালিক বিনাহির ভূস্বামী। তার কাছ থেকে জায়গাটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। লোকের ধারণা তিনি মারা গেছেন। ১৭৬৫ সালে তাকে ওরা পুড়িয়ে মেরেছে ভাবলেও আসলে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। থাকছেন প্রাসাদে। তাঁর প্রাসাদ। প্রাসাদটাকে ডাকাতের দল নিজেদের লোভ চরিতার্থ করতে ব্যবহার করছে। ভূস্বামী ভয়ানক ক্রুদ্ধ। তাঁর এলাকায় যারা

চোরা-শিকার করে তিনি তাদের ওপরেও রেগে আছেন।'

জেসাস ক্রাইস্ট! টমি কার্লাইল স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে সটান তাকিয়ে রইল সামনের দিকে যাতে ভয়ঙ্কর ওই চোখ দুটোর দিকে চাইতে না হয়। ব্যান্ডার এবার ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিয়েছে– ক্রুদ্ধ স্বরে নয়। ভয়ার্ত গলায়।

'আমরা তার হরিণ মারছি না,' দরজার দিকে সরে বসল টাচার্ড। 'আমাদেরকে চোরা-শিকারীর মতো দেখালেও আসলে আমরা তা নই। আপনাকে আমরা হোটেলে পৌঁছে দিচ্ছি, ম্যাডাম,' ভয়ের চোটে 'তুমি' থেকে 'আপনি'তে চলে এলো সে। 'ওরা আপনাকে...'

'আমি কোথায় নামব জানাব' নিচু গলায় বলল মহিলা তবে কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর সুস্পষ্ট। 'সামনে বাড়ো।'

নিরবে চলল ওরা। শুধু কুকুরটা নিচু স্বরের কেউকেউ এবং গাড়ির ক্যাচকোচ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল রাস্তার পাশে, গাছের নিচে ঘুরঘুর করছে একপাল হরিণ। তবে গাড়ি থামাবার চেষ্টা করল না।

ওরা হ্রদের ধারে চলে এসেছে। রাস্তার বামে এক ঝলক দেখা গেল কালো তেল চকচকে পানি।

'তোমরা দক্ষিণী, ইংরেজ,' নীরবতা ভংগ করল মহিলা, কণ্ঠে বিবমিষা। 'তোমাদের শিরায় স্কটিশ রক্ত পর্যন্ত বইছে না। তোমরা উত্তর সীমান্তে লুঠ করতে এসেছ। ইংরেজরা সবসময় এ কাজটাই করেছে। এতদিন গেল তবু অভ্যাস পাল্টালো না তোমাদের।'

'আমরা উত্তরে এসেছি...কাজ খুঁজতে।' টাচার্ড দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিন্তা করছে।

'তোমরা চুরি করতে এসেছ!' মহিলা ঘুরল তার দিকে। 'ভূস্বামী চোরদের কঠিন শাস্তি দেবেন।'

'কিন্তু আপনিই তো বললেন এই জমিদারকে দুশো বছর আগে কবর দেয়া হয়...'

'তিনি মরেননি। বেঁচে আছেন এখনও। আগের মতোই ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে।'

মহিলাটা একটা পাগলী, ভাবছে কার্লাইল। উল্টোপাল্টা বকছে। কিন্তু এর কথা শুনে এরকম ছমছম করে কেন গা? এ নির্ঘাত পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছে। 'আপনি আসলে কে?'

'আমি তাঁর ভৃত্য,' গর্বিত কণ্ঠে জবাব দিল মহিলা। 'অনেক বকবক হয়েছে। এবার বামে ঘোরো।'

'পাগল নাকি? বামে ঘুরলে সোজা পানিতে গিয়ে পড়ব!'

'বামে ঘুরতে বলেছি?' ভয়ঙ্কর গলায় আদেশ এলো, কার্লাইলের মস্তিষ্কে যেন হাতুড়ির মতো বাড়ি মারল খনখনে কণ্ঠ। 'আমার আদেশ পালন করো। বামে ঘোরো!'

টমি কার্লাইল বামে হুইল ঘোরাল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজটা করছে সে। যেন তার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি শুষে নেয়া হয়েছে। লাফাতে লাফাতে হ্রদের গভীর পানির দিকে ছুটল গাড়ি।

চিৎকার করে উঠল টাচার্ড। শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যাসেঞ্জার ডোরে। ওটা একটু খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির পেছনের আসনে পাগল হয়ে গেল ব্যান্ডার। সে দরজা লক্ষ করে বারবার লাফ দিচ্ছে। কিন্তু বন্ধ দরজা খুলল না। কার্লাইল ব্রেক পেডাল চেপে ধরল পা দিয়ে; জং ধরা মেঝেতে দেবে গেল পেডাল কিন্তু থামল না গাড়ি।

ওহ্ গড, আমরা পানিতে ডুবে মরব!

হ্রদের এদিকের তীরটা বেশ ঢালু। কংক্রিটের ছোট একটি জেটি তৈরি করা হয়েছে মাছ ধরার নৌকা বেঁধে রাখার জন্য। জেটি থেকে দশ/বারো ফুট নিচে হ্রদ। বুড়ো ভ্যান হঠাৎ এক পাশে কাত হয়ে গেল, তারপর গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে। শব্দ হলো ঝপাস।হ্রদে পড়ে গেছে গাড়ি।

গাড়ির ভেতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তীব্র আতঙ্ক অবশ করে দিল দুই বন্ধুকে। তবে কুকুরটা চুপচাপ শুয়ে আছে। যেন মেনে নিয়েছে নিয়তি। হঠাৎ হড়হড় করে গাড়ির মধ্যে ঢুকতে লাগল পানি, দ্রুত পূরণ করে ফেলছে শূন্যস্থানগুলো।

আতঙ্কিত দুই চোরা শিকারী তাদের যাত্রীর কথা ভুলে গেল। মহিলাকে গাড়ির মধ্যে দেখাও যাচ্ছে না। দরজায় লাথি কষাতে লাগল ওরা, প্রাণপণ চেষ্টা করছে খুলতে। কিন্তু পানির প্রবল চাপে তা সম্ভব হচ্ছে না। এবার চিৎকার দিতে লাগল ওরা।

ওরা ডুবে যাচ্ছে।

পানিতে ভেসে ছাদে গিয়ে ঠেকল দু'জনে। মাথা ঠুকে গেল ছাদে। কুকুরটাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বেরিয়ে পড়েছে দাঁত, স্লো মোশনে খেঁকিয়ে উঠল ওদেরকে লক্ষ করে। ওর মৃত্যুর জন্য ওরাই দায়ী যেন বলতে চাইল অসহায় জানোয়ারটা। কোটর ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। তারপর

স্থির হয়ে গেল ওটা।

এমন সময় মহিলাকে দেখতে পেল ওরা। আছে ওখানেই। পানিতে ছড়িয়ে রয়েছে সোনালি চুল। তবে চাউনিতে নেই কোনো ভয়ের ছাপ। হাসছে ওদের দিকে তাকিয়ে, ভেংচাচ্ছে, ঘাড়ের রক্তাক্ত ঘায়ের দিকে ইংগিত করে যেন বলছে : দ্যাখো, এজন্যই আমি আজ এখানে।

আতঙ্কে দিশেহারা দুই চোরা শিকারী গাড়ি থেকে বেরুবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, মহিলার কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু মৃত কুকুরটা ওদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াল। ওটার লাল ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে মৃত্যুর হাসির ভঙ্গিতে, বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় দাঁত।

পিশাচী ওদেরকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল। ওদের মুখের সামনে নিয়ে আসছে মুখ, লাশের মতো হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করছে। ওরা নিঃশব্দ চিৎকার দিল। মহিলা টান মেরে ছিড়ে ফেলল গায়ের পোশাক। সাদা মাংস। এই বীভৎস শরীর কোনো মানুষের হতে পারে না। প্রেতিনী ওদেরকে গাড়ির এক কিনার থেকে আরেক কিনারে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

ওরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে যেন দ্রুত নিভে যায় ওদের জীবনপ্রদীপ। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু এলো ধীরে। কালো পানি আরও গাঢ় হয়ে উঠল। পিশাচী ছেড়ে দিল ওদেরকে। ভ্যানের ছাদ দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

ওদেরকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়ে চলে গেছে মহিলা। চলে গেছে তার প্রভু বিনাহির ভূস্বামীর কাছে। প্রভুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। যারা প্রভুর জমির সম্পদ লুঠ করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছে সে।

ছয়

পরদিন সকালে নিচে নামার সময় কিম ভাবল যাক গত রাতটা তবু নির্বিঘ্নে কেটেছে। করিডরে বুড়োর হাঁটাহাঁটির শব্দ ছাড়া আর কোনো অপ্রত্যাশিত আওয়াজ ওদেরকে বিরক্ত করেনি। রোদ উঠেছে। দিনের আলোয় ভয় কেটে গেছে অনেকটাই। ভাগ্য সহায় থাকলে পুলিশ ইন্সপেক্টর হয়তো আজ ওদেরকে এ ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে।

ডাইনিংরুমে ঢুকল ওরা। কিমের মনে হলো বহুবার দেখা কোনো ছবির দৃশ্যে যেন প্রবেশ ঘটল। ও এখন জানে কোন্ কোন্ টেবিল ফাঁকা থাকবে, অন্যরা (আসলে একজন মেহমান) কোথায় বসবে। কিন্তু অতিথিটি তাঁর নির্ধারিত টেবিলে নেই; জর্জ ভ্যালান্সকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'উনি...উনি...এখানে নেই,' কিমের ত্বকে কেউ যেন হিম শীতল আঙুল ছোঁয়াল, পেটের ভেতরটা হঠাৎই ফাঁকা ঠেকল।

'নৈশ অভিযান শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছেন নিশ্চয়,' হেসে উঠল এরিক।

'ক্যারোলিন চাডারটন সম্পর্কেও একই কথা বলেছিলে তুমি?'

ধ্যাত, এ যেন হারাধনের সেই দশটি ছেলের গল্পের মতো ঘটছে। এরপরে কে হারিয়ে যাবে? আছেই তো মাত্র ওরা দু'জন।

'গুড মর্নিং, স্যার, ম্যাডাম,' ম্যানেজার-কাম-ওয়েটার সিমন উইভার বেরিয়ে এলো কিচেন থেকে। এক হাতে ভাঁজ করা ন্যাপকিন। পুরানো ছবির আরেকজন অভিনেতা, মনে মনে ভাবল কিম। গম্ভীর, অশুভ, খুব বেশী ফরমাল।

'আবহাওয়া ক্রমে ভালো হয়ে উঠছে। শীতশীত ভাবটা এখন আর নেই।' বলল সে।

'মি. ভ্যালান্সকে তো দেখছি না কোথাও,' মেনুতে চোখ বুলাতে বুলাতে মন্তব্য করল এরিক। 'গত রাতে তাঁর প্রাসাদে যাওয়ার কথা শুনেছিলাম।'

'উনি বোধহয় এখনও ঘুমাচ্ছেন,' নীরস গলায় বলল উইভার। 'আমরা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত নাস্তা দিই। কাজেই এখনও আধঘণ্টা বাকি আছে। এর মধ্যে উনি হয়তো এসে পড়বেন। আপনারা কখনও ঘুম থেকে দেরী করে

উঠলে আপনাদের জন্য নাস্তা রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করব।'

'ধন্যবাদ,' ম্যানেজারকে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছে এরিক। 'আমরা অবশ্য শীঘ্রি চলে যাওয়ার কথা ভাবছি।'

'আচ্ছা? আপনারা তো শনিবার পর্যন্ত রুম ভাড়া করেছেন।'

'করেছিলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো আমার স্ত্রীকে খুব আপসেট করে তুলেছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি অন্য কোথাও চলে যাব।'

'সে আপনাদের ইচ্ছে, স্যার। তবে রুম ভাড়ার টাকাটা আমরা ফেরত দিতে পারব না। বুকিং ইজ বুকিং। তবে আপনাকে আর আপসেট হতে হবে না, ম্যাডাম। পুলিশ বলেছে ওটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল এবং ওরকম ঘটনা যে কারও ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে।'

'আমাদের মতো?' খেঁকিয়ে উঠল এরিক। 'সিঁড়িটা বিপজ্জনক জানা সত্ত্বেও ওটা বন্ধ রাখা হলো না কেন? সাপোজ...'

'আপনারা কি অর্ডার দেবেন, স্যার?' উইভারের গালে লাল দুটো দাগ ফুটল, তবে চেহারায় রাগের লেশমাত্র নেই। বরাবরের মতো ভাবলেশশূন্য চেহারা। এরিক খাবারের অর্ডার দিল। পরিজ, বেকন এবং সসেজ। ঘুরে দাঁড়াল ম্যানেজার, রওনা হয়ে গেল কিচেনের উদ্দেশে।

'তুমি নিশ্চয় এখন বুড়ো ভ্যালান্সের খোঁজে বেরুবে,' মেনু নাড়াচাড়া করতে করতে মন্তব্য করল কিম।

'আমি দেখতে যাব ভ্যাম্পায়ার ডামিটা ঠিক কোন জায়গায় আছে,' মুখ শক্ত করে জবাব দিল এরিক। 'আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে চাই না যে বুড়োর কিছু হয়েছে। শোনোনি কথাটা, এক জায়গায় পরপর দু'বার বজ্রপাত হয় না।'

'কিন্তু এখানে হয়।'

নীরবে নাস্তা খেল ওরা। কিম মাঝে মাঝেই চোখ তুলে চারদিকে তাকাল। আশা করল চটি ঘসর ঘসর করতে করতে ঘরে ঢুকবেন জর্জ ভ্যালান্স। গায়ে খাবারের দাগ পড়া সেই আগের জামা। কিন্তু বৃদ্ধের কোনো চিহ্নই নেই, নাকে ধাক্কা দিল না টার্কিশ সিগারেটের কটূ গন্ধ। টোস্টে যখন কামড় দিচ্ছে কিম, খাচ্ছে মারমালেড, ততক্ষণে ও নিশ্চিত হয়ে গেছে জর্জ ভ্যালান্স আর আসছেন না। কোনোদিনই না।

গতকালের মতোই লাগল পাতালঘর। স্যাঁতসেঁতে এবং ভৌতিক। দর্শকদের ভয় দেখানোর উপকরণের অভাব নেই কোনো।

এখানে আর জীবনেও আসবে না এরিক। কিম ভয়ে শিঁটিয়ে রয়েছে।

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। ভুতুড়ে প্রাসাদ দেখার শখ তার উবে গেছে। কাজেই পাতালঘরে একাই আসতে হয়েছে এরিককে।

হরর শো শুরু হয়ে গেছে আবার। সেই চাকাটা ঘুরতে শুরু করেছে। যেন এরিকের উপস্থিতি টের পেয়ে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। এরিক লুকানো লিভারে নির্ঘাত পা দিয়ে ফেলেছে তাই ওটা চলতে শুরু করেছে। ছিন্নভিন্ন নারী শরীরটা যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল। প্রথমে ওটার পা দেখা গেল। বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল এরিকের। অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় মেয়েটির কৃত্রিম সুন্দর শরীরের প্রতিটি অঙ্গে খিচুনি উঠেছে, কুঁচকে যাচ্ছে পেশী। বুকে হাত বাঁধল এরিক। যে কোনো মুহূর্তে লাফ মেরে সামনে হাজির হয়ে যেতে পারে সেই টর্চারার, নীরবে তার দর্শককে বীভৎস নির্যাতনের দৃশ্য দেখার জন্য আকুতি জানাতে পারে।

মৃদু একটা শব্দ হলো। ক্লিক। এরিক পরিষ্কার শুনতে পেল কারণ সে কান খাড়া করে রেখেছে। ছায়ায় কার যেন নড়াচড়া দেখতে পেল ও, যেন কেউ এগিয়ে আসছে। আমি ওদিকে তাকাব না, সিদ্ধান্ত নিল এরিক, কারণ আমি তোমাকে দেখতে চাই না। তুমি বেহুদাই নষ্ট করছ সময়। মাথা ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল এরিক। ডামিটাকে পাশ কাটানোর জন্য পা বাড়াল। তবে তাকাবে না তাকাবে না করেও তাকাল ও। এবং জমে গেল ভয়ে।

নোংরা কদর্য মুখ নয়, ওটা সামনের দিকে হাত বাড়িয়েও নেই। এটা আগেরটার চেয়ে উচ্চতায় বেশ লম্বা, অভিজাত, বিরাট কালো একটা আলখেল্লায় ঢাকা শরীর। মুখটা মরা মানুষের মতো সাদা, লাল টকটকে চোখ, ঠোঁট জোড়া কুঁচকে সরে গেছে পেছন দিকে, বেরিয়ে আছে দুটো শ্বদন্ত। রক্তমাখা। ছোবল দিতে উদ্যত ভয়ঙ্কর ভাইপারের মতো হিসহিস শব্দ করছে মুখ দিয়ে, এটা পাতাল ঘরের রক্ষক কিংবা টর্চারার নয়...স্বয়ং ভ্যাম্পায়ার।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য এরিক আমস্ট্রংয়ের মস্তিষ্ক কোনো কাজ করল না। শরীর এবং মন দুটোই যেন অচল হয়ে গেল। তারপর নিজেকে মনে মনে বলল ও। না, এটা তুমি হতে পার না। তোমার তো সিঁড়ির ধারে থাকার কথা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ভ্যাম্পায়ার, সামনে ঝুঁকে এলো মাথা। ওটা যেন মুচকি হেসে বলেছে, এসো, যুবক, তোমাকে মৃত্যু চুম্বন করি।

'জাহান্নামে যাও!' এরিকের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল পাতালঘরে, কথাগুলো টর্চার কারাগারের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে আবার ফিরে এলো ওর নিজের কাছে। অন্ধকারে কোথাও খটখট শব্দে হাড় নাড়ল নরকংকাল।

‘তুইও জাহান্নামে যা!’ এখন রীতিমতো চিৎকার করছে এরিক। ভীত।

ভয়ের কিছু নেই, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে এরিক। এগুলো সব নকল জিনিস। বুক ভরে দম নিল। এক মুহূর্তের জন্য ওরা ওকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। নিজেরই লজ্জা লাগল। ওর চিৎকার কেউ শুনতে না পেলেই হলো। ওর ভয় লাগছে কারণ নিজেকে ও ভয় পেতে দিচ্ছে। নাহ্, আর ভয় পাবে না ও। ‘পথ ছাড়ো, ভ্যাম্পায়ার,’ হাঁক ছাড়ল এরিক। ‘নইলে লাথির চোটে ওল ফাটিয়ে দেব।’

লম্বা শরীরটা পিছিয়ে গেল, হিসহিস করতে করতে অদৃশ্য হলো অন্ধকার কোণে। যেন এরিকের হুমকি শুনেছে এবং বুঝতে পেরেছে। গা-টা শিরশির করে উঠল এরিকের। নিজেকে চোখ রাঙাল ও। হারামজাদা যদি আমার কথা বুঝতে পারে তো ধারেকাছেও আর ঘেষবে না। এ নিয়ে আমার টেনশন কীসের। ভ্যালান্স যাই বলুন এগুলো তো মডেল ছাড়া কিছু নয়।

সামনে পা বাড়াল এরিক। রাস্তায় পড়ে আছে লাশ এবং নরকংকাল, গোঙাচ্ছে, নড়াচড়া করার সময় হাড়ে শব্দ তুলছে খট্‌খট্। খ্যাখ্যা করে হাসছে। বাড়িয়ে দেয়া একটা পায়ে পা বেঁধে আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল এরিক। সবগুলো ডামি হে হে হো হো করে হাসছে। যেন মজা পেয়েছে খুব।

মাথা নিচু করে হাঁটছে এরিক। কারণ দেয়ালে শিশুর পা আছড়াতে থাকার দৃশ্যটা দেখতে চায় না। হঠাৎ ছুটন্ত পায়ের শব্দে চমকে উঠল এরিক। ছোট ছোট পা ফেলে কেউ দৌড়াচ্ছে। জ্যান্ত!

দাঁড়িয়ে পড়ল এরিক। পকেট থেকে বের করল টর্চ। সুইচ টিপে জ্বালল।

টর্চের আলো সোজা গিয়ে পড়ল লাল টকটকে ছোট ছোট একজোড়া জ্বলন্ত চোখে। তীব্র ঘৃণা ফুটে আছে চোখের পাতায়। ভয় নয়, ক্রোধ সঞ্চারিত হলো এরিকের দেহে। কয়েক ডজন ছোট ছোট শরীর পড়ে আছে প্যাসেজে। লম্বা লেজঅলা শরীরগুলো লাইন বেঁধে এমনভাবে গা ঘেষাঘেষি করে আছে, দেখে চতুস্পদ সরীসৃপের মতো লাগল। ওয়াক থু! কতগুলো ইঁদুর।

ইঁদুরগুলো যে সত্যিকারের তাতে এরিকের কোনো সন্দেহ নেই। সে জানে প্রাচীন ভবনগুলোর ভূগর্ভস্থ কক্ষ হলো ইঁদুরের স্বর্গরাজ্য। আর এই স্যাডিস্টিক শো’র আয়োজকরা ইচ্ছে করে এখানে ইঁদুরগুলোর বংশ বৃদ্ধিতে বাধা দেয়নি, বরং বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলতে বাইরে থেকে ইঁদুর এনে ছেড়েও দিয়েছে হয়তো। গা গোলাচ্ছে এরিকের। রাগও হচ্ছে খুব। সে হোটেলে ফিরেই উইভারকে অনুযোগ করবে। বলবে পাতাল ঘরে এভাবে ইঁদুর

লালনপালন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার। ইঁদুর পালনের দায়ে উইভারের জরিমানাও হতে পারে। হয় ওগুলোকে উইভার তাড়ানোর ব্যবস্থা করবে নয়তো এরিক নিজে পেস্ট কন্ট্রোল অফিসে ফোন করে লোক ডাকিয়ে এনে ইঁদুর নিধনের ব্যবস্থা করবে।

জর্জ ভ্যালাঙ্গের এখনও কোনো চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে না এরিক। মানুষটা হয়তো এখানে আসেনইনি। আসলে বুড়োকে খুঁজতে আসাটা ছিল এরিকের একটা ছুতো। ওর ভৌতিক প্রাসাদটা আরেকবার ঘুরে দেখার সাধ জেগেছে, নিজের পৈশাচিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশটা এভাবেই ঘটিয়েছে ও। হেঁটে চলল এরিক। অদৃশ্য হয়ে গেছে ইঁদুরের দঙ্গল। কোনো গর্তে নিশ্চয় সেঁধিয়েছে। এরিক যতক্ষণ এখানে আছে ওদের টিকিটিও আর দেখা যাবে না হয়তো।

এরিক টের পেল ওর শরীর কাঁপছে। ইঁদুরগুলো ওর পিলে চমকে দিয়েছে। চলার গতি ধীর হলো এরিকের। বুকে হাত বাঁধল। মায়া নেকড়ে থেকে সাবধান। যে কোনো মুহূর্তে আস্তানা থেকে সগর্জনে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে তুমি আসতে পার, দোস্তো। আমাকে তুমি ভয় দেখাতে পারবে না।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। এরিক নিশ্চিত এটাই সেই জায়গা। এই তো সেই গুহা। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল এরিক। কিন্তু মায়া নেকড়ের চেহারা দেখা গেল না। হয়তো ওটার মেশিন বিকল হয়ে গেছে। কিংবা ছুটে গেছে বৈদ্যুতিক সংযোগ।

'বেরিয়ে এসো, বন্ধু,' ইচ্ছে করেই হাঁক ছাড়ল এরিক, নিজের কণ্ঠ বুকে সাহস যোগাল। কিন্তু মায়া নেকড়ের সাড়া নেই। এরিক টর্চ ঘুরিয়ে আলো ফেলল মুখ হাঁ করে থাকা কালো গুহায়। সাথে সাথে ঘাড়ের পেছনের সবগুলো চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল। তীব্র আতঙ্কের একটা ঝটকা খেল ও, ঘুরে দাঁড়াল পরমুহূর্তে। যেদিক থেকে এসেছিল ছুটল সেদিকে। গুহার ভেতরটা খালি, মায়া নেকড়ের চিহ্নমাত্র নেই!

আমার আসলে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ভাবল এরিক। এ জায়গাটা আমাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে। ভ্যাম্পায়ারটাকে আগের জায়গাতেই দেখতে পেল ও, যেখানে ওটার থাকার কথা ছিল। যদিও গতকাল সিড়ি গোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্যারোলিন চাডারটনের লাশের দিকে হাত বাড়িয়ে ইংগিত করছিল। আর এখন মায়া নেকড়ে উধাও।

ডামিগুলো আসলে ওর ওপর সাঙ্ঘাতিক প্রভাব বিস্তার করেছে, ভাবল এরিক। যারা প্রতিদিন এই হরর শো দেখতে আসে তাদের দশা বোধহয়

এরকমই হয়। উল্টোপাল্টা দেখে, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করে ও। অথবা এমনও হতে পারে বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে ওরা ভ্যাম্পায়ারটাকে সরিয়েছে এবং মেরামত করতে নিয়ে গেছে মায়া নেকড়েকে। তাই হবে! খড়কুটোর মতো এই যুক্তি আঁকড়ে ধরতে চাইল এরিক। এমন সময় অন্ধকারে খড়খড় শব্দ উঠল। ছোট ছোট পায়ে অন্ধকারে, ওর টর্চের আলোর সীমার বাইরে, ছুটে বেড়াচ্ছে যেন কারা। হারামজাদা ইঁদুরের বংশ। এরিক সিদ্ধান্ত নিল ও নিজে ইঁদুর মারার ওষুধ এনে এখানে ছিটিয়ে দিয়ে যাবে। কিমের কথা মনে পড়ল ওর। বউর উপদেশ শোনা উচিত ছিল। এখানে আবার আসা মোটেই উচিত হয়নি। এখন জলদি ভেগে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সামনে, আঁধারে নড়ে উঠল কিছু একটা। ম্লান ভৌতিক ল্যাম্পের আলোয় দেখা গেল ওটাকে। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে আলোতে। চৌকোণা, বিরাট একটা কাঠামো। গতকাল ওই জায়গায় ছিল ভ্যাম্পায়ার। এখন আবার কে চেহারা দেখাতে আসছে!

ওটা নিওলিথিক মানব, বন মানুষের মতোই চেহারা। তবে ভীষণ রকম জ্যান্ত। ওটা মাংস চিবাচ্ছে, হাত বেয়ে মেঝেতে টপটপ করে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। দাঁত দিয়ে মাংস ছেড়ার সময় জান্তব গলায় ঘোঁতঘোঁত শব্দ করছে। শুয়োরের মতো কুঁতকুঁতে চোখের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও সরল না এরিকের ওপর থেকে। নরখাদক!

'তোমাকে আমি ওপরে নিয়ে গিয়ে ডাইনিংরুমে বসিয়ে দেব, বন্ধু।' জোরে জোরে বলল এরিক। নিজের গলা শুনতে চায়। 'জর্জ ভ্যালান্সের ডিনারের সঙ্গী হিসেবে বেশ মানিয়ে যাবে তুমি।' হাসল এরিক তবে মোটেই জোরালো নয় হাসি। পাতাল ঘরে হাসিটি প্রতিধ্বনিও তুলল না।

জিভ বের করে ঠোঁট ভেজাল এরিক। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে চাইলে ওই দানবটাকে পাশ কাটাতে হবে। ওরা রক্ত হিসেবে যে উপাদানটা ব্যবহার করে তা ছিটকেও আসতে পারে গায়ে। তারচেয়ে বরং কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা যাক। নরখাদক নিজের ডেরায় ফিরে যাওয়ার পরে এরিক পা বাড়াবে গন্তব্যে।

কাঁচা মাংস দাঁতে ছিড়ছে নরখাদক। মুখে পুরে নিচ্ছে বড়বড় চাকলা। চিবুচ্ছে কচমচ করে। থুতনি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লাল টকটকে পদার্থটা, মেঝেতে, পায়ের কাছে জমা হচ্ছে। হাড় চিবানোর কড়মড়ে আওয়াজটা রীতিমতো রোমহর্ষক। মাংস চিবাতে চিবাতে ঘুরল বিকট প্রাণীটা। চলে যাচ্ছে।

নরখাদক চোখের আড়াল হতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এরিক। যাক বাবা, বাঁচলাম। আজকের মতো অ্যাডভেঞ্চার অনেক হয়েছে। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়াই মঙ্গল।

সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল এরিক। কয়েক কদম এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মেঝেয় ফেলল টর্চের আলো। মেঝের আয়তাকার অমসৃণ প্রস্তর ফলকের ওপর উবু হয়ে পড়ে আছে কেউ। পা ওপরের দিকে তোলা। যেন পেটের ব্যথায় অস্থির। আরেকটা লাশ– এখানে তো লাশ আর কংকালের ছড়াছড়ি। তবে এ শরীরটা গতকাল এখানে ছিল না। হয়তো কর্তৃপক্ষ এখানে এটাকে এনে রেখেছে। নিজেকে এই ব্যাখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারত এরিক। কিন্তু লাশটার পরনের কাপড়চোপড় বড্ড চেনা চেনা লাগছে যে...ভাঁজ পড়া, দাগঅলা নরফোক জ্যাকেট, পেটের নিচ থেকে বেরিয়ে থাকা টাইতে ডিমের দাগ। এলোমেলো ধূসর চুল...আর দেখার দরকার নেই এরিকের। বুঝতে পেরেছে লাশটা কার।

'জর্জ ভ্যালান্স?' ফিসফিস করল এরিক। এবারে নামটা প্রতিধ্বনি তুলল। ভ্যালান্স...ভ্যালান্স...ভ্যালান্স...

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে ও। স্যাঁতসেঁতে শীতল কক্ষটিতে আঁধার যেন আরও গাঢ় হয়ে এলো, মেঝেটা একবার উঁচু হয়ে আবার নিচের দিকে নেমে গেল, চেপে এলো চার দেয়াল, পরক্ষণে ফিরে গেল নিজেদের অবস্থানে। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে এরিক। টর্চের আলোতে দেখছে বৃদ্ধ লেখকের লাশ।

জোর করে লাশের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও। পা বাড়াল সামনে। তাকাতে না চাইলেও অদৃশ্য একটি শক্তি ওকে জোর করে চাইতে বাধ্য করল মৃত জর্জ ভ্যালান্সের দিকে। আপনি নিশ্চয় সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে যাননি জর্জ, কারণ সিঁড়ি থেকে আপনি অনেক দূরে আছেন। তাহলে আপনি মারা গেলেন কীভাবে?

টর্চের আলোয় ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখে ফেলল এরিক। মৃত লেখকের শরীর থেকে অনেকটা মাংস অদৃশ্য। যেন কেউ কেটে নিয়েছে মাংসের বড় একটা টুকরো।

অন্ধের মতো সিঁড়ির দিকে ছুটল আতঙ্কে থরথর করে কাঁপতে থাকা এরিক আর্মস্ট্রং। যেন ওকে তাড়া করেছে ভয়ঙ্কর সেই নরখাদক, একটু আগে যাকে মানুষের কাচা মাংস কচমচ করে চিবুতে দেখেছে ও। কানে এখনও ভেসে আসছে হাড় চিবুনোর মড়মড় শব্দ!

সাত

এরিক চলে যাওয়ার পরে কিছুক্ষণ লাউঞ্জে বসে থাকল কিম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরে। সূর্যের আলো খেলা করছে ওর মুখে, দিনের বেলা বলে ভয় লাগছে না। তবে অস্বস্তি বোধটা পুরোপুরি দূর হচ্ছে না। হোটেলটা প্রাসাদের মতোই ভীতিকর। দুটোকে আলাদা করা যায় না।

জর্জ ভ্যালান্সের যে কিছু একটা হয়েছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত কিম। নইলে তিনি অবশ্যই ডাইনিংরুমে খেতে আসতেন। লোকটা ভয়ানক পেটুক। না খেয়ে থাকতেই পারেন না। তার খাওয়ার দৃশ্য দেখলেও গুলিয়ে ওঠে গা।

রান্নাঘরে বাসনকোসনের ঠনঠন ঝনঝন শব্দ আসছে। ভেতরে লোকজনের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। হলওয়ের খোলা দরজা দিয়ে একজন রিসেপশনিস্টকে দেখতে পেল কিম। বসে আছে ডেস্কে। কালো চুলের বছর পঁচিশের একটি মেয়ে। জাবেদা খাতায় কিছু লিখছে গম্ভীর চেহারা নিয়ে। বেজে উঠল ফোন। রিসিভার তুলল মেয়েটি, স্থানীয় উচ্চারণে কী যেন বলল, তারপর রেখে দিল ফোন। ম্যানেজার-কাম-ওয়েটার উইভারের মতো এও রাম গড়ুরের ছানা। হাসিশূন্য মুখ। এ হোটেলে কি আর কেউ কাজ করে না? ভাবল কিম। হয়তো গাঁ থেকে আসে। খণ্ডকালীন। কাজ করে দিয়ে চলে যায়। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে তারা। এখানকার সবাই বোধহয় এরকমই। নিশব্দে, জিন্দালাশের মতো চলাফেরা।

জর্জ ভ্যালান্সকে সশরীরে, সুস্থ অবস্থায় না দেখতে পেলে এখানে আরেকটা রাত কাটানো সম্ভব নয় কিমের। জায়গাটা তার নার্ভের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। কিম এখন হানিমুনের কথা ভুলে যেতে চায়। চেয়ার ছাড়ল ও; বাইরে যাবে। লাউঞ্জে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

বাইরে আবার বইতে শুরু করেছে ঝোড়ো বাতাস। বড় বড় ঢেউ উঠেছে হ্রদে, আছড়ে পড়ছে তীরে। পানিতে চমকাচ্ছে রোদ, ধাঁধিয়ে দিল কিমের চোখ। হাত দিয়ে চোখ ঢাকল ও। তাকাল চারপাশে।

হোটেলের সামনে কংক্রিটের একটি প্যাশিও। নোংরা সিমেন্টের একটি দেয়ালও তৈরি করা হয়েছে প্যাশিও ঘেষে। কিমের বামে কার পার্কিং-এর জায়গা, নুড়ি পাথরে ঢাকা পথ। হাঁটার সময় পায়ের নিচে কড়মড় করে উঠল নুড়িগুলো। ওদের গাড়িটাকে খুঁজল কিম। দিন দুই আগে যেখানে পার্ক করে রেখেছিল সেখানেই আছে বাহন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিম। সাদা রঙের গাড়ি, গায়ের দু'পাশেই মেখে আছে কাদা। স্বাধীনতার জন্য ওদের লাইফলাইন, এই হররের রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায়। ওটা কাজের সময় চালু হলেই হয়। তিনজন মালিকের কাছে ছয় বছর যথেচ্ছভাবে ব্যবহার হওয়ার পরে গাড়িটির ওপর খুব বেশী ভরসা করা যায় না।

হ্রদের ওপাশে পাহাড়গুলোকে মনে হলো বিশাল এবং নিষিদ্ধ। চুড়োগুলো কালো, কিমের দিকে কারাগারের দেয়ালের মতো ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে রয়েছে যেন। গা-টা ছমছম করে উঠল কিমের। ও হ্রদের তীরে একটু হেঁটে বেড়াবে। সময় কাটাবে। এরিক বোধহয় শীঘ্রি মধ্যে ফিরছে না। কিমের হাতে অফুরন্ত সময়।

কিম প্যাশিওর সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়িগুলো নেমে গিয়ে মিশেছে ভেজা জমিনে, ঘাসের সাথে। বাবা মাকে চিঠি লিখতে হবে। নইলে ওরা চিন্তা করবেন। হোটেল ডেস্কে পোস্টকার্ড বিক্রি করে। কিম লিখবে ওর সময় ভালোই কাটছে। যদিও কথাটা মিথ্যা।

হঠাৎ থমকে গেল কিম। নিজেও জানে না কেন। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফশীতল জল। মাংসের মধ্যে যেন কিলবিল করে হেঁটে বেড়াচ্ছে একটা পোকা, মনে হলো কেউ ওকে লক্ষ করছে।

মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে সাহস হলো না কিমের। কেউ যদি ওকে লক্ষ করেই থাকে, সম্ভবত হোটেল থেকে দেখছে ওকে। সম্ভবত উইভার অথবা রিসেপশনিস্ট। কারণ ওদের তো হাতে কোনো কাজ নেই। তাই হয়তো দেখছে কোথায় যাচ্ছে কিম। জর্জ ভ্যালান্স হতে পারেন। প্রাসাদে নৈশ অভিযান শেষে ডাইনিংরুমে ঢুকেছেন, এরিককে খুঁজছেন। না, ওরা কেউ নয়– কিম ভালো করেই জানে। অন্য কেউ...অন্য কিছু।

ঘোরো। ঘুরে দ্যাখো।

না, আমি তাকাতে পারব না।

অবশ্যই তোমাকে তাকাতে হবে।

ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল কিম। দেখতে পেল কুকুরটাকে। আঁতকে উঠল ও। ওর মস্তিষ্কের ভেতরে প্রায়ই যে ক্ষীণ কণ্ঠটা ফিসফিস করে চলে, ওটা আকস্মিক আর্তচিৎকার করে উঠল ভয়ে। কিমের গায়ে আছড়ে পড়ল বাতাস, যেন দমকা হাওয়া ওকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইল প্যাশিওর দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটার দিকে।

ওটা একটা অ্যালসেশিয়ান। ধূসর রঙের। বিশাল। চর্মরোগে গায়ের পশম উঠে গেছে থোকায় থোকায়। ফুলে আছে পেশী। যেন এখুনি হামলে পড়বে। ভয়ঙ্কর চেহারার একটা জানোয়ার, লোমের নিচে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ছোট ছোট চোখ জোড়া, ঠোঁট বেয়ে ঝরছে হলুদ লালা। মৃদু গলায় গোঁ গোঁ শব্দ করছে কুকুরটা। তবে বাতাসের গর্জনে গোঙানি শুনতে পাচ্ছে না কিম।

পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠল কিমের। পা জোড়া মনে হলো রাবারের তৈরি, যেন এখনই পিছলে পড়ে যাবে মাটিতে। মাথার ভেতরে কেউ ওকে তারস্বরে বলছে পালাও! পালাও! পারব না। ক্রুদ্ধ কুকুরের দিকে কখনও পেছন ফিরতে নেই। তবে জন্তুটা ওকে আক্রমণের কোনো লক্ষণই দেখাল না, কুড়ি গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকল আগের মতোই ভীষণ চোখ মেলে।

কিমের বাবা কৈশোরে মেয়েকে একটি কুকুর ছানা উপহার দিয়েছিলেন। ওটাও ছিল অ্যালসেশিয়ান, ক্রস-ব্রীড। খেলা করত কিমের সাথে। একদিন কিম কুকুরটার সাথে খেলছে, ঝাপাঝাপি করছে ফ্লোরে, হঠাৎ কী কারণে যেন মুড বদলে যায় জানোয়ারটার। খেঁকিয়ে উঠে কামড় বসিয়ে দেয় কিমের হাতে। সেবার ছ'টা সেলাই পড়েছিল কিমের হাতে। বাবা পরদিনই কুকুরটাকে খোঁয়াড়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওটার চেহারাও আর কোনোদিন দেখেনি কিম। এরপরে ওরা আর কুকুর পোষেনি।

কৈশোরের সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি হঠাৎ ভিড় করল কিমের মস্তিষ্কে। এ কুকুরটা সেই অ্যালসেশিয়ান নয়তো? এতদিনে বড় হয়ে গেছে। চিনতে পেরেছে কিমকে। এখন প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

ভয় পেয়ো না, নিজেকে বলল কিম। হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে তাকাল। কুড়ি গজ দূরে এন্ট্রাস, অ্যালসেশিয়ানটাও একই সমান দূরত্বে

দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে এসে যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু কেন হামলা করবে, যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে চাইল কিম। আমি তো ওর কোনো ক্ষতি করিনি। তবে পাগলা কুত্তার হামলা করার জন্য কোনো কারণের দরকার হয় না। দমকা হাওয়া থেমে গেল এক মুহূর্তের জন্য। জানোয়ারটার গর্জন শুনতে পেল কিম। গলার ভেতর থেকে ভারী মেঘ গর্জনের মতো বেরিয়ে আসছে। ওটার হলুদ, ধারালো এবং তীক্ষ্ণ দাঁত দেখতে পেল এক ঝলক। সাক্ষাৎ শয়তান! ওহ্, গড!

পিছু হেঁটে হোটেলে ফিরবে ঠিক করল কিম, সাহায্যের আশায় জানালার দিকে তাকাল। প্রার্থনা করল যেন কাউকে দেখতে পায়। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। কিম একা এবং অসহায়, জানোয়ারটার ওপর নির্ভর করছে ওর বাঁচা-মরা।

নড়ল কিম। একটা করে কদম ফেলছে; ঝাঁকি খেল। ভেজা শ্যাওলায় পা পড়েছে। ধড়াশ ধড়াশ লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কুকুরটার ওপর থেকে চোখ সরানো যাবে না, সারাক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, মনে মনে বলল ও।

'গুড বয়, তুমি একটি ভালো ছেলে,' বিড়বিড় করল কিম। কিন্তু ওটা মোটেই গুডবয় নয়। ওটা মূর্তিমান আতঙ্ক।

জানোয়ারটার চোখ জ্বলে উঠল। লক্ষ করছে কিমের প্রতিটি নড়াচড়া। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল ওটা, নিচু গলায় গর্জন ছাড়ল। সতর্ক করে দিল যেন– আর এক পাও নড়ো না। আরেক কদম ফেলল কিম। ঘুরল ওটা, পা বাড়াল। তারপর থেমে গেল। ওটার মুখে এক ফালি রুপোলি রোদ, আধবোজা লাল চোখ জ্বলে উঠল। যেখানে আছ সেখানেই থাকো!

আরেক কদম পেছাল কিম, অ্যালশেসিয়ানটাকে এগোতে দেখে আরেকটু হলেই ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। কয়েক গজ জায়গা অতিক্রম করল কুকুর, তারপর ব্রেক কষল। আড়ষ্ট শরীর, শক্ত হয়ে গেছে পেশী, পেছনের শক্তিশালী পা জোড়া লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত।

'গুড বয়, আমি তোমাকে মারব না,' অত্যন্ত হাস্যকর একটা কথা বলল কিম। জানে ওটাকে আঘাত করার কোনো সুযোগই ওর নেই। এক লাফেই জানোয়ারটা ওকে পেড়ে ফেলতে পারবে মাটিতে, ওই ভয়ংকর চোয়ালের কামড়ে কিমকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে এক মিনিটও লাগবে না। কী করবে বুঝতে পারছে না কিম। ওর মস্তিস্ক কাজ করছে না। ও স্থির

দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে কুকুরটার দিকে। চোখ সরাতে পারছে না।

আরও এক গজ জায়গা পার হলো অ্যালসেশিয়ান। এবার ডানদিক দিয়ে আসছে, বাধ্য হয়ে বামে যেতে হলো কিমকে। আবার একই কাজ করল কুকুর। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারল কিম। জানোয়ারটা ওকে হোটেলের এন্ট্রান্স ডোর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতলব করেছে। দূরে নিয়ে গিয়ে ওকে মেরে ফেলবে!

অ্যালসেশিয়ান ধীরে ধীরে কিমকে প্যাশিওর কিনারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে কোনো জানালা নেই। ওদিক অন্ধকার, আবর্জনায় ঢাকা। ওদিকে কেউ ওদের দেখতে পাবে না।

কিন্তু কুকুরটা কিমকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে সেদিকেই ওকে যেতে হবে। কোনো উপায় নেই। আর কয়েক মুহূর্ত। তারপরই শয়তানটার মতলব হাসিল হবে। শেষবারের মতো হোটেলের জানালায় তাকাল কিম। মরিয়া হয়ে খুঁজল একটা মুখ। কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। হোটেলটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ওটাকে শীতকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সবাই চলে গেছে, বসন্তের আগে আর ফিরবে না।

পায়ের গোড়ালিতে অ্যালুমিনিয়ামের ডাস্টবিনের স্পর্শ পেল কিম। মরিয়ার মতো একটা অস্ত্র খুঁজল, বাড়ির সামনের আঙিনায় অপর পাশে ডাস্টবিনের ঢাকনা পড়ে আছে। ওটা তুলে আনার সময় পাবে না কিম। তার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কুকুর। বাঁচার আশা ছেড়ে দিল কিম। ফোঁপাতে লাগল।

কোনো তাড়া নেই অ্যালসেশিয়ানের। ওটার চোখে এখন ঝিকমিক করছে কৌতুক। যেন বলছে তোমাকে বাগে পেয়েছি, মেয়ে। এবার পালাবে কোথায়। তোমাকে এখন যে কোনো মুহূর্তে খুন করতে পারি। আমার কোনো তাড়া নেই কারণ কেউ তোমাকে দেখবে না। অথবা শুনবে না তোমার চিৎকার।

কুকুরটা কিমকে নিয়ে খেলছে। অর্ধেক খোলা চোয়ালের ফাঁকে ঝকঝক করছে শ্বদন্ত, চ্যালেঞ্জ করছে কিমকে—পারলে দৌড়াও। ছুটলেই তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি। ছিড়ে ফালাফালা করে ফেলব শরীর। কিন্তু দৌড়াতে পারল না কিম। কুঁকড়ে আছে ও, গলা দিয়ে ভয়ার্ত কুকু আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, চোখে নীরব আকুতি—আমাকে মেরো না। খেলাটা খেলছে কুকুর একাই। জীবন-মৃত্যুর খেলা। ওটা বেঁচে থাকবে,

মারা যাবে কিম।

ঈশ্বর, জানোয়ারটার গায়ে কী বিশ্রী গন্ধ! অনেকদিন হয়তো নিজের আস্তানা থেকে বেরোয়নি ওটা। বোঁটকা গন্ধে ভারী করে তুলেছে বাতাস। ওটা আবার গরগর করে উঠল। হত্যা করার উত্তেজনায় অস্থির।

চোখ বুজল কিম। থরথর করে কাঁপছে পা। এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে ও। তাহলেই ভালো। এ আতঙ্কের কবল থেকে রক্ষা পাবে। মাথা ঘুরছিল। হঠাৎ কেটে গেল ঝিমঝিম ভাবটা। দেখল জানোয়ারটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

ভয়ানক দৃশ্যটা দেখে গা গুলিয়ে উঠেছিল এরিক আর্মস্ট্রংয়ের। জর্জ ভ্যালান্স নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। চেহারাটা চেনা যাচ্ছে না। ছিন্নভিন্ন একটা শরীর। রক্তাক্ত। গাল থেকে অনেকখানি দাড়ি উপড়ে ফেলা হয়েছে। বিস্ফোরিত চোখ। চাউনি দেখে বোঝা যায় অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে মারা গেছেন বৃদ্ধ।

নরখাদককে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ফিরে গেছে নিজের আস্তানায়। শুধু ছোট ছোট পায়ের ছুটন্ত শব্দ। সেই ইঁদুরগুলো আবার! মাথা ঝিমঝিম করছে এরিকের। জানে এখন অজ্ঞান হয়ে গেলে ইঁদুরগুলোর পরবর্তী খাবার হবে সে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না তবে সত্যি এটাই যে মডেলগুলো ডামি নয়, ওগুলোর প্রাণ আছে এবং জ্যান্ত। যদিও পুলিশ ইন্সপেক্টর এ কথা শুনলেও জীবনেও বিশ্বাস করবে না।

এরিক ফিরে এলো হোটেলে। লম্বা জানালা দিয়ে আসছে দিনের আলো, রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা মসলার গন্ধ এবং মানুষজনের সাড়া পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও।

আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠল এরিক। ভূতের মতো লাগছে দেখতে। মুখটা সাদা, চুলগুলো কাকের বাসা। ওর তাজা বাতাস দরকার। কিমের সাথে দেখা করার আগে একটু স্বাভাবিক হয়ে নিতে চায় ও।

ফয়ারে হেঁটে এলো এরিক। খালি। কালো চুলের রিসেপশনিস্টকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ফ্রন্ট ডোর ঠেলে খুলল ও। গায়ে ধাক্কা মারল দমকা হাওয়া। বাতাসে নিশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করল এরিক। উল্টো বাতাসের প্রবল চাপে দম যেন বন্ধ হয়ে এলো। মুখ ঘোরাল এরিক।

বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ এলো কানে। শব্দটা কীসের বুঝে উঠতে এক সেকেন্ড সময় নিল মস্তিষ্ক। ভয়ংকর গলায় গর্জন করছে

কোনো কুকুর। ঝট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ভয়ের ছুরি বিঁধল বুকে। পাতালঘর থেকে নির্ঘাত পালিয়ে এসেছে মায়া নেকড়ে।

...কী সব উল্টোপাল্টা ভাবছ, নিজেকে চোখ রাঙাল এরিক। তোমার মাথাটাই আসলে গেছে।

বামে ফিরল এরিক। বাতাসের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এগোল ভবনের কিনারে। কিছু একটা ক্রুদ্ধ করে তুলেছে কুকুরটাকে। ব্যাপারটা কী দেখতে হয়...

হা ঈশ্বর! অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল এরিকের। যা দেখছে মস্তিষ্ক তা গ্রহণ করতে চাইছে না। দানব একটা অ্যালসেশিয়ান, কুঁজো হয়ে আছে, খোলা চোয়াল দিয়ে লালা ঝরছে, কিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। ভীত-সন্ত্রস্ত কিম ডাস্টবিনের আবর্জনার মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে।

মস্তিষ্কের আগে সাড়া দিল শরীর। ঝুঁকে মাটি থেকে টেনিস বলের সাইজের একখণ্ড কংক্রিট তুলে নিল এরিক। ছুড়ে মারল কুকুরটাকে লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ?

ব্যথায় কেউ করে উঠল অ্যালসেশিয়ান। ঝট করে ঘুরে গেল। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো। ওটার হিংস্র মুখ চেনা চেনা লাগল এরিকের। ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে চার হাত পায়ে ছুটে আসতে লাগল জানোয়ার এরিককে লক্ষ করে, গলা দিয়ে মেঘ ডাকার শব্দ বেরুচ্ছে।

'এরিক!' চিৎকার করে উঠল কিম।

'দৌড়াও, ডার্লিং, এখন!' কংক্রিটের আরেকটা মিসাইল খুঁজল এরিক। পড়ল না চোখে। শুধু কয়েকটা খালি ক্যান, উচ্ছিষ্ট খাবার আর একটা বোতল পড়ে আছে মাটিতে।

লেমোনেডের খালি বোতলটিই তুলে নিল এরিক। মাটিতে বাড়ি মেরে দুটুকরো করল। ধারাল ফলাটা বাড়িয়ে ধরল ছুরির মতো। চট করে দাঁড়িয়ে গেল জানোয়ার, হিংস্র ভঙ্গিতে গর্জন ছাড়ল।

'সাহস থাকলে এবার সামনে আয়। তোর গলাটা কাটি।' হাঁক ছাড়ল এরিক। তবে সন্দেহ আছে বিশালদেহী কুকুরটার থাবার আঘাত এ অস্ত্র দিয়ে ঠেকানো যাবে কিনা। কিম এখনও দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়; নড়াচড়া করতেও যেন ভুলে গেছে।

'কিম, ভাগো!'

কিন্তু ভাগতে পারল না কিম। ওর পা এমন কাঁপছে, শরীরের ভরই

যেন বইতে পারছে না। বিস্ফারিত চোখ, রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে মুখ, কথা বলার চেষ্টা করছে। তবে রা ফুটছে না।

মানুষ এবং পশুর মাঝে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। প্রাচীন সেই চ্যালেঞ্জ। অ্যালসেশিয়ান অত্যন্ত নিচু গলায় গরগর করছে, শোনাই যাচ্ছে না প্রায়। ছোট ছোট চোখে অনিশ্চিত চাউনি; বোধহয় ভয়। ওটা পিছিয়ে গেল এক কদম।

'আয় হারামজাদা! পারলে গলা কামড়ে ধর।' হিসিয়ে উঠল এরিক। শরীরের নিচে গুটিয়ে গেল লেজ। চঞ্চল চোখে ডানে বামে নড়ছে। তারপর ওটা পালাবার রাস্তা পেয়ে গেল। দেয়ালের ওপর লাফ দিল কুকুর, শরীরটা ছিটকে গেল পার্কিং এরিয়ায়। পরমুহূর্তে খাড়া হলো। ছুটল হ্রদের তীর ঘেঁষা ঘন অরণ্য অভিমুখে।

'ইউ ফাকিং কাওয়ার্ড!' ভয় এবং ক্রোধ মেশানো গলায় হুংকার ছাড়ল এরিক। সেই সাথে ফুটল উল্লাস। 'সাহস থাকলে ফিরে আয়...'

পেছনে কিছু একটা পতনের শব্দে বিদ্যুৎবেগে ঘুরল এরিক। ভুলে গেল কুকুরের কথা। হাত থেকে ফেলে দিল ভাঙা বোতল। ছুটে গেল কিমের কাছে। এত ধকল আর সইতে পারেনি কিম, অজ্ঞান হয়ে গেছে। পড়ে গেছে আবর্জনার স্তূপে।

'আহারে সোনা আমার।' এরিক বউকে স্বচ্ছন্দে পাজাকোলা করে তুলে নিল, পা বাড়াল হোটেল এন্ট্রান্সে। 'যেশাস গড, এখানে কী হচ্ছে?'

ফ্রন্ট ডোরের কাচ দিয়ে ম্যানেজারের লম্বা শরীরটা দেখতে পেল ও রিসেপশন ডেস্কের কাছে। 'তোমার কাছে আমার অনেক প্রশ্ন আছে,' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'এবং সত্য জবাবটাই আমার চাই।'

আট

'এসব আজগুবি কথা বাদ দিন তো, মি. আর্মস্ট্রং,' ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাচিন ভুরু কুঁচকে তাকাল এরিকের দিকে। টান দিলেন মুখের পাইপে। কিন্তু পাইপের তামাক রাখার জায়গাটাতে কোনো কারণে ব্লক তৈরি হয়েছে। ফরফর করে শব্দ হলো। এটা কোনো যুক্তির মধ্যেই ফেলা যায় না যে একটা নরখাদক খেয়ে ফেলেছে জর্জ ভ্যালান্সকে কারণ ওই জিনিসটা পুরোপুরি প্লাস্টিকে তৈরি এবং ওটা বিদ্যুৎ শক্তিতে চলে।

'কিন্তু গতকাল থেকে ওটা নিজে নিজেই চলাফেরা শুরু করেছে,' দৃঢ় গলায় বলল এরিক। 'আমি ব্যাপারটা জানি। কারণ নিজের চোখে ওকে দেখেছি।

'আসলে ইঁদুরগুলো বুড়ো মানুষটার অমন দশার জন্য দায়ী,' খেঁকিয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। 'এ জায়গায় ইঁদুরের অভাব নেই। পোস্টমর্টেম করলেই জানা যাবে কীভাবে মারা গেছেন ভ্যালান্স। তবে আমি নিশ্চিত হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল তাঁর। তাঁর বয়সী মানুষের রাতের বেলা হাউজ অব হরর-এ যাওয়া ঠিক হয়নি। তবে আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি ইঁদুরের কবলে পড়ার আগেই মারা গেছেন ভ্যালান্স।'

'আপনি তো খুব একগুঁয়ে লোক মশাই,' গম্ভীর গলায় বলল এরিক। 'নিজের মতটাকেই শুধু গুরুত্ব দেন। মায়া নেকড়েটা যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার কী ব্যাখ্যা?'

'আমাকে কেউ বলেনি কোনো মায়া নেকড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অভিযোগ এলে আমি বিষয়টি তদন্ত করব। মি. উইভারকে জানিয়ে দেব আপনি বলছেন ওটার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও হোটেলের চার্জে শুধু উনিই আছেন। সামারের সময় গ্লোব ট্যুরস তাদের নিজেদের লোক নিয়োগ দেয়। তবে সে লোকটি এ মুহূর্তে এখানে নেই। উইভার অবশ্য হরর শো'র সব খবরই জানে।'

'আর যে অ্যালসেশিয়ানটা আমার বউকে হামলা চালাল ওটার কী হবে?'

'আপনার স্ত্রীকে কোনো কুকুর হামলা চালায়নি, মি. আর্মস্ট্রং,' বিরক্তি ফুটল মাচিনের কণ্ঠে। 'আপনার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ওটা শুধু ভয় দেখিয়েছে।'

'আমি যখন দৃশ্যপটে হাজির হই ওটা তখন হামলার পাঁয়তারা কষছিল।'

'কিন্তু হামলা চালায়নি। ইচ্ছা করলে কুকুরটার বিরুদ্ধে আলাদাভাবে আপনি অভিযোগ করতে পারেন। আমি তদন্ত করে দেখব। তবে এ মুহূর্তে আমি দু'টি মৃত্যু নিয়ে তদন্তে ব্যস্ত আছি। এর একজন মারা গেছেন ফালতু বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে, অপরজনের মৃত্যু ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে। তবে করোনারের রিপোর্ট হাতে না আসা পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আপনি বলতে চাইছেন ভ্যালান্সকে কেউ হত্যা করেছে।'

'হত্যা করেছে কী করেনি তা তো দেখা যাবেই,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এরিক। 'এখন বলুন, আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে কবে ছাড়বেন?'

'আপনাদেরকে তো আজ সকালেই ছেড়ে দিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আরও দু'একটা দিন আপনাদেরকে এখানে থাকতে হচ্ছে। কিছু জেরা আছে। আপনাদের সন্তুষ্টির জন্য জানাচ্ছি, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে মিসেস চাডারটন সিঁড়িতে পা পিছলে মারা গেছেন। তাঁর ঘাড়ে কামড়ের দাগ পাওয়া গেছে। ইঁদুর-টিদুর বোধহয়। এখানকার ইঁদুরগুলোর মানুষের মাংসেও অরুচি নেই মনে হচ্ছে।'

শক্ত হয়ে গেল এরিকের শরীর, এক মুহূর্তের জন্য দুলে উঠল ঘর। 'অ: আচ্ছা। মনে হচ্ছে আরও একটা রাত এখানে কাটাতে হবে।'

'ভালো কোনো হোটেল না পাওয়া পর্যন্ত তো আপনাদেরকে এখানে থাকতেই হচ্ছে। কাল আপনাদেরকে ছেড়ে দেব। তবে সন্ধ্যার আগে নয়।' যদি না আর কোনো মৃত্যুর ঘটনা না ঘটে, ভাবল এরিক।

'এই অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা কোত্থেকে এলো?' ম্যানেজারের অফিসে বসেছে এরিক সিমন উইভারের মুখোমুখি। বহু প্রাচীন রয়াল টাইপরাইটারে টাইপ করতে গিয়ে গলদঘর্ম অবস্থা উইভারের। গ্লোব ট্র্যাভেলস খরচ বাঁচাতে কিছু কিছু জায়গায় কার্পণ্য করেছে। এটি তার মধ্যে একটি।

'অ: আচ্ছা, অ্যালসেশিয়ান,' এক মুহূর্ত যেন দ্বিধা করল উইভার, তারপর দেঁতো হাসি হাসল। 'কুকুরটাকে আপনারা দেখেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওটার মালিক কে?'

'আপনার মতো আমিও জানি না ওটার মালিক কে।' কাঁধ ঝাঁকাল উইভার। 'আপনার বর্ণনার সাথে মিলে যায় এরকম একটা কুকুর গত বসন্তে পাহাড়ে বেশ কিছু ভেড়া হত্যা করেছে বলে অভিযোগ আছে। কৃষকরা বন্দুক নিয়ে ওটাকে অনেক খুঁজেছে। কিন্তু ওটার আর দেখা মেলেনি। আপনার স্ত্রীকে যে কুকুরটা হামলার চেষ্টা করেছিল সেটা যদি ওই অ্যালসেশিয়ানটাই হয়, মেষপালকদের কবল থেকে ওর আর নিস্তার নেই।'

'আর এখানে যেসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে তার ব্যাখ্যা কী? ডামিগুলোকে দেখা যাচ্ছে তাদের জায়গা বদল করছে।'

'আপনি বোধহয় ভুল করছেন। ডামিগুলোকে ফিক্সড করে রাখা হয়েছে...'

'আমি কোনো ভুল করিনি, মি. উইভার। এখানে কিছু একটা ঘটছে এবং আপনি তা লুকোবার চেষ্টা করছেন।'

'আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন!' রাগে গনগনে দেখাল ম্যানেজারের চেহারা, সরু হয়ে উঠল চাউনি। 'আপনার মিথ্যা কথা শোনার আমার সময় নেই। এবং এসব কথা যদি ছড়াতে শুরু করেন, আপনার বিরুদ্ধে অপবাদের মামলা ঠুকে দেব আমি।'

'হা! হা! খুব মজার কথা শোনালেন বটে!' নাক সিঁটকাল এরিক।

'এখানে যে দু'জন মানুষ মারা গেছে তা জানাজানি হতে বেশি সময় লাগবে না এবং আপনার ক্যাসল অব হরর-এর বোগাস বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যাবে।'

'কিন্তু ঘটবে তার উল্টোটা,' রাগের আভা অদৃশ্য হয়ে গেছে উইভারের মুখ থেকে। সে খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠল। 'সত্যি বলতে কী, আজ বিকেলেই আমরা কয়েকটি বুকিং পেয়েছি। আমার পার্টটাইম কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগও করেছি। তাদের কাজে যোগ দিতে বলেছি। কাল নাগাদ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে কাজ। আপনারা যদি হোটেল ছেড়ে দিতে চান, মি. আর্মস্ট্রং, চলে যেতে পারেন। আপনাদের রুম জলদি ভাড়া হয়ে যাবে। তবে আগেই বলেছি ভাড়ার টাকা ফেরত দিতে পারব না।'

'আপনি আসলে একটা পিশাচ,' দরজার দিকে পা বাড়াল এরিক। 'আমার মনে হচ্ছে সবকিছুর জন্য আপনিই দায়ী। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি– এখানে কী ঘটছে সে রহস্য আমি উদঘাটন করবই!'

'ইন্সপেক্টরের ধারণা সে তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। তিক্ত কণ্ঠে বলল কিম। 'কিন্তু তাকে তো আর এখানে রাত কাটাতে হচ্ছে না।'

'আমি কুকুরটার ব্যাপারে অফিশিয়াল কমপ্লেন করেছি,' বলল এরিক। 'পুলিশ বলেছে বিষয়টি তদন্ত করবে।'

'তবে তুমি কিন্তু ওই পাতাল ঘরের ধারেকাছেও যাবে না। এবং এটা একটা হুকুম।'

'জো হুকুম, বেগম সাহেবা,' মশকরা করে কুর্নিশ করল এরিক।

'তবে পুরানো প্রাসাদে ওপরের অংশটাতে একবার ঢুঁ মারতে চাই। এবং সেটা দিনের বেলায়। ওখানে অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই কেবল কতগুলো ভাঙাচোরা ঘর ছাড়া। আর ওখানে যে হরর শোর ব্যবস্থা করা হয়েছে তা কমেডি শো ছাড়া কিছু নয়। হাসতে হাসতে তোমার পেটে খিল ধরে যাবে।'

জানালার দিকে তাকাল কিম। সাঁঝ নামছে। 'কাল এখান থেকে বেরুতে পারলেই বাঁচি। ভালো কথা, বাবা-মাকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেছি এখানে ভালোই আছি।'

'এখানে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' বউর সরু কোমরে হাত রাখল এরিক। 'শুধু আবহাওয়া ছাড়া। বিকেলের খবরে বলল ঝড় আসছে।'

'কিন্তু ঝড়টা এখনও আটলান্টিকে।'

'আসছে তো এদিকেই। হারিকেন অ্যাঞ্জেলা। ফ্লোরিডার অর্ধেক উপকূল ইতিমধ্যে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে ঝড়টা। এগিয়ে আসছে স্কটল্যান্ডের দিকে।'

গোসল করবে ঠিক করল কিম। গোসলের দু'রকম ব্যবস্থা আছে। বেডরুমের কিনারে পর্দা টাঙিয়ে বাথরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে করিডরের শেষ মাথায় ফুল বাথরুম রয়েছে। সকালে অবশ্য একবার গোসল করেছে কিম। তবে আরেকবার গোসল করলে শরীরটা একটু রিল্যাক্স হবে। আড়ষ্ট হয়ে আছে ও, ক্রমবর্ধমান টেনশন ওকে ভীত করে তুলেছে। অ্যালসেশিয়ানের সাথে লড়াই কিমকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এরিক ডাক্তার ডাকতে চেয়েছিল। রাজি হয়নি কিম। সে অচেনা ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী একগাদা বড়ি গিলতে চায় না। ওর মাথা ব্যথা করছিল। তাই অ্যাসপিরিন খেয়েছে। বোতলটার দিকেও তাকাতে ভয়

লাগছিল কিমের, মনে হচ্ছিল ওটা বোতল নয়, মুখ। মুখটার চোখ এবং নাক আছে। ফিসফিস করে বলছে, 'সবগুলো ট্যাবলেট খেয়ে নাও। তাহলে আর ভয় লাগবে না।' নিজের মনকে বুঝিয়েছে কিম– ওটা স্রেফ বোতল ছাড়া কিছু নয়। তারপর সত্যি মুখটার রূপান্তর ঘটেছে সাধারণ বোতলে। ও কেন একটা বোতলকে মুখ বলে ভাবতে গেল? নিজেরই লজ্জা লাগছে। আসলে গত কয়েকটা রাতের ধকল ওর মনটাকে বিক্ষিপ্ত করে রেখেছে। এখন গোসল সেরে চমৎকার একটা ঘুম দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

'তুমি ঠিক আছ তো?' কিমকে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল এরিক।

'অবশ্যই আমি ঠিক আছি,' চাবুকের মতো শোনাল কিমের কণ্ঠ। তবে সুরে ক্রোধ নেই। 'আমি গোসল করতে যাচ্ছি। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমাব।'

'চলো, এক সাথে গোসল করি।'

প্রস্তাবটার মধ্যে যৌন ইংগিত আছে। এরকম অভিজ্ঞতা এখন পর্যন্ত হয়নি ওদের। মুক্ত মন এবং তাজা শরীর এ প্রস্তাবে সাড়া দিত লাফিয়ে উঠে, বিশেষ করে যখন ওরা হানিমুনে এসেছে। কিন্তু বিধ্বস্ত মস্তিষ্ক সাড়া দিতে চাইল না। 'আজ নয়। অন্য কোনোদিন হবে।'

পেছনে বেডরুমের দরজা বন্ধ করল কিম, পা বাড়াল করিডরে, বাথরুমের দিকে। পায়ে এখনও জোর পাচ্ছে না ও, মাথাটা দপদপ করেই চলেছে।

বাথরুমটা বেশ বিলাসবহুল– বাথটারের সাথে তাল মিলিয়ে গোলাপি টাইলস বসানো হয়েছে। মেহমানদের আরামদায়ক গোসলের জন্য সবরকম সুবিধার ব্যবস্থা আছে। কাপড় খুলল কিম, খুলে দিল পানির ট্যাপ, ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগল বাথটাবে। সাবানদানি থেকে তুলে নিল গোলাপি রঙের বাবল-বাথ। দ্রুত ফেনায় ভরে গেল বাথটাব।

বাথটাবে নেমে পড়ল কিম। হাত-পা ছড়ানোর মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে এখানে। শরীরটা হালকা লাগল, পালকের মতো যেন ভাসছে সারফেসে। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল কিম। বাথটাবে শুয়ে থাকল ও, তাকাচ্ছে ঘরের চারপাশে।

অতিথিদের জন্য সেলোফোনে মোড়া টুথব্রাশও আছে। যদি তারা ব্রাশ আনতে ভুলে যায় সে জন্য এ ব্যবস্থা। তিন/চার রকমের বিভিন্ন ব্রান্ডের ও স্বাদের টুথপেস্ট, শেভিং ফোম, শেভার, একটি সেফটি রেজর। রেজরটির

ব্লেড ভাঁজ করা। ওটা ঝুলছে একটি হুকে। ওই ব্লেড দিয়ে অনেকে আত্মহত্যাও করে! বিশ্রী চিন্তাটা মাথা থেকে দূর করে দিতে চাইল কিম। গেল না। ফলাটা খুবই ধারাল। ওটার এক পোঁচ দিলেই দু' ফাঁক হয়ে যাবে জুগুলার ভেইন অথবা কব্জির ধমনী। য়্যাক থু! মা'র অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা ভেসে উঠল কিমের চোখে। রুটি কাটার ছুরি দিয়ে রুটি কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলেছিলেন মা। দরদর ধারায় রক্ত পড়ছিল। সারা কিচেনে ছড়িয়ে পড়েছিল লাল টকটকে রক্ত। মা'র চিৎকার যেন এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিমের কানে। মা চিৎকার করছেন, টেবিলের কাপড় হাতে চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আতংকিত বাবা তোয়ালে ছিঁড়ে মা'র হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। ওদের চেষ্টায় রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি। কিম ফোন করে ডাক্তারকে। তোয়ালের ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার আসার পরে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছিল সবাই। সে দৃশ্যটা মনে পড়লে কিমের গা-টা এখনও কেমন শিরশির করে।

বাথটাবে শুয়ে থাকতে ঘুম ঘুম একটা ভাব চলে এলো কিমের। মুদল চোখ। ফেনায়িত পানি ঝিরঝির ঝরছে ওর ঘাড়ে, আরাম লাগছে। অল্প অল্প নাক ডাকছে কিমের। ও কি ঘুমিয়েই পড়ল নাকি? অবশ্য ঘুমালে কীইবা আসে যায়? ওর কোনো তাড়া নেই। এই ভয়ংকর ক্যাসল হোটেলের কথা মন থেকে দূর করার মোক্ষম উপায় ঘুমিয়ে থাকা।

হালকা একটা ঘুমের স্তরে চলে গেল কিম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখল ও টর্চার চেম্বারে চলে এসেছে। চাকার সাথে বেঁধে রাখা মহিলাটি অন্য কেউ নয়, ও নিজে। চাকাটা ঘুরছে সেই সাথে কিম একবার ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, আবার নামছে নিচে। কাঁটাগুলো বিঁধে যাচ্ছে শরীরে, কিন্তু কোনো ব্যথা টের পাচ্ছে না কিম। নিজেকে যেন সে সমর্পণ করে দিয়েছে চাকার কাছে। তার বুক যেন লাল ফিতেয় পরিণত হয়েছে, ঘোরার সাথে রক্তও ঝরছে। চারিদিকে রক্ত। চোখ বুজল কিম। কিন্তু অন্ধকারের রঙও লাল। নরখাদকটা দাঁড়িয়ে দেখছে ওকে, মানুষের মাংস চিবাচ্ছে; চিবুকের কষ বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্ত। সব জায়গায় শুধু রক্ত আর রক্ত!

কিমকে মুক্ত করে দেয়া হলো চাকা থেকে। হাঁটতে লাগল ও। দরদর ধারায় গা থেকে রক্ত পড়ছে। এটা তো স্বপ্ন কাজেই ভয়ের কিছু নেই। একটু পরেই জেগে যাব আমি, ভাবল কিম তবে তাড়ার কিছু নেই। তুমি ক্লান্ত। তোমাকে এখনই ঘুম থেকে জাগতে হবে না। তুমি বাথটাবে শুয়ে

আছ। নিরাপদে আছ, ভালো আছ। স্বপ্নটা চলতে থাকুক।

আবার বাথরুমের চারপাশে চোখ বুলাল কিম। রেজরটা খুলে গেল, হুক থেকে নেমে এলো লাফ মেরে। মেঝেতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে বাথটাব লক্ষ করে। কিম টের পেল ওর হাত নড়ে উঠেছে তবে ব্লেডটাকে বাধা দিতে পারছে না। রেজর ব্লেড ওর হাতের কাছে চলে এলো। কেউ ভেতর থেকে নির্দেশ দিল কিমকে– হাত বাড়িয়ে রেজরটা তোলো। কিন্তু মনের একটা অংশ বাধা দিল কিমকে– না, তুলো না। মনের অপর অংশটা ধমক দিল– তোলো বলছি! রেজরের চকচকে হাতলের স্পর্শ পেল কিম। আমি তো শেভ করব না। আমার রেজরের দরকার নেই। অবশ্যই দরকার আছে। কারণ তুমি বগল কামাও। কামাও না? হ্যাঁ, কামাই...তবে এ মুহূর্তে রেজরের দরকার নেই কারণ বিয়ের আগের দিন আমি শেভ করেছি। কিন্তু তবু রেজরের দরকার আছে তোমার। কেন, দেখাচ্ছি।

রেজরটা বুকের ওপর তুলে ধরল কিম। ওটার ধারাল কিম। ওটার ধারাল ফলা সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু বুঝতে পারছি না এটা দিয়ে আমি কী করব। ফিসফিসে কণ্ঠটা এবার জোরালো হয়ে উঠল: ওটা দিয়ে তুমি তোমার কব্জি কেটে ফেলবে, মেয়ে, যেভাবে তোমার মা হাত কেটেছিল, সেভাবে!

আপত্তি জানিয়ে চিৎকার করে উঠল না কিম, স্রেফ শুয়ে থেকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগল। কব্জিতে ব্লেড দিয়ে একটা পোঁচ দিলে বেশ একটু ব্যথা পাবে সে, এর বেশী কিছু নয়। দাঁত তোলার আগে ডাক্তারের ইনজেকশন দেয়ার মতো ব্যথা। চোখ বুজে থাকো। তাহলে আর ব্যথাটা লাগবে না।

শক্ত করে চোখ বুজে থাকল কিম, বাড়িয়ে দিল বাম হাত। ডান হাতে ধরল রেজর। কিন্তু আমি নিজেকে খুন করতে চাই না...চাই কি? চাও কারণ এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এটাই একমাত্র উপায়। অনন্ত যন্ত্রণা সইবার চাইতে মৃত্যু অনেক ভালো।

ব্যথা প্রায় টেরই পেল না কিম তবে বুঝতে পারল ফলাটা মাংসের গভীরে ঢুকে গেছে। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। রক্ত পড়ার শব্দ শুনছে কিম। ওর হাসি পেল। কারণ রক্ত পড়ার শব্দটা মনে হচ্ছে কেউ যেন হিসু করছে।

এবার অপর কব্জি। হাতলটা পিচ্ছিল বলে রেজরটাকে মুঠোয় ধরে রাখা

যাচ্ছে না। হাত ফস্কে ওটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। ধ্যাত! কিম বাম হাতে কিছু ধরে রাখতে পারে না। এ কাজটা সে একেবারেই পারে না। ও ডান হাতে খুরের পোঁচ দিল। পোঁচটা ঠিক জায়গায় পড়েছে কিনা বুঝতে পারল না। তবে কাটা হাতে তাকাতে সাহস পেল না। রক্ত সহ্য হয় না কিমের। আবার ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। কিম এখন বুঝতে পারছে ঠিক জায়গাতেই খুরের পোঁচ বসিয়েছে সে। এখন শুধু শুয়ে থাকো এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করো। আর কিছু করতে হবে না তোমাকে। মৃত্যু কত সহজ। মৃত্যু...মৃত্যু...মৃত্যু...

কিম ভাবছে মরতে কতক্ষণ লাগবে আমার? হয়তো কয়েক মিনিট। কিন্তু কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে। ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে কিমের। কিড়কিড় করছে ওর নগ্ন শরীর, কাঁপছে কিম। বাথটাবের পানি হঠাৎ শীতল হয়ে গেছে, কিমের মন থেকে মৃত্যুর অভিলাষ আকস্মিক উবে গেছে। ও নিজেকে বলল, সর্বনাশ হওয়ার আগে উঠে পড়ো জলদি।

সুখ স্বপ্ন হঠাৎই পরিণত হলো দুঃস্বপ্নে। এই ভয়াবহ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে চাইছে কিম। ও নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। পানিটাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হি হি করে কাঁপছে কিম। গরম পানির কলটা ও খুলে দেবে। পানি একটু গরম হোক তারপর বাথটাব থেকে উঠবে কিম, শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে নেবে গা। ঘুমে ভারী চোখে কুয়াশার মতো লাগল ঘর। কিম বুঝতে পারছে ওকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে নইলে এমন ঘুমের মধ্যে সে তলিয়ে যাবে যে আর কোনোদিন জেগে উঠতে পারবে না। ও হট ওয়াটার ট্যাপটা খুলে দিল এবং...

ওহ্, হলি যেসাস, এটা স্বপ্ন নয়! এ সত্যি? ওর সারা গায়ে রক্ত। ফেনা ভরা পানি ওর গায়ের রক্তে লাল হয়ে আছে!

মুখ হাঁ হয়ে গেল কিমের, বেরিয়ে এলো সুতীব্র আর্তনাদ। গলা ছেড়ে একের পর এক চিৎকার দিয়েই চলল। অন্ধ আতংক নিয়ে বাথটাব থেকে উঠতে গিয়ে পা পিছলে আবার টাবের মধ্যে পড়ে গেল কিম। লাল রক্তের ঢেউ উঠল টাবে, উপচে পড়ল পাশে। সব জায়গায় রক্ত। কিম কব্জির রক্ত মুছে ক্ষতটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। ঘন রক্ত আড়াল করে রেখেছে ক্ষত; একটা তোয়ালে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল ও। লাভ হলো না। রক্ত পড়ছে তো পড়ছেই।

বাথটাব থেকে রক্তমাখা শরীর নিয়ে নেমে এলো কিম, দরজার ছিটকিনি হাতড়াল অন্ধের মতো। দু'হাতে বাথ-টাওয়েল ধরা ওর, ছিটকিনি

খুঁজে পেতে কষ্ট হচ্ছে। তবে পেয়ে গেল, খুলে ফেলল দরজা। করিডরে পা রাখল। হিস্টিরিয়া রোগীর মতো সমানে চিৎকার করেই যাচ্ছে। রক্ত ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ও যে কোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে যাবে। লাল একটা পর্দা দ্রুত ওর দৃষ্টি আড়াল করে দিচ্ছে। ও অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং মারা পড়বে। কেউ ওকে বাঁচাতে পারবে না।

শক্তিশালী একজোড়া হাত ধরল কিমকে; লোকটা যে-ই হোক, তাকে আঁকড়ে থাকল ও, কুয়াশার ভেতর থেকে যেন ভেসে এলো চেনা গলা। এরিক।

'কিম!' এরিক কিমের সারা অঙ্গে পাগলের মতো হাত বুলাচ্ছে। 'ওহ্, মাই ক্রাইস্ট, কী হয়েছে?'

'আ...আ...' কিম এলিয়ে পড়ল এরিকের গায়ে। এরিক ওকে ধরে না থাকলে পড়ে যেত। 'আ...আমার হাত কেটে ফেলেছি!'

'হা ঈশ্বর!' কিমের দুর্বল একটা হাত ধরল এরিক। তোয়ালে দিয়ে মুছে দিল রক্ত। 'রক্ত পড়া বন্ধ করতেই হবে। ক্রাইস্ট, এই ফাকিং হোটেলের লোকজন সব গেল কই? যখন আমার সাহায্যের দরকার...আরি, ব্যাপারটা কী?'

এরিক চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছে কিমের দুধ-সাদা ত্বকের দিকে। 'কিম...কোনো ক্ষতই তো নেই!'

ওর কথা হজম করতে সময় লাগল। কিম লক্ষ করল এরিক ওর অপর কব্জিও পরীক্ষা করছে, লাল তোয়ালে দিয়ে ওর বাকি শরীর মুছে দিচ্ছে। বিস্ময়সূচক ধ্বনি বেরিয়ে আসছে এরিকের মুখ থেকে। কার্পেট ঢাকা মেঝেয় পায়ের শব্দ উঠল, তারপর একটা কণ্ঠ শুনতে পেল কিম। ম্যানেজার সিমন উইভার জিজ্ঞেস করছে, 'কী হয়েছে, মি. আর্মস্ট্রং?' তার কণ্ঠ সম্পূর্ণ আবেগশূন্য উৎকণ্ঠা কিংবা বিস্ময় কিছুই নেই। বাথরুমের তোয়ালে নোংরা যেন এরকম রুটিন অভিযোগ শুনতে এসেছে।

'আমার বউর গা থেকে রক্ত ঝরছে ব্যাপার আর কিছু না,' ঝাঁঝিয়ে উঠল এরিক। কিমের গায়ে লেগে থাকা ঘন লাল তরল পদার্থটা মুছছে এখনও। অবশেষে শিরদাঁড়া টানটান করল এরিক, নোংরা তোয়ালেটা ফেলে দিল মেঝেয়। কিমকে টেনে নিল কাছে যেন ম্যানেজারের লালসা ভরা চাউনি থেকে আড়াল করতে চাইছে বউকে।

'এসব হচ্ছেটা কী, উইভার?' একই সাথে রাগ এবং স্বস্তি প্রকাশ পেল এরিকের কণ্ঠে। জিনিসটা সত্যিকারের রক্ত নয়!

বোঁ বোঁ ঘুরছে কিমের মাথা। এরিকের কথা শুনতে পেয়েছে তবে অর্থ বুঝতে পারেনি। সত্যিকারের...রক্ত...নয়?

'ওহ্, আচ্ছা,' লচসাইড ম্যানেজারকে একটু বিব্রত দেখাল।

'এটা...এটা নিশ্চয় স্পেশাল বাবল বাথ, মি. আর্মস্ট্রং। কেউ ভুলে ওটা বাথরুমে রেখে এসেছে। আমি যদি জানতাম...'

'আমার ধারণা আপনি জানেন অনেক কিছুই কিন্তু বলছেন না,' এরিক ঘুরল ম্যানেজারের দিকে, মুঠো পাকাল, হুংকার ছাড়ল ও, 'এসব ফাজলামির মানে কী?'

'ইয়ে মানে,' জবাব দেয়ার সময় কেঁপে গেল ম্যানেজারের গলা।

'গরমের সময় যেসব ভিজিটর আসেন তারা যখন গোসল করতে যান তখন তাদেরকে চমকে দেয়ার জন্য আমরা ওরকম রক্তস্নানের ব্যবস্থা করি।'

'খুবই বাজে কাজ!'

'তবে বেশিরভাগই ব্যাপারটা পছন্দ করেন, স্যার। ওটা কোনো ক্ষতিকর কিছু নয়...'

'তাই কী?' কিমকে যদি ধরে না রাখত ঠিকই ম্যানেজারের নাক বরাবর বিরাশি সিক্কা বসিয়ে দিত এরিক। 'আমার বউর কী দশা হয়েছে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না? ও ভয়ে চিৎকার করছিল, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল, নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যায় কিনা কে জানে। এটা ওর ক'দিনের জন্য ঘুম হারাম করে দিল জানি না।'

'এখানে তো মানুষ ঘুম হারাম করার জন্যই আসে, স্যার,' আবার নিজের চেহারায় ফিরে গেছে উইভার, আত্মবিশ্বাসী ম্যানেজার। 'তারা ভয় পেতে এখানে আসে। আপনি আসলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না, স্যার। আমাদের ব্রুশিয়ারে পরিষ্কার লেখা আছে এ ক্যাসলের হরর শো দুর্বল চিত্তদের জন্য নয়। আপনি সাধারণভাবে ছুটি কাটাতে চাইলে সাধারণ কোনো হোটেলই আপনাদের জন্য উত্তম।'

'এরকম ফাজলামোর বন্দোবস্ত এখানে আর কত করে রেখেছেন, শুনি?'

'ক্যাসলে ভয় পাবার সমস্ত বন্দোবস্তই আছে, স্যার।'

'ক্যাসল নয়,' হিসিয়ে উঠল এরিক, 'সবকিছুর জন্য দায়ী আপনাদের এই ফাকিং হোটেল আর আপনি নিজে। তবে পুলিশ আমাদেরকে যাওয়ার অনুমতি না দেয়ার আগ পর্যন্ত এখান থেকে যেতেও পারছি না। তবে

আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি– হরর শো'র নামে আবার কোনো চালাকি করে যদি আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেন তো আপনার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেব। বোঝা গেছে?'

'আপনার ইচ্ছে হলে মামলা করতে পারেন, স্যার,' ঠোঁট ওল্টাল ম্যানেজার। 'তবে মনে হয় না কোনো হোটেলের হরর শো প্রদর্শনের অপরাধে আদালতের কিছু বলার থাকছে। আপনাদের কোনো অভিযোগ থাকলে তা লিখে গ্লোব ট্যুরস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিন।

'আমি আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, স্যার।'

হারামী কোথাকার, ম্যানেজারকে মনে মনে একটা গালি দিয়ে কিমকে নিয়ে বেডরুমের উদ্দেশে পা বাড়াল এরিক। নিচে, লাউঞ্জবার থেকে হাসাহাসির শব্দ আসছে। ভৌতিক ভিজিটরদের কেউ হয়তো এসে হাজির হয়েছে। দু'জন অতিথি মারা গেছে আর লচসাইড হরর শো তাদের শীতকালীন প্রদর্শনী মাত্র শুরু করে দিয়েছে।

নয়

রোজ শেলর তার স্বামীর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট। রোজের বাবা-মা, বন্ধুরা সবাই এ বিয়ের অমতে ছিল। কিন্তু রোজ কারও মানা শোনেনি। এখন পস্তাচ্ছে। যে লোককে সে বিয়ে করেছে তার বয়স নয়, সাফল্যটাই প্রাধান্য পেয়েছে রোজের চোখে। আর প্রতিটি নারীই স্বামী হিসেবে সফল একজন নারীকেই পছন্দ করে। তবে এ কথা ঠিক শুরুতে দু'জনের মধ্যে রোমান্স জমে উঠেছিল ভালোই, অন্তত: বারো বছর পর্যন্ত প্রেম ছিল ওদের, ডেভির জন্মের আগে। ডেভির জন্মের পরে আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসতে থাকে রোমান্সের রঙ। সন্তান লালন, রান্না, ঘরকন্না কেড়ে নেয় রোজের বেশিরভাগ সময়। পার্টি এবং হাই লাইফ ক্রমে সরে যেতে থাকে দূরে। যদিও রোজ নিজেকে শোনাত দু'এক বছরের মধ্যে আবার আগের জীবনে ফিরে যাবে সে। কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। কারণ বাঁধা ধরা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে রোজ এবং এ থেকে সে বেরিয়ে আসতেও চায়নি। তার স্বামী ব্রেন্ট একজন ব্যস্ত মানুষ, বেশিরভাগ সময় থাকে বাড়ির বাইরে। ঘরে ফেরে প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে। তখন তার কাজ বসে বসে টিভি দেখা কিংবা চেয়ারে বসে বসে ঘুমানো।

রোজের বয়স বিয়াল্লিশ। তার লম্বা, পিঙ্গল কেশে দু'একটি রুপোলি ছোপ ধরেছে। গাল ঢুকে গেছে ভেতরের দিকে, চেহারায় বয়সের ছাপ স্পষ্ট। তবে সে নিয়মিত ব্যায়াম করে মেদহীন রেখেছে শরীর, এটুকুই তার একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু সে বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিউ ইয়র্কে আপনার বন্ধু না থাকলে শহরটিতে বড্ড একা অনুভব করবেন আপনি। পার্টিতে যেতেও ভালো লাগে না রোজের। ব্রেন্টের বন্ধুরা তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। রোজ শুধু কৃত্রিম হেসে হাত মেলায়। লম্বা, ধূসর চুলের, তিন মিলিয়ন ডলারের মালিক ব্রেন্টের পাশে সবসময়ই দুধের মাছিরা ভনভন করে। স্বামী কী কাজ করে ঠিক জানে না রোজ তবে ব্রেন্টকে দেখেছে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের কাছ থেকে

সে নিজের লভ্যাংশটা তুলে নেয়। ব্রেন্ট তার স্ত্রীর সাথে ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে কথা বলে না এবং রোজের এসব বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই।

নিজের জীবনযাত্রার ধরন নিয়ে রোজের অনুযোগের কোনো অবকাশ নেই। ম্যানহাটানে বিশাল একটি বাড়ি নিয়ে থাকে সে, ডেভির জন্য, ন্যানির ব্যবস্থা আছে, রোজ যখন যে পোশাকটি কিনতে চায় কিংবা গহনা পছন্দ করে, পেয়ে যায় সাথে সাথে। তার সবই আছে, শুধু স্বামী থেকেও যেন নেই। পরকীয়ার চিন্তাও করেছিল রোজ, ভাবনাটা শিহরণ জাগিয়েছিল বুকে, তবে গতানুগতিক এই জীবনযাত্রা থেকে আগে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। তাছাড়া ডেভিকে নিয়েও তার দুশ্চিন্তা কম নয়।

'বাইরে থেকে ডেভিকে দেখলে আর দশটা সাধারণ বারো বছরের ছেলের মতোই মনে হয়। সে টিভিতে ফুটবল খেলা দেখে, বন্ধুদের সাথে পার্কে ফুটবল খেলে, শীতে স্কী করে জমাট বাঁধা হ্রদে, যদিও উইলমার ফ্রয়েড নামের একটি ছেলে লেকে ডুবে মারা যাওয়ার পরে ডেভির ওখানে স্কী করা বন্ধ হয়ে গেছে। ডেভির চুলের রঙ লাল, মুখে প্রচুর ফুটকি, খুব দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটছে ওর, বাপের মতোই লম্বা হবে বোঝা যায়। সে চেহারাটা পেয়েছে মায়ের মতো। এতে বরং খুশিই রোজ তবে ডেভিকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা অন্যখানে। ছেলেটা ধর্ষকামী প্রকৃতির, কুড়ি শতকের জেকিল অ্যান্ড হাইড টাইপের।

একদিন হঠাৎ রোজ ডেভির ঘরে ঢুকে পড়ে ওকে চমকে দেয়। ডেভি মাকে দেখে লাফ দিয়ে ওঠে, এবং বিছানার নিচে কিছু একটা লুকিয়ে ফেলে। জিনিসটা দেখার পরে বমি এসে গিয়েছিল রোজের। মনে পড়লে এখনও গুলিয়ে ওঠে গা। তার ছেলে কাঠের বাক্সে ইঁদুর লুকিয়ে রেখেছিল। ইঁদুর ধরার যন্ত্র দিয়ে সে ইঁদুরটা ধরে ওটার পেছনের পা দুটো কেটে ফেলে। বাক্সের মধ্যে যন্ত্রণায় কিচকিচ করছিল ইঁদুরটা। হাঁটছিল। আর পেছনে রেখে যাচ্ছিল রক্তের দাগ। ডেভি ইঁদুরটার পা কেটেছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে নয়, স্রেফ ধর্ষকামী মনোভাবের কারণে।

সেদিন ছেলের ওপর রাগে ফেটে পড়েছিল রোজ। শরীরে কুলোলে ঠিকই ডেভিকে ধরে মারত। কিন্তু বিশালদেহী ছেলেটার গায়ে হাত

তুলতে সাহস হয়নি। ডেভি লম্বায় প্রায় ওর মতোই হয়ে গেছে। ওই ঘটনার হপ্তাখানেক বাদে দমকল বাহিনীর লোকেরা একটি বেড়াল উদ্ধার করে গাছ থেকে। বেড়ালটার লেজে কেউ ত্যানা পেঁচিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বেড়ালটার সমস্ত শরীর আগুনে ঝলসে যায়। উন্মাদের মতো আশ্রয় খুঁজতে ওটা উঠে যায় গাছে। ভয়ের চোটে আর নামতে চাইছিল না। দমকল কর্মীরা বহু কসরত করে ওটাকে গাছ থেকে নামিয়ে আনে।

বেড়ালটাকে আগুনে ঝলসানোর জন্য ডেভিই যে দায়ী খুব ভালোভাবেই জানত রোজ। যদিও স্পষ্ট কোনো প্রমাণ ছিল না। জন্তু-জানোয়ারের ওপর নির্যাতন করে খুব মজা পেত ডেভি। তবে একটা পর্যায় সে ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। স্কুলে ক্লাস ওয়ানের একটি বাচ্চার ওপর বলপ্রয়োগের অভিযোগ আনা হয় ডেভির বিরুদ্ধে। রোজ তার ছেলেকে সেদিন বলেছিল, 'এসব নিষ্ঠুরতা বন্ধ করো নয়তো একদিন তোমার জায়গা হবে ইলেকট্রিক চেয়ারে।' ডেভি কিছু না বলে স্রেফ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে মা'র দিকে।

ছেলেকে নিয়ে নিজের ভীতির কথা স্বামীকে জানিয়েছে রোজ। ব্রেন্ট শুধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছেন, 'ওর মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি আমার।' কাগজের অর্থনীতির পাতায় ডুবে যেতে যেতে উপসংহার টেনেছেন, 'বড় হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

রোজ একদিন ডেভির ড্রয়ার ঘাঁটতে গিয়ে ময়লা মোজার মধ্যে লুকিয়ে রাখা কিছু কমিক বুক পেল। বইগুলো দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠল ওর। গড, এসব নোংরা জিনিস ডেভি পড়ে। এ তো পুরো পর্ণো। কমিক বইগুলোর ডাস্টবিনে জায়গা হলো।

তারপর একদিন ব্রেন্ট ঘোষণা করলেন তিনি দিন পনেরর জন্য লন্ডন যাচ্ছেন একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে। রোজ এবং ডেভি ইচ্ছে করলে তাঁর সাথে ছুটি কাটাতে পারে। ক'টা দিন স্কুলে না গেলে ডেভির এমন কোনো ক্ষতি হবে না। ব্রেন্ট যখন ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকবেন, রোজ গাড়িভাড়া করে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড ঘুরে আসতে পারে। ছেলেটার শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা হবে। ভালোই লাগবে ওর।

কাজেই অক্টোবরের শেষ হপ্তায়, বর্ষণমুখর একদিনে শেলর পরিবার প্লেন থেকে অবতরণ করল হিথ্রো বিমান বন্দরে এবং ট্যাক্সি নিয়ে চলে

এলো স্যাভয়ে। পরদিন সকালে একটি গাড়ি ভাড়া করে ছেলেকে নিয়ে উত্তর অভিমুখে চলল রোজ। ওরা ঘুরে দেখল স্টার্টফোর্ড এবং ওয়ার উইক, টাম ওয়ার্থ ক্যাসল এবং রাত্রি যাপন করল লেক ডিস্ট্রিক্ট-এ। তবে পরদিন আবার বেরিয়ে পড়ল ঝুপঝুপ বৃষ্টির মধ্যেই।

ওরা এডিনবার্গ গেল, বুধবার সকালে বেরিয়ে পড়ল পার্থ'র উদ্দেশে। কখনও মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে আবার ঝকমকে রোদে ভরে যাচ্ছে প্রকৃতি। পাগলা বাতাস সিয়েরার পতিত জমির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।

'ওই বড় পাহাড়রটা কীসের?' পাহাড় নিয়ে আগ্রহ নেই রোজের। তবে নীরবতা ভালো লাগছিল না ওর। ডেভি মুখে তালা মেরে বসে আছে। দিন দিন ছেলেটা কেমন খিটখিটে এবং অসামাজিক হয়ে উঠছে, কথা প্রায় বলছেই না। যেন এখানে এসেছে স্রেফ বাবা-মা'র চাপে পড়ে।

'আমি জানি না।'

'তাহলে ম্যাপটা একটু খুলে দ্যাখো!'

ম্যাপ খুলল ডেভি। দীর্ঘ সময় নিয়ে ম্যাপে চিহ্নিত জায়গা এবং রাস্তাগুলো দেখছে। ওর স্কুলের রেজাল্ট মোটেই ভালো না। অন্য ছেলেরা এ ম্যাপে এক মিনিট চোখ বুলিয়েই বলতে পারত কোথায় কী আছে। ডেভি পারছে না। অনেক সময় নিচ্ছে।

'বি–না–হি,' উচ্চারণ করতে যেন কষ্ট হলো ওর। তারপর আবার ভাঁজ করল ম্যাপ। 'আমি ওই পাহাড়ে যাব, মা। চুড়োয় উঠব।'

'পাহাড়ে চড়ার সময় নেই,' হাঁটতে ভালো লাগে না রোজের। গাড়ি ভাড়া করতে না পারলে সে রেল কিংবা বাস ব্যবহার করত। আর এগুলোর একটাও না মিললে সে ঘর থেকে বেরুতই না। 'সাঁঝের আগেই পার্থ ফিরতে হবে। এহ্, আবার বৃষ্টি আসছে।'

উইন্ডস্ক্রিনে টাশটাশ করে বড়বড় ফোঁটায় পড়তে লাগল বৃষ্টি। ওয়াইপার চালু করে দিল রোজ। নড়ে উঠল ব্লেড, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বার কয়েক কেঁপে উঠে নিশ্চল হয়ে গেল।

'ধ্যাত্তেরি!' ওয়াইপার আবার চালু করার চেষ্টা করল রোজ। কিন্তু ওগুলো মরা লাশ হয়ে পড়ে থাকল উইন্ডস্ক্রিনের গায়ে। গাড়ির যান্ত্রিক ত্রুটি টের পেয়েই যেন বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃষ্টি। রোজ বৃষ্টির ঘন

পর্দা ভেদ করে কয়েক হাত দূরের জিনিসও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। সে গাড়ির ব্রেক কষল, রাস্তার কিনারে দাঁড় করাল।

'বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত গাড়ি চালানো যাবে না,' বলল রোজ। 'তবে আগে ওয়াইপার জোড়া ঠিক করতে হবে। দেখি, ম্যাপটা দাও তো।'

ম্যাপের ওপর ঝুঁকল রোজ। দেখল ওরা শহর থেকে কমপক্ষে কুড়ি মাইল দূরে রয়েছে। 'মাইলখানেক সামনে একটা গ্রাম আছে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'ওখানে গিয়ে ফোন করব। তারপর যদি কেউ আমাদেরকে পার্থ পৌঁছে দেয়।'

ঝমঝম শব্দে টানা আধঘণ্টা কাঁদল আকাশ। ডেভি সিটে বসে জানালায় মুখ চেপে তাকিয়ে রয়েছে বাইরে। রোজ নিশ্চিত মাঝ রাস্তায় বৃষ্টির কবলে পড়ে যে দুর্ভোগটা ও পোহাচ্ছে, ডেভি উপভোগ করছে ব্যাপারটা। ছেলেটাকে বাড়িতে, ক্রেমারদের কাছে রেখে এলেই ভালো হতো।

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ ওরা গাঁয়ে পৌঁছুল। আশপাশে কোনো ফোন বুথ দেখতে না পেয়ে রোজ ডেভিকে গাড়িতে রেখে রাস্তার পাশে একটি বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। এটি আসলে একটি দোকান কাম রেস্টুরেন্ট।

'আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' পাশের রুম থেকে বেরিয়ে এলো এক মধ্যবয়স্কা মহিলা। তার পরনে ফুলপাতা আঁকা অ্যাপ্রন।

'আমার গাড়িটি নষ্ট হয়ে গেছে,' চেষ্টাকৃত হাসি উপহার দিল রোজ। 'আপনার ফোনটি কি ব্যবহার করতে পারি?'

'আপনি আমেরিকান,' যেন অনুযোগের মতো শোনাল কণ্ঠ। মহিলার ধূর্ত ধূসর চোখ সরু হয়ে এলো।

'জ্বী,' আড়ষ্ট হয়ে গেল রোজ, পরক্ষণে মারমুখি ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, আমি আমেরিকান। তাতে কোনো সমস্যা আছে?'

'না, সমস্যা নেই।'

'আপনার ফোন ব্যবহার করতে পারি কি?'

'অয়ি। আসুন।'

কুড়ি মিনিট পরে গাড়িতে এলো রোজ। একটা গ্যারেজের সাথে কথা বলেছে ও। তাদেরকে বহু কষ্টে রাজি করিয়েছে এখানে আসার জন্য। তারা বলেছে, 'অপেক্ষা করুন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা আসছি।'

পেছনে কপিকল নিয়ে এক তরুণ হাজির হয়ে গেল তার ল্যান্ড রোভারে। ছোকরার সারা মুখে ব্রন। সে রোজদের গাড়িতে দ্রুত চোখ বুলাল, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মাথা নাড়ল। রোজ বুঝতে পারল দুসংবাদ।

'নতুন ওয়াইপার লাগাতে হবে,' অবশেষে বলল ছোকরা।

'তুমি সাথে কোনো ওয়াইপার নিয়ে আসনি?'

'নাহ্। স্টকে নেই। কাল দুপুরের আগে নতুন ওয়াইপার পাব না।'

'তাহলে তো কালকের আগে আমরা পার্থে যেতে পারছি না,' আকাশে তাকাল রোজ। আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি, সেই সাথে বাতাস। বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য থেমে ছিল, আবার নেমেছে জোরে সোরে। 'এতক্ষণ করবটা কী?' ছোকরা কিছুক্ষণ চিন্তা করল। হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ যেন সমাধান পেয়ে গেছে। 'এদিকে একটা হোটেল আছে। ট্যুরিস্ট হোটেল। ফোর স্টার। গাড়িটা এখানেই থাকুক। আমি ফেরার পথে আপনাদেরকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ প্রস্তাবে রাজি হতে হলো রোজকে। দশ মিনিট ল্যান্ড রোভারের ঝাঁকুনি সহ্য করে ওরা পৌঁছে গেল লচসাইড হোটেলে। রিসেপশন ডেস্কে বসা গম্ভীর চেহারার, কালো চুলের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রোজ মনে মনে প্রার্থনা করল ওরা যেন হোটেলে রুম পেয়ে যায়। যে কোনো কারণেই হোক হোটেলে ঘর খালি নেই। রোজ চকচকে ক্রুশিয়ার তুলে পড়তে লাগল। ওর খুব রাগ লাগছে। আড়চোখে তাকাল ডেভির দিকে। সে ফাঁকা চোখে দেয়াল দেখছে। ঈশ্বর জানেন ও কী ভাবছে।

'আপনাদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা অবশ্য করে দেয়া যায়,' মুখ তুলে চাইল মেয়েটি তবে হাসল না।

'ওটা একটা সিঙ্গল রুম। বাচ্চাটার জন্য একটা ক্যাম্পবেড পেতে দেব।'

'এটা...এটা তো কোনো হোটেলই না,' মুখ ঝামটা দিল রোজ।

'জায়গাটার কথা মনে পড়েছে। একটা পত্রিকায় পড়েছিলাম। এটা ড্রাকুলার ক্যাসল জাতীয় কোনো জায়গা।'

'এখানে কোনো ড্রাকুলা নেই, তবে ভয় পাবার অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে,' মৃদু হাসির রেখা ফুটল মেয়েটির ঠোঁটে। 'আপনার বাচ্চাটা পছন্দ করবে।'

‘ও বাচ্চা নয়,’ খেঁকিয়ে উঠল রোজ,’ আর আপনাদের হাবিজাবি জিনিস দেখিয়ে আমি ওর মাথা খারাপ করেও দিতে চাই না।’

‘ঠিক আছে। যেতে ইচ্ছে করলে যাবেন না হলে যাবেন না।’ রিসেপশনিস্ট খাতায় নাম-ধাম লেখা শেষ করে বোর্ড থেকে একটা চাবি খুলে নিল। ‘আপনাদের রুম নম্বর ১৯। সাড়ে আটটা পর্যন্ত ডিনার পরিবেশন করা হয়, নাস্তা পরিবেশনের সময় সকাল সাড়ে আটটা থেকে সাড়ে ন’টা। বেডরুমে গরম এবং ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা আছে। বাথরুম পাবেন করিডরের শেষ মাথায়,’ মুখস্ত করার মতো একঘেয়ে ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেল সে।

‘ধন্যবাদ,’ চাবি নিল রোজ, পা বাড়াল সিঁড়িতে। পেছন ফিরে বলল, ‘চলো, ডেভি। ডিনারের জন্য তৈরি হবে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব আমরা নইলে ভোরে উঠতে পারব না।’

‘ভোরে ওঠার দরকারও নেই,’ ইচ্ছে করে মায়ের পেছনে ধীরে ধীরে হাঁটছে ডেভি। ‘মেকানিক তো বললই দুপুরের আগে সে ওয়াইপার পাবে না। কাজেই বেলা একটার আগে সে এখানে আসছেও না। এমনও হতে পারে সে আমাদের কথা ভুলেই গেল।’

‘সাড়ে বারোটার মধ্যে সে না এলে আমি ফোন করব,’ বলল রোজ। ডেভি কিছু করতে চাইলে সে হাজারটা ছুতো দেখাবেই।

‘আমরা ক্যাসলটা একবার দেখব না?’

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোজ, ১৯ নম্বর রুমের দরজার তালায় চাবি ঢোকাল। ‘না, দেখব না, ডেভি। আমরা ক্যাসলের ধারে কাছেও যাচ্ছি না। এমনকি এখানে যদি এক সপ্তাহও থাকতে হয় তবু না।’

‘কেন, মা?’

‘কারণ ক্যাসল দেখা তোমার উচিত হবে না।’

ডেভি কিছু বলল না। তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাসাদে যাবে।

ডাইনিংরুমে অনেক লোক। ওয়েট্রেস মাত্র দু’জন। দুই তরুণী। তারা গদাইলস্করী ভঙ্গিতে হাঁটা-চলা করছে। নিমতিতা মুখ। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও হোটেল বোর্ডারদেরকে খাবার পরিবেশনের দায়িত্বটা পালন করছে। মেনু কিংবা খাবারের মান কোনোটাই আকর্ষণ করতে পারল না রোজকে। এ জায়গার সব কিছুর মধ্যে কেমন কৃত্রিম একটা ভাব বিরাজ করছে। অবশ্য

মাত্র একটা রাতের ব্যাপার তো। ওটা দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কফিটাই যা হোক একটু ভালো লাগল রোজের। খাওয়া শেষ হলে সে ডেভিকে বেডরুমে পাঠিয়ে দেবে। বার-এ বসে একটু স্কচ পান করবে রোজ।

'মা?' টেবিলের ওপর ঝুঁকল ডেভি।

'ফিসফিস করতে হবে না, ডেভি,' তার ছেলের ফিসফিসানি স্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেয়েও জোরালো শোনায়। সে এমনভাবে হিসহিস করতে থাকে যে আশপাশের মানুষজন কৌতূহল নিয়ে ফিরে তাকায়।

'মা,' ফিসফিস করেই বলল ডেভি। 'তুমি কি জান এখানে এই সপ্তাহের মধ্যে দু'জন মানুষ খুন হয়েছে?'

শক্ত হয়ে গেল রোজ। ছেলেটা আবার উল্টোপাল্টা কল্পনার ফানুস ওড়াতে শুরু করেছে। অসম্ভব ব্যাপার।'

'কিন্তু ওরা সত্যি খুন হয়েছে, মা। এক মহিলা এবং এক বুড়ো। পাতাল ঘরে ঘটেছে ঘটনা। তারা মারা যাওয়ার পরে ইঁদুরে তাদের শরীর খেয়ে ফেলেছে!' ডেভির ম্লান নীল চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'এবং তারপর...'

'ডেভি, ফালতু বাত ছাড়ো। কফি খেয়ে...'

'ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি। আজ সকালে পুলিশ এসেছিল।'

'তুমি এত কথা জানলে কী করে?' নিশ্চয় কমিক বই পড়ে, ভাবল রোজ।

'ওরা এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছিল,' ডেভিড ওদের পেছনের টেবিলে আঙুল দিয়ে দেখাল। ওখানে দাড়িঅলা এক যুবক এবং সুন্দরী একটি মেয়ে বসে আছে।

'শ্‌শ্‌শ। অন্যদের কথায় কান পাততে নেই। তোমার বাবা শুনলে খুবই রাগ করবেন।'

'আমি সত্যি কথাই বলছি। একটা ভয়ংকর কুকুর মহিলার ওপর হামলাও করেছিল।'

'এখন ঘুমাতে যাও,' হুকুম করল রোজ। 'সোজা বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়বে। আমি বার থেকে একটা ড্রিংক শেষ করেই আসছি। এসে যেন না দেখি জেগে আছ।'

'ঠিক আছে, মা। তুমি এসে দেখবে আমি ঘুমাচ্ছি।'

ডেভি এক চুমুকে বাকি কফিটুকু শেষ করে টেবিল ছাড়ল।

ছেলেকে বাধ্যগত ছাত্রের মতো দরজায় পা বাড়াতে দেখে অবাকই হলো রোজ। ডেভিকে ঘুম পাড়ানো এক মহা ঝামেলা। সে কিছুতেই বিছানায় যেতে চায় না। অবশ্য ছেলেটার মতিগতি বোঝা দায়। কেউ জানে না কখন সে কীরকম রিয়্যাক্ট করবে। ব্যাপারটা উদ্বেগজনক। তবে এখন ওকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই। হোটেলে বসে নিশ্চয় কোনো বদমাইশী করবে না।

টেবিল ছাড়ল রোজ, পা বাড়াল লাউঞ্জ বার-এ। ওর তাড়া নেই। ডেভি ওপরে গেছে। ক্লান্ত শরীর। ঘুমিয়ে পড়বে শীঘ্রি। কাজেই রোজ ইচ্ছে করলে অনেকক্ষণ এখানে সময় কাটাতে পারে। ডেভি সাথে আছে বলে ছুটিতে এসেও নিজের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগ খুব কমই পেয়েছে রোজ। আজ যখন সুযোগটা এসেছে, সদ্ব্যবহারে দোষ কী?

দশ

ডাইনিংরুমের দরজা থেকে বেরিয়ে এলো ডেভি শেলর, মুখে শয়তানি হাসি। উত্তেজনায় বেড়ে গেছে হার্টবিট, হলরুমে দাঁড়িয়ে আছে ও। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এরকম একটা সুযোগ এসেছে ওর জীবনে।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা মুখ গুঁজে আছে পেপার ব্যাকে।

ডেভি ভাবল ওটা কোনো হরর উপন্যাস নাকি নোংরা বই, ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়। চারপাশে চোখ বুলাল ডেভি, তীর চিহ্নিত একটি সাইন বোর্ড চোখে পড়ল—এই দিকে প্রাসাদ।

দুটো দরজা পার হতে হলো ডেভিকে। চলে এলো উঠোনে। এখানে আরও দুটি সাইনপোস্ট ইংগিত করছে ক্যাসল বাম দিকে, পাতাল ঘর ডানে। কোন দিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না ডেভি। শেষে পকেট থেকে দশ পয়সার একটা কয়েন বের করল। হেড মানে ক্যাসল, টেইল পড়লে পাতালঘর।

হেড। পাথুরে সিঁড়ি ধরে হনহন করে এগোল ডেভি। ওটা চলে গেছে প্রাসাদের এক তলায়। তবে প্রথম দর্শনে হতাশ হতে হলো ডেভিকে। অট্টালিকাটিতে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। ওটা এখন একটা খোলায় পরিণত হয়েছে। মাথার ওপর তারা ভরা রাত, শা শা করে উড়ে বেড়াচ্ছে মেঘ। ডেভির সামনে, প্রথম লেভেলে ব্যালকনি ধরনের একটা জিনিস, অনেকটা ক্যাটওয়াক টাইপের, দেয়ালে একটু পরপর বিরতি দিয়ে ইলেকট্রিক ওয়াল-ল্যাম্প জ্বলছে। অন্ধকার দূর করতে পেরেছে সামান্যই, বরং রহস্যময় ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

হঠাৎ মুখে কীসের যেন বাড়ি লাগল, ডানা মেলে পতপত করে উড়ে আঁধারে মিলিয়ে গেল ওটা। প্রায় চিৎকার দিয়ে উঠেছিল ডেভি। অনুমান করল ওটা বাদুড়, কৃত্রিম। গাল ঘষল ডেভি—খামচি লেগেছে নখরের। ওকে মুহূর্তের জন্য ভয় পাইয়ে দিয়েছিল বাদুড়টা। সামনে পা বাড়াতে মুখে জড়িয়ে পড়ল মাকড়সার জাল। হাত দিয়ে জাল সরাল ডেভি। হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল শরীর। এগুলো কৃত্রিম জিনিস নয়, সত্যিকারের মাকড়সার জাল।

টর্চটা সাথে নিয়ে আসেনি বলে আফসোস হলো ডেভির। তাহলে টর্চ জ্বেলে দেখতে পারত মাকড়সাটা কোথায় আছে। এত বড় জাল যে তৈরি করতে পারে সে আকারে প্রকাণ্ড না হয়েই যায় না। মাকড়সাটাকে ধরতে পারলে বেশ হতো। হোটেলে নিয়ে গিয়ে মা'র বিছানায় ছেড়ে দিত ডেভি। মা কোনো পোকামাকড় সহ্য করতে পারে না। কীট-পতঙ্গের ব্যাপারে তার দারুণ ফোবিয়া আছে। বিছানায় মাকড়সা দেখলে মা নির্ঘাত ফিট হয়ে যেত।

মা কখনোই ওকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। সবসময় ভয়ে থাকে ডেভি না জানি কী করে বসে। মা ডেভির কাছে যন্ত্রণা বিশেষ। এদিক থেকে বাবা আবার ভালো। বাবা যখন কাজে ব্যস্ত, কারও দিকে খেয়াল থাকে না। কে কী করছে খবরও রাখে না। অবশ্য বাবা বেশিরভাগ সময় ব্যস্তই থাকে। মা যদি কোনোভাবে টের পেয়ে যায় তার ছেলে না ঘুমিয়ে নকল প্রাসাদ দেখতে বেরিয়েছে, চেঁচিয়ে মাথায় তুলবে হোটেল। অবশ্য মা জানবেই না ডেভি এখানে এসেছে। মা যখন মদ পান করতে বসে, বার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওখান থেকে ওঠেই না। মা মাতাল হয়ে ঢুকবে ঘরে, হয়তো লক্ষ্যই করবে না তার ছেলে বিছানায় আছে কী নেই। অবশ্য মাকে ফাঁকি দিতে বিছানায় কয়েকটা বালিশ সাজিয়ে রেখে আসতে পারলে বুদ্ধিমানের কাজ হতো। তবে মা'র উঁকি দিয়ে দেখার সম্ভাবনাও কম। অবশ্য মা বিছানায় আসার আগেই হোটেল রুমে ফিরে যাবে ডেভি।

ডেভি ছায়াঘেরা এলাকা পার হবার সময় সামনে বাড়িয়ে রাখল হাত। বাদুড় কিংবা মাকড়সার জালের ফাঁদে আর আটকা পড়ছে না সে।

ওয়াকওয়ে বা রাস্তাটা হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে মোড় নিয়েছে প্রাসাদ অভিমুখে। প্রাচীন সামনে হয়তো এদিকে একটা ফ্লোর ছিল, সেখানে ছিল অসংখ্য ঘর। এদিকটা হয়তোবা পয়সার অভাবেই মেরামত করা হয়নি। এরা ভিজিটরদের কাছ থেকে টিকেটের গলা কাটা দাম আদায় করে অথচ বিনিময়ে দর্শক তেমন কিছুই পায় না।

কিনারে একটা ঘর দেখতে পেল ডেভি। একটা খিলান দেখা যাচ্ছে, তারপর ঘরটা। খিলানের পেছনে টিমটিম করে জ্বলছে বাতি। প্রবেশ মুখে পেতলের একটি ফলক। তাকে বড় বড় অক্ষরে লেখা– EXECUTION CHAMBER। ডেভির পেছনটা শিরশির করে উঠল। ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলছে ও। এখানে মজার কিছু জিনিস হয়তো দেখা যাবে...

মৃদু একটি শব্দ হলো কোথাও। চমকে উঠল ডেভি। কেউ পা টেনে টেনে হাঁটছে। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল ডেভি।

বোকার মতো কোরো না, নিজেকে চোখ রাঙাল ও। এখানে তুমি একা নও, হোটেলে লোকের সংখ্যা কম নয়। তাদের কেউ আসতে পারে। লোকটা যেই হোক, আসছে এদিকেই।

ভাঙাচোরা প্রবেশ পথে ফুটে উঠল একটা কাঠামো। তবে এ যে হোটেলের কেউ নয় তা দিব্যি দিয়ে বলতে পারে ডেভি। একটা লোক, উচ্চতায় ছয় ফুটের ওপরে, পরনে মিশকালো টাইটফিটিং পোশাক, তার চেহারার নিচের অর্ধেকটা অংশ কেবল দেখা যাচ্ছে, ওপরের অংশটা কিছু একটা দিয়ে আড়াল করা। ডেভি উঁকি দিল।

অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার পরে ডেভি বুঝতে পারল লোকটার গায়ে কালো একটা আলখেল্লা, মুখের ওপরের অংশটা মুখোশে ঢাকা, দস্যুদের মতো।

'শুভ সন্ধ্যা,' কণ্ঠটি নরম, মার্জিত এবং অশুভ।

'ওহ্...হাই,' প্রত্যুত্তর দিল ডেভি, ভাবছে দৌড় দেবে কিনা। আরে না, ও দৌড়াবে কেন? এখানকার সবকিছুই তো কৃত্রিম ভয়ের, আর এসব দেখার জন্যই তো ও এসেছে, তাই না? যেমন ওই বাদুড়টা। তবে মাকড়সার জালটা কৃত্রিম ছিল না...

'এটা এক্সিকিউশন চেম্বার,' কথা বলার সময় মুখের নিচের অংশ কুঁচকে গেল। ডেভির মনে হলো হাসল লোকটা। এ লোক বোধহয় অভিনেতা। 'তুমি এ জায়গাটা ঘুরে দেখতে এসেছ?'

'ওহ্...হ্যাঁ।' ঢোক গিলল ডেভি। ভুতুড়ে জায়গাটার ভেতরে যাওয়ার তেমন কোনো ইচ্ছে নেই ওর। তবে নিজেকে বোঝাল, গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। ইতস্তত করছে ডেভি। কৌতূহলের সাথে ভয়ের লড়াই চলছে। ফাঁসি বা গলা কেটে হত্যা দৃশ্যের প্রতি তার আগ্রহ বরাবরই রয়েছে। এখন তো অপরাধীদের মেরে ফেলা হয় ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে কিংবা ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে। মধ্য যুগে অনেক কষ্ট দিয়ে মানুষ মারা হতো। ইংল্যান্ডে দস্যুদের গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করা হতো। তারা রশি বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে থাকত, কাক এসে ঠুকরে খেয়ে ফেলত চোখ...ভাবনাটা রোমাঞ্চিত করে তুলল ডেভিকে। ওই ঘরে যা-ই থাকুক না কেন, মজার কিছু হবে নিশ্চয়।

'তাহলে এসো,' এক কদম পিছাল লোকটা, ডেভিডে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল। 'এসো, নিজের চোখে সব দ্যাখো, খোকা।'

দোরগোড়ায় পা রাখল ডেভি, তাকাচ্ছে চারপাশে। ঘরটা ছোট, তিন বর্গগজের বেশি হবে না চওড়ায়।

মাথার ওপর ঝুলতে থাকা একটা বাতির আলো পাথরের কর্কশ দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে। মেঝের মাঝখানটা ফুঁড়ে বেরিয়েছে ক্রসপিসসহ একটি পেঁচানো বীম। ওতে শনের তৈরি একটি রশি ঝুলছে, বাতাসে ডানে বামে দুলছে মৃদু। এ যেন পুরানো ছবির ফাঁসির মঞ্চ। তবে ফাঁসির দড়ি নেই, শুধু একটা রশি। বীমের নিচে একটা ট্রেপেডোর দেখতে পেল ডেভি।

'এই একই ফাঁসি কাঠ ব্যবহার করতো বিনাহির ভূস্বামী,' দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

'কীসের ভূস্বামী?' জিজ্ঞেস করল ডেভি। এ লোককে জল্লাদের মতোই লাগছে দেখতে। মুখোশের আড়ালে জ্বলজ্বল করছে দুই চোখ, ভয়ংকর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডেভির দিকে।

'লেয়ার্ডের ভূস্বামী!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল সে। রাগে জ্বলছে চোখ। 'তুমি যার প্রাসাদে দাঁড়িয়ে আছ তারই নাম জান না, খোকা?'

'ইতিহাস নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই,' ডেভি উদ্ধত করে তুলতে চাইল সুর যদিও ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনাল কণ্ঠ। ট্যুরিস্টদের সাথে এভাবে বেয়াদবের মতো কথা বলে, এ লোকটা কে? বাবা থাকলে ঠিক উচিত জবাব দিয়ে দিত। কিন্তু বাবা এখানে নেই, কয়েকশো মাইল দূরে লন্ডনে আছে, আর মা বার-এ মদ্যপানে ব্যস্ত। এখানে, জল্লাদের সাথে ডেভি একা!

'এ প্রাসাদের মালিক ভূস্বামী। তিনি শুধু প্রাসাদ নন, গত তিন শতক ধরে আশপাশের সমস্ত এলাকারও মালিক।' যেন গাইড বই থেকে পড়ে শোনাচ্ছে লোকটা।

'তাহলে তো উনি অনেক আগেই মারা গেছেন।'

'বোকার মতো কথা বোলো না গর্দভ ছোকরা!' গর্জে উঠল মুখোশধারী, মুঠো পাকিয়েছে। 'উনি মরে গিয়েও বেঁচে আছেন, এখনও এ এলাকা শাসন করছেন। যদিও কিছু জবরদখলকারী তার রাজ্য দখল করে রেখেছে।'

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ডেভি। এ ধরনের লোকের কথা সে কমিকসে পড়েছে, টিভিতে দেখেছে। এরা জিন্দালাশ! শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল জল স্রোত নামল ডেভির। তবে এ লোককে বুঝতে দেয়া যাবে না যে সে ভয় পেয়েছে।

ডেভি নিতম্বে হাত রেখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। 'আচ্ছা, বুঝলাম

আপনার ভূস্বামী এখনও বেঁচে আছে। তাতে কী?'

'এটা তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জায়গা। যারা তাঁর সাথে বেঈমানি করেছে, তাঁকে মানতে চায়নি, তাদেরকে সোজা এখানে ধরে আনা হয়েছে এবং...'

'কিন্তু রশিতে তো ফাঁস লাগানোও নেই,' ঠোঁটে চেষ্টাকৃত হাসি ফোটাল ডেভি। 'ওটা বানরের লাঠিতে বাঁধা রশির মতো দুলছে...'

'ফাঁস তৈরি করা খুবই সহজ,' লোকটার বিশালদেহী হলেও তার মুভমেন্ট অত্যন্ত দ্রুত, মাত্র দুই কদম ফেলে বিদ্যুৎ গতিতে সে ফাঁসি কাঠের সামনে হাজির হয়ে গেল, লম্বা আঙুলে ধরল রশি। 'দ্যাখো, খোকা, কীভাবে ফাঁসির রজ্জু বানাতে হয় দেখাচ্ছি তোমাকে।'

ডেভি খোলা দরজার দিকে তাকাল। ঝেড়ে দৌড় দেবে কিনা ভাবছে। তবে মাত্র দুই সেকেন্ড দ্বিধায় ভুগল সে। দৌড় দেয়ার কী আছে? এ সব তো আসলে ট্যুরিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খেলা। সে খেলা না দেখে কোথাও যাচ্ছে না। 'আচ্ছা, দেখান।'

দ্রুত নড়ছে জল্লাদের হাত, এতই দ্রুত ডেভির অনভিত চোখ হাত জোড়া অনুসরণ করতে পারছে না। হাতের মালিক যেন সাপুড়ে, আট ফুট লম্বা একটা সাপকে আঙুল দিয়ে কুণ্ডুলি পাকাচ্ছে, ফাঁস তৈরি করছে, গিঁট দিচ্ছে। চমৎকার একটি ফাঁস তৈরি হয়ে গেল।

'বাহ্, দারুণ বানিয়েছেন তো, মিস্টার।'

'আমি এ কাজ বহুবার করেছি।'

'তবে ফাঁসিতে নিশ্চয় কাউকে ঝোলাননি?'

মুখোশের পেছনে চোখ জোড়া জ্বলে উঠল একবার।

'কতজনকে যে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি নিজেরই মনে নেই। যারা ভূস্বামীর হরিণ চুরি করেছে সেই সব মেষপালককে সবচেয়ে বেশি ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি। যে সব কৃষক ভূস্বামীর সাথে বেঈমানি করেছে তারাও আমার কবল থেকে নিস্তার পায়নি।'

'এসব গল্প বাচ্চাদের শোনান গে,' হাসল ডেভি। তবে হাসিটা নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত কিচকিচে শোনাল।

'চুপ!' হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল প্রকাণ্ড শরীরটা। ভাঁটার মতো জ্বলছে চোখ। 'আমার সাথে ফাজলামো করবে না!' যেমন আকস্মিক জ্বলে উঠেছিল রাগে, পরক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে গেল সে। মৃদু গলায় হাসল। 'তুমি আসলে আমার কথা বুঝতে পারনি। যাকগে বাদ দাও। তোমার মতো বাচ্চাকে এসব বলতেই বা গেলাম কেন!'

'আপনি সারাদিন কী করেন, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে ট্যুরিস্টদেরকে

ফাঁসির গল্প শোনান?' ডেভিড তাল মিলিয়ে হাসল। 'এখানে তো কৃত্রিম জিনিসের অভাব নেই। একটা ডামি থাকলে ওটা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দর্শকদের দেখাতে পারতেন।'

'অনেককেই ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি আমি,' লোকটার কণ্ঠ নরম হলেও আগের মতোই জ্বলছে চোখ। 'আজ রাতেও একজনকে ঝোলানো হবে।'

'বাহ্, চমৎকার। কখন দেখতে পাব?'

'একটু পরেই,' বলল জল্লাদ। 'এসো, এখানটাতে দাঁড়াও। কীভাবে ফাঁসি দেয়া হয় তা দেখাচ্ছি তোমাকে। ভয় নেই। তুমি শুধু এখানে এসে দাঁড়াও। এমন ভান করবে যেন তোমার ফাঁসি হচ্ছে।'

একটু ইতস্তত: করল ডেভি। অভয় দিল নিজেকে–ভয় কী? সবই তো খেলা। কদম বাড়ল। পায়ের নিচে স্পর্শ পেল কাঠের বোর্ডের। ওর শরীরের ওজনে ক্যাচ কোচ শব্দে মৃদু আপত্তি জানাল প্যানেল। হঠাৎ মুখের ভেতরটা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেল ডেভির।

ডেভির পেছনে এসে দাঁড়াল জল্লাদ। 'বিনাহি'র ভূস্বামীর প্রাসাদে অনুপ্রবেশের দায়ে তোমাকে অভিযুক্ত করা হলো।'

'স্রেফ অনুপ্রবেশের দায়েও উনি ফাঁসি দিতেন?'

'প্রায়ই। ধরে নাও তুমি ফিরে গেছ সেই পুরানো দিনগুলোতে। তোমাকে দরবার থেকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, জল্লাদ। হয়তো ভূস্বামী নিজেও এখানে উপস্থিত আছেন...কিংবা তিনি নিজেই জল্লাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন!'

ঢোক গিলল ডেভি। কিছু একটা স্পর্শ করল ওর ঘাড়। বরফের মতো ঠাণ্ডা আঙুল, শীতল ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ল গায়ে। 'অ্যাই!'

'নড়াচড়া কোরো না তাহলে গলায় আটকে যাবে ফাঁস। অনুভব করার চেষ্টা কর যাদেরকে ফাঁসি দেয়া হতো তাদের কেমন লাগত। তুমি তো ওই অনুভূতি জানার জন্যই এখানে এসেছ।'

আতংকে জমে গেল ডেভি শেলর। জানে এখন ও আর পালাতে পারবে না। যখন সুযোগ ছিল ওই সময় পালিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। তবে এ তো খেলা মাত্র। ভয়ংকর খেলা। সে ভয়ের স্বাদ পেতে ক্যাসলে ঢুকেছে এবং ভয় কী জিনিস তা টের পাচ্ছে। ভয়ের স্বাদ নেয়ার সাধ আমার জন্মের মতো মিটে গেছে, মনে মনে বলল ডেভি, আমি এখন আমার মা'র কাছে ফিরে যেতে চাই।

'ভূস্বামী তার ভিক্টিমদের কখনও হাত বাঁধতেন না, মুখে মুখোশও পরাতেন না,' ডেভির পেছনে নিচু গলায় হিসহিস করে চলেছে কণ্ঠটি।

'কারণ তিনি শিকারের চেহারায় ফুটে থাকা মৃত্যু যন্ত্রণার ছাপ দেখতে খুব পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন দেখতেন কীভাবে ছটফট করছে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটা। এভাবে তিনি শাস্তি দিতেন। আর যেহেতু তিনি এখনও বেঁচে আছেন কাজেই সে পদ্ধতির পরিবর্তন করার দরকারটা কী?'

কিছু একটা গলিয়ে দেয়া হলো ডেভির মাথায়, কাঁধের ওপর এসে স্থির হলো ওটা। ফাঁসটা শক্ত করে এঁটে বসল গলায়, ডেভির কণ্ঠে জমাট বাঁধা চিৎকারটাকে বেরুতে দিল না। শক্ত রশি ওর ঘাড়ের মাংসে চেপে বসছে। ডেভির চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, যে কোনো মুহূর্তে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। না, পড়ে গেলেই ফাঁস আটকে মারা পড়ব আমি। খাড়া হয়ে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল ডেভি। ঘরটি হঠাৎ ভীষণ অন্ধকার হয়ে গেছে। দরজাও দেখতে পাচ্ছে না ডেভি। নিজেকে বোঝাতে চাইল এটা আসলে একটা খেলা। এ লোকটা একটা জোকার ছাড়া কিছু নয়।

'মৃত্যুর আদেশ হয়েছে এবং আদেশ পালিত হবে,' ডেভি দেখল জল্লাদ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা একটা লিভারের দিকে হাত বাড়াল সে। লিভারটা আগে চোখে পড়েনি ডেভির।

ভীষণ শীত করছে ডেভির। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। কথা বলতে চাইছে কিন্তু মুখ ফুটে রা বেরুচ্ছে না।

প্লিজ, আমাকে আমার মা'র কাছে যেতে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কাউকে তোমার কথা বলব না। যদি না ছাড়ো আমার বাবা তোমাকে পুলিশে দেবে।

আতংকের ঢেউ নিয়ে অনুভব করল ডেভি সে কতটা অসহায়। নীরব হুমকি নীরবই থাকল।

'মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমাকে ঝুলিয়ে রাখা হবে!

ডেভির মুখোমুখি হলো জল্লাদ। তার তীক্ষ্ণ চোখ খেলা করছে না। কখনও করেওনি। ডেভির সমস্ত শরীর অসাড়। একটা আঙুলও নড়াতে পারছে না। জল্লাদের চোখে তীব্র ঘৃণা।

'হয়তো ভূস্বামী স্বয়ং এখানে উপস্থিত... ডেভির মস্তিষ্কে শব্দগুলো বাড়ি খাচ্ছে এখনও। ফিসফিসে গলার একটা হুমকি কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ওর মগজ।

হঠাৎ ডেভির পায়ের নিচ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কাঠের ফ্লোর, অতল একটা গর্তে ঝুলে পড়ল ও যেখানে নিঃসীম আঁধার আর গাছ পচা বিকট গন্ধ ছাড়া কিছু নেই।

এগারো

তিন নম্বর স্কচ শেষ করল রোজ শেলর। পাশের টুলে বসা লোকটার সাহচর্য উপভোগ করছে সে। লোকটা আহামরি সুদর্শন নয় তবে চেহারায় নিষ্ঠুর একটা ভাব তার সেক্স অ্যাপিল বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখে মনে হয় বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো অভিযানপ্রিয় মানুষ। রোজের চেয়ে বয়সে দু'এক বছর ছোটই হবে। তবে এ লোকের মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা ব্রেন্টের মাঝে অনুপস্থিত।

লোকটা আবছা গলায় জানিয়েছে সে একজন কোম্পানি রিপ্রেজেনটেটিভ। তার মানে সেলসম্যান। অবশ্য এ লোক যে পেশার সাথেই জড়িত থাকুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না রোজের। লোকটা বেশ দামী একটি সুট পরেছে, একের পর এক ড্রিংক কিনে দিচ্ছে রোজকে। মজার মজার গল্প বলতেও জুড়ি নেই মানুষটার। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে রোজের। লোকটা ডিভোর্সি নাকি সিঙ্গল মনে করতে পারছে না ও। তবে তাতে কী আসে যায়? লোকটা মিথ্যা কথাও বলতে পারে। তাতেও কিছু ক্ষতি নেই।

লোকটা রোজকে চার নম্বর হুইস্কি কিনে দিল এবং আরেকটা জোক শোনাল। আবার হাসির ঝর্ণাধারা ছোটাল রোজ। হাসতে হাসতে লোকটা রোজের উরুতে চাপড় কষাল এবং হাতটা সরাল না। রোজ বুঝতে পারছে লোকটা তাকে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইছে এবং এতে ওর কোনো আপত্তি নেই। বহুদিন রমণ সুখ থেকে বঞ্চিত রোজ।

রোজ বার থেকে উঠল লোকটার কাঁধে ভর করে, না হলে ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যেত। লোকটা রোজের কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল। মানুষজনের কথার তোড়ে ভালোভাবে শুনতে পেল না ও। তবে মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বলল রোজ। ও বুঝতে পারছে লোকটা ওকে কী প্রস্তাব দিয়েছে এবং অনুমানে যদি ভুল হয় তাহলে ধরে নিতে হবে সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করেছে সে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো রোজ লোকটার কাঁধে ভর করে। ১৯

নাম্বার রুমের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক ঝলক তাকাল ওদিকে। ডেভি ঘুমাচ্ছে কিনা একবার উঁকি মেরে দেখা দরকার ছিল, ভাবল রোজ। নাহ্, মনে হয় এখনও জেগে আছে ওর ছেলে। তাহলে পুরো ব্যাপারটা গুবলেট করে দেবে সে। কিন্তু যদি রাতে ঘুম থেকে জেগে ডেভি দেখে মা পাশে নেই তখন কী হবে? অবশ্য ও নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। মাকে বিছানায় না দেখলেও উদ্বেগ বোধ করবে না ডেভি। দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওরা। নিচের কোলাহল ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো কানে।

লোকটা রোজের নিতম্বে চাপ দিল। খিলখিল হেসে উঠল রোজ। লোকটার গায়ে প্রায় ঝুলে আছে ও। লোকটা ৩৬ নাম্বার রুমের দরজার তালা খুলল।

'কে জানত তোমার মতো সুন্দরী নারীকে একাকী পাব এ হোটেলে?' দরজা বন্ধ করে ফিসফিস করল লোকটা। রোজকে বসিয়ে দিল বিছানায়। চুমু খেতে শুরু করল। তারপর অভ্যস্ত হাতে খুলতে লাগল রোজের পোশাক। অনবরত কথা বলেই চলেছে সে।

রোজ এখন নগ্ন। দুই পা দু'দিকে মেলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়। কোটিপতির স্ত্রী নিজের শরীর ভোগ করার সুযোগ দিচ্ছে এক সেলসম্যানকে। রোজ উত্তেজিত এবং মাতাল। আজ রাতটা উন্মাদনায় কাটবে ওর। তারপর কাল সব ভুলে যাবে। লোকটার নাম পর্যন্ত জানে না রোজ, নিচতলায় বসে নামটা বোধহয় বলেছিল সে, তবে মনে পড়ছে না ওর। তাতে কিস্যু আসে যায় না।

লোকটা তুখোড় খেলোয়াড়, মনে মনে স্বীকার করল রোজ। জানে নারী অঙ্গের কোথায় স্পর্শ করলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে মেয়েরা, সুখানুভূতি নিয়ে জাগ্রত হয়। ব্রেন্ট রোজকে কোনোদিন এত সুখ দিতে পারেনি।

অবশেষে শেষ হলো খেলা; লোকটা চাদরটা টেনে নিল নিজেদের গায়ে, একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তলিয়ে গেল ঘুমের রাজ্যে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পরে রোজের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল বুঝে উঠতে সে কোথায় আছে। মাথাটা দপদপ করছে। ও কোথায় আছে মনে পড়ে গেল। একটা অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলো রোজ। উঠে বসল বিছানায়। তাকাল ঘরের চারপাশে। পর্দা ফেলা জানালা দিয়ে ঢুকছে ধূসর আলো। বাইরে বইছে ঝড়ো হাওয়া, মুষলধারে চলছে বর্ষণ। জানালার কাচে মাথা কুটছে বৃষ্টির ফোঁটা। এক রাতের প্রেমিককে দেখা যাচ্ছে না ঘরে। তার সুটকেস নেই, ওয়াড্রোবে জামাকাপড়ও অদৃশ্য। লোকটার যা

দরকার ছিল, পেয়ে গেছে। তারপর চলে গেছে অন্য শহরে, অন্য কোনো নারীর কাছে।

কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল রোজের। সংবরণ করল নিজেকে। তুমি নিশ্চয় অন্য কিছু আশা করনি, রোজ শেলর, করেছ কি? লোকটার যা দরকার ছিল আদায় করে নিয়েছে, তুমিও তাই। বিছানা থেকে নামল রোজ। পোশাক পরছে। মনে পড়ল ডেভির কথা। বিশ্বাসযোগ্য কোনো গল্প বলতে হবে ছেলেটাকে কারণ ডেভির মাথা খুব সাফ। ঘুমাতে না আসার ব্যাখ্যা কী দেবে রোজ? হয় সে তার বাবাকে বলে দেবে নয়তো রোজকে ব্ল্যাকমেইলের চেষ্টা করবে। ডেভি অসম্ভব স্বার্থপর একটা ছেলে। নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝে না। এবং স্বার্থ আদায়ের জন্য যে কোনোরকম নোংরামি করতেও তার বাধে না। রোজ ঠিক করল ডেভিকে বলবে সে পার্টিতে গিয়েছিল। সারা রাতের পার্টি চলছিল হোটেলে। ওখানে এক রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। রোজ ভেবেছে রাষ্ট্রদূতের সাথে খাতির জমালে তার বাবার ব্যবসায়িক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই সে পার্টিতে যোগ দেয়। যুক্তিটা দুর্বল তবে এ মুহূর্তে এ ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না রোজের।

দ্রুত পোশাক পরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল রোজ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচের তলায়। ১৯ নাম্বার রুমের সামনে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখল। সাড়ে আটটা বাজে। ডেভি হয়তো এখনও ঘুমাচ্ছে। ডেভিকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করতে সকালে ঘুম থেকে তুলতে বেশ বেগ পেতে হয় রোজকে। ডেভি ঘুমিয়ে থাকলে ভালোই হবে। রোজ বলবে সে গভীর রাতে ঘরে ফিরেছে এবং কিছুক্ষণ আগে ঘুম ভেঙেছে। এখন উঠে পড়ো, ডেভি, নাস্তা খাবে চলো। ঈশ্বর, ওর মাথাটা এমন ব্যথা করছে!

দরজা খুলল রোজ। চোখ বুলাল ঘরে। বিস্ময় এবং অবিশ্বাস নিয়ে আবিষ্কার করল তার আশংকাই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ডেভি নেই ঘরে!

ডেভি নিশ্চয় খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে এবং ওই ভয়ংকর প্রাসাদ ঘুরে দেখতে গেছে, ভাবল রোজ। এখন নতুন একটা গল্প বানাতে হবে...ওহ্, গড, ও তো কাল রাতে বিছানাতেই যায়নি! একটি কপাটে হেলান দিল রোজ, শকটা শারীরিক আঘাতের মতো লেগেছে। হয়তো ডেভি সকালে উঠেছে, বিছানা ঝেড়ে টেরে বেরিয়েছে। না, তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ডেভি কখনোই বিছানা ঝাড় পোঁছ করে না। তার পাজামা সবসময় পড়ে থাকে মেঝের ওপর।

শরীর কাঁপছে রোজের, মাথায় কিছু খেলছে না। ডেভিকে খোঁজ করতে

হবে। ঘুরল রোজ, ছুটল সিঁড়ি লক্ষ করে। ডাইনিংরুমে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে; কয়েকজন অতিথি ভোরে উঠেছে, এখনই বসে গেছে নাস্তা খেতে।

'আমার ছেলেটাকে দেখেছেন কেউ?' ছুটে গিয়ে কথাটা বলার আকুতি বহু কষ্টে সংবরণ করল রোজ। ওরা রোজকে পাত্তাই দেবে না। হোটেলে যারা আসে তারা শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। স্বার্থপর হারামজাদার দল!

রিসেপশন ডেস্কে বসে আছে কালো চুলের মেয়েটি। বই পড়ায় মগ্ন। হয়তো সারা রাত মেয়েটা এখানে ডিউটি দিয়েছে। রোজ ডেস্কের কোণা খামচে ধরল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ডেভিকে দেখেছেন?'

বইয়ের লাইনটা শেষ করল মেয়েটা তারপর চাইল মুখ তুলে, গোমড়া মুখে বিরক্তি। 'ডেভি কে?'

'আমার ছেলে। মাথায় লাল চুল, মুখে মেচেতার দাগ। বয়স বারো। কাল রাত সাড়ে ন'টার দিকে ওকে আমি ঘরে পাঠিয়ে দিই ঘুমানোর জন্য।'

'ও বোধহয় এখনও ঘুমাচ্ছে,' আবার বইয়ের পাতায় ফিরে গেল রিসেপশনিস্টের চোখ।

'না ঘুমাচ্ছে না। ওকে খুঁজে পাচ্ছি না আমি। আপনি তো কাল সন্ধ্যায় এখানেই ছিলেন। ওকে কি দেখেছেন?'

'না, দেখিনি?'

কাঁপছে রোজ। দেখবে কী করে কারণ তুমি তো কাজ বাদ দিয়ে বই পড়ছিলে। 'ও হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে। ও প্রাসাদে গেছে।'

'বেশীরভাগ বাচ্চাই প্রাসাদ ঘুরতে পছন্দ করে। আপনি ওখানে গিয়ে ওর খোঁজ করছেন না কেন?'

রোজের খুব রাগ লাগল। রাগের গলা টিপে বলল, 'ওকে খুঁজতে কারও সাহায্য দরকার আমার।'

'সাহায্য করার মতো কেউ নেই,' বইয়ের ওপর চোখ রেখে বলল রিসেপশনিস্ট।

'তাহলে ম্যানেজারকে খবর দিন!'

মেয়েটা বইয়ের একটা পৃষ্ঠা ওল্টাল। 'ম্যানেজার ব্যস্ত। অ্যালেক্সের সাথে দেখা করুন।'

'আপনি অ্যালেক্সকে খবর দিন।'

চেহারায় প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ফোন তুলল রিসেপশনিস্ট, একটা বোতাম টিপল। দু'বার। তারপর রেখে দিল ফোন।

'অ্যালেক্স নেই। আজ ওর অফ ডিউটি। ও আমাদের বারম্যান। তবে মাঝেমধ্যে ওকে দিয়ে আমরা অন্য কাজও করাই।'

'তাহলে অন্য কাউকে বলুন!' বিস্ফারিত হলো রোজ।

'মি. উইভারের অফিসে ফোন করে দেখছি কী করা যায়।' আবার ফোন করল রিসেপশনিস্ট, ভেসে এলো পুরুষ কণ্ঠ। রিসেপশনিস্ট তার সাথে দ্রুত কী যেন বলল বুঝতে পারল না রোজ। ফোন রেখে মেয়েটা তাকাল রোজের দিকে। 'ম্যানেজার আসছেন। আপনি ওই চেয়ারটিতে বসুন।'

বসল না রোজ। অস্থির চিত্তে পায়চারি করতে লাগল। জলদি আসুন, আমি জানি ডেভির কিছু একটা হয়েছে।

অনেকক্ষণ পরে দেখা মিলল সিমন উইভারের। ঢেঙা শরীরে ডিনার সুট একদমই মানায়নি। তার চেহারা বরাবরের মতো ভাবলেশশূন্য। 'আপনার জন্য কী করতে পারি, ম্যাডাম?'

'আমার ছেলে,' বানের তোড়ের মতো কথাগুলো বেরিয়ে এলো রোজের মুখ থেকে। 'ওর কোনো খোঁজ পাচ্ছি না। কাল রাতে ও ঘরে যায়নি।'

'আপনারা তো ১৯ নাম্বার রুমের বোর্ডার, তাই না? আপনি ঘুম থেকে উঠে ওকে বিছানায় দেখতে পাননি?'

'না। সারা রাত ও ঘরে ছিল না।'

'তাহলে নিশ্চয় প্রাসাদ দেখতে গেছে। আগে ওখানে খোঁজ নিয়ে দেখুন। হয় সে পাতাল ঘরে আছে নয়তো ওপরতলার ঘরে।'

'আমার সাথে কাউকে দিন।'

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে ম্যানেজার বলল, 'অ্যালেক্সকে পাওয়া যায় কিনা দেখছি, ম্যাডাম। বুঝতেই পারছেন অফ সিজনে হঠাৎ করে গেস্টদের আগমনে কর্মচারী সংকটে পড়ে গেছি। একটু অপেক্ষা করুন, প্লিজ।'

দশ মিনিট পরে হাজির হলো অ্যালেক্স। মাথা ভর্তি কালো চুলে চিরুনি পড়েনি, ঠোঁটের ওপর মস্ত গোঁফ। হোটেলের অন্যান্য কর্মচারীর মতো এও রামগড়ুরের ছানার মতো গোমড়া করে রেখেছে মুখ। 'আমার সাথে আসুন,' সংক্ষেপে বলেই গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরল সে, পা বাড়াল সাইনবোর্ডে তীর চিহ্ন নির্দেশিত দিকে।

আধঘণ্টা আতংক ঘিরে থাকল রোজ শেলরকে। গাইডের প্রায় গা ঘেঁষে রইল সে। শক্তিশালী টর্চের আলোয় অন্ধকার কেটে ভুতুড়ে জায়গাটা দিয়ে হাঁটছে অ্যালেক্স। বিকট চেহারার ডামিগুলো কেউ হিস হিস করে উঠল, কেউবা গর্জন ছাড়ল, কেউ গোপন আস্তানা থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এলো, আবার কেউ ঢুকে পড়ল ভেতরে। অ্যালেক্স প্রতিটি অন্ধকার কোণে টর্চের আলো ফেলছে। ওদিকে না তাকানোর চেষ্টা করল রোজ।

আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলো রোজ। এখানেও হরর

শো'র অভাব নেই। মুড ভালো থাকলে এগুলো দেখলে হাসি পেত রোজের। কিন্তু এখন হাসি পাচ্ছে না। আরেকটা ঘর দেখা বাকি। তবে ওই ঘরে ঢুকল না রোজ। কাউকে জবাই বা ফাঁসিতে ঝুলতে দেখতে চায় না ও। হোক না ওটা ডামি।

মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরটি থেকে বেরিয়ে এলো অ্যালেক্স। বিড়বিড় করল, 'টপ ফ্লোরটা দেখা দরকার।'

ওপরের ফ্লোর নিচেরটার রেপ্লিকা মাত্র। শুধু দানবগুলো ভিন্ন চেহারার, একটা জোম্বি রোজকে দেখে গর্জন ছাড়ল, হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল। আরেকটি ঘরের সাইন বোর্ডে লেখা 'DEVIL WORSHIP'। ওখানে ঢুকল না রোজ। অ্যালেক্স ঢুকল। বেরিয়ে এসে চলল নিচতলায়। বলল, 'ও ক্যাসলে নেই, ম্যাডাম।'

'তাহলে কোথায় থাকতে পারে?'

জবাব মিলল না, শুধু কাঁধ ঝাঁকাল অ্যালেক্স।

'পুলিশে খবর দিন।'

'আগে ম্যানেজারের সাথে কথা বলি। আপনি রিসেপশনে গিয়ে বসুন।'

রিসেপশনের লাল কার্পেটে আবার পায়চারি করতে লাগল রোজ, তাকাল না বই-পোকা রিসেপশনিস্টের দিকে। অবশেষে ফিরল উইভার। তার ভোঁতা মুখে এবার উৎকণ্ঠার ক্ষীণ ছাপ। 'শুনলাম আপনার ছেলেটিকে ক্যাসলে খুঁজে পাওয়া যায়নি, ম্যাডাম। হয়তো বাইরে গেছে সে। পাহাড়ে কিংবা হ্রদের ধারে।' এবং ডুবে মরেছে...

রোজের মুখ মরা মানুষের মতো সাদা। 'ওর জন্য সার্চ পার্টির ব্যবস্থা করুন। পুলিশে খবর দিন।'

'পুলিশে খবর দেয়ার দরকার নেই,' জবাবটা যেন রেডিই ছিল উইভারের, গলায় জরুরী আবেদন ফুটিয়ে তুলল সে। 'আমি এখুনি সার্চপার্টির ব্যবস্থা করছি, ম্যাডাম। কয়েকজন শ্রমিককে ফোন করব। ওরা গ্রামে থাকে। ওরা আপনার ছেলের খোঁজ করতে পারবে।'

রোজ ধপ করে বসে পড়ল একটি চেয়ারে। প্লিজ গড, ডেভির যেন কিছু না হয়।

বাইরে পাগলা হাওয়ার দাপাদাপি। ফুঁসে উঠেছে হ্রদ, উন্মত্ত ঝড়ো বাতাস হোটেলের সামনের অংশটা যেন উড়িয়ে নিতে চাইছে। ডাস্টবিনের ঢাকনিটা বাতাসের ধাক্কায় আবার আলগা হয়ে পড়ে গেছে মাটিতে, ঝনঝন ঠনঠন শব্দ তুলে গড়াচ্ছে। ওটার শব্দে থেকে থেকে চমকে উঠল নিখোঁজ সন্তানের শোকে কাতর একজন মা।

প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আবর্জনা সংগ্রহকারী লরি হাজির হয়ে যায় লচসাইড হোটেলে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারটায়। মাঝে মধ্যে দু-এক মিনিট এদিক-ওদিক হয়ে যায় বটে। লরিতে থাকে তিনজন ক্রু। তারা সকাল ন'টায় কিলোচিতে নাস্তা সারে, দুপুরের আগে বিরতি নেয় বিনাহি গাঁয়ে তারপর চলে আসে লচসাইডে।

আজ এগারটা পঁয়ত্রিশে টকটকে হলুদ রঙের দানব লরি এসে হাজির হলো লচসাইড হোটেলে। প্রবল বাতাসের কারণে ক্রুরা টেইল বোর্ডে দাঁড়িয়ে নেই কেউ। সবাই লরির ভেতরে। লরিটার চেহারা কুৎসিত। ওটার একমাত্র খাদ্য আবর্জনা।

ড্রাইভার মস্ত ইউ-টার্ন নিয়ে হোটেল বার পার্কে দাঁড় করাল লরি। ঠিক সামনে আবর্জনার স্তূপ। আবর্জনা থেকে গজখানেক দূরে রইল টেইলবোর্ড।

দুই ক্রু লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল মাথার ক্যাপ। ওরা হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখল ক্যাপ। এক ঝলক তাকাল প্যাশিওর দিকে। ওখানে একটা ডাস্টবিন আছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। ডাস্টবিনের ঢাকনি নিখোঁজ। আবর্জনা পড়ে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তবে ওই ডাস্টবিন পরিষ্কার করা ওদের কাজ নয়। ওদের কাজ আট ফুট বাই আট ফুট অ্যালুমিনিয়াম বাঙ্কারের আবর্জনা পরিষ্কার করা। প্রাচীন প্রাসাদ থেকে চওড়া, ঢালু একটা পথ নেমে এসেছে। তবে রাস্তাটা দর্শকদের নজরের বাইরেই থাকে। প্রতিদিন সকালে হোটেলের কর্মচারীরা প্রাসাদের পেছনের আবর্জনা সংগ্রহ করে তা ওই ঢালু পথটাতে খালি করে। আবর্জনা ঢালু পথ বেয়ে নেমে জমা হয় নিচের অ্যালুমিনিয়াম বাংকারে। লরির মেশিন সমস্ত আবর্জনা গিলে খায়। শুনতে সহজ শোনালেও কাজটা অত সহজ নয়। বিশেষ করে দমকা বাতাসে যখন জমে থাকা আবর্জনার পাহাড় সরাতে হয় তখন ঘাম ছুটে যায় ক্রুদের। আজ সেরকম কঠিন একটি দিন।

ড্রাইভার চালু করে দিল মেশিন। এক ক্রু অ্যালুমিনিয়ামের বাংকারের মাথায় উঠে একটা লিভার টেনে দিন গায়ের জোরে। আবর্জনার হিমবাহ গড়িয়ে পড়তে লাগল নিচে। পচা খাবার, ভাংগা কাচ, কাগজ, পলিথিন, প্লাস্টিকের ব্যাগ ইত্যাদি উড়ে বেড়াতে লাগল বাতাসে।

মেশিন ক্ষুধার্তের মতো গিলছে আবর্জনা, কড়মড় শব্দে চিবাচ্ছে, গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, গিলছে। বিকট গন্ধে পেট ঠেলে বমি আসতে চাইছে কিন্তু লরির ক্রুরা জায়গা ছেড়ে নড়ল না। মাঝে মাঝে বেলচা দিয়ে আবর্জনা ঠেলে দিল মেশিনের মুখে।

'ক্রাইস্ট!'

বাতাস গিলে ফেলল ক্রুর ভয়ার্ত চিৎকার। বুড়ো ড্রাইভার দুই হাত জড়ো করে সিগারেট ধরানোর চেষ্টা করছিল, শুনতে পেল তার তরুণ সহকর্মীর কণ্ঠ। মুখ তুলে চাইল সে।

'কী হলো, টমি?'

'তাকান, ওহ মাই ক্রাইস্ট, স্রেফ তাকান!'

বুড়ো আবর্জনার স্তূপে তাকাল এবং যা দেখল, শিঁটিয়ে গেল সে। একটা হাত, আবর্জনা ভেদ করে উঁচিয়ে আছে রক্তাক্ত একটা হাত, যেন নাড়ানোর চেষ্টা করছে, তারপর আবার একটা হাত, যেন নাড়ানোর চেষ্টা করছে, তারপর আবার নেতিয়ে পড়ল। আবর্জনার আরেকটা প্রবাহ ওটাকে কবর দিল, তারপর উঁচু হলো; এবার ভেসে উঠল একটা মুখ।

ওয়ার্কম্যান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, হাঁ হয়ে গেল মুখ, চিৎকার দিল। কিন্তু ঝড়ো বাতাস তার চিৎকার গিলে ফেলল। সে লরির গায়ে ঘুসি মারল।

'মোটর বন্ধ করো, জ্যাক!'

ক্ষুধার্ত মুখটার গতি মন্থর হয়ে এলো। তবে আবর্জনার স্তূপ ভেদ করে শরীরটা এখনও উঠে আসছে যেন নতুন খোঁড়া কবর থেকে স্লো মোশনে বেরিয়ে আসছে জিন্দালাশ। একটি ছেলে, মেয়েও হতে পারে–মুখটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চল হাত-খানা, সাহায্য চাইছিল যে হাতটি ব্যাকুল হয়ে, ভেঙে বেঁকে চুরে গেছে। বেরিয়ে পড়েছে মাংস, রক্তাক্ত। মুখে মেচেতার দাগ বোঝা যাচ্ছে। মরা চোখে ফুটে রয়েছে নির্জনা আতংক। ঠোঁট জোড়া বেঁকে গেছে পেছন দিকে, অধৈর্য কাটা জিভ বেরিয়ে পড়েছে। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ। ঘাড়ে মাংসের বালাই নেই, হাত দেখা যাচ্ছে শুধু। সমস্ত সাহায্যের বাইরে চলে গেছে ছেলেটা তবু দেখে মনে হচ্ছে যেন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে।

থেমে যাচ্ছে মেশিন, বন্ধ ইঞ্জিন। তবে কাঁপছে এখনও থরথর করে, ছেলেটির লাশ তুলে আনছে, ধাতব ক্রাশারে চলে যাচ্ছে শরীর।

শেষবারের মতো যেন নড়ে উঠল হাতটি, তারপর শরীরটি অদৃশ্য হয়ে গেল পচা আবর্জনার স্তূপে, গুঁড়িয়ে গেল, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ওটার ওপর আছড়ে পড়ল আরও আবর্জনা। ওকে কবর দিয়ে দিল।

বারো

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাচিনের মেজাজ খিঁচড়ে আছে। লচসাইড হোটেলে বারবার যেতে যেতে ক্লান্ত সে। সে মাঝেমাঝে কাকতালীয় ঘটনায় বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে, কিন্তু অলক্ষুণে কোনো ঘটনায় তার বিশ্বাস নেই। মহিলা সিঁড়ি বাইতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরে গেল, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হলো বৃদ্ধের আর এখন এই নির্বোধ ইয়াংকী ছোঁড়াটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল আবর্জনার স্তূপে। এসব ঘটনার একটির সাথে আরেকটির কোনো সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করে না মাচিন।

দুই চোরা শিকারী কার্লাইল এবং টাচার্ডের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সাথে তাদের ভ্যান এবং কুকুরটাও অদৃশ্য। প্রাসাদের ঘটনার সাথে নিশ্চয় এর কোনো সম্পর্ক নেই। এরকম ঘটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক যে ওরা অন্য কোনো এলাকায় চলে গেছে যাতে পুলিশে ধরতে না পারে।

ছেলেটার মা রোজ শেলরকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে হাসপাতালে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। তার স্বামী লন্ডন থেকে রওনা হয়েছেন। তাঁর ধারণা তাঁর ছেলেকে কোনো মর্ষকামী শিশু হত্যাকারী হত্যা করেছে। এরকম ধারণা হওয়ার কারণ স্যাডিস্ট এক খুনী বর্তমানে জেল পলাতক! মাচিন বুঝতে পারছে তার জীবন থেকে শান্তি অন্তর্হিত।

প্রাসাদে ঢুঁ মেরে এসেছে মাচিন। কাল সে আর্মস্ট্রং দম্পতিকে চলে যেতে বলবে। এদের খামোকা আটকে রেখে লাভ কী? হোটেল এবং প্রাসাদ বন্ধ করে দেয়া যায়। কিন্তু কীসের যুক্তিতে? হরর শোতে কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি ইন্সপেক্টরের। মানুষ সিঁড়িতে কিংবা ছাদের ওপর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে ঘাড় ভাঙতেই পারে এবং ব্রিটেনের পঁচানব্বই শতাংশ ক্যাসলে এরকম ঘটনা ঘটছে।

এগুলো কতগুলো দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। সে প্রার্থনা করতে পারে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে। মনে মনে বলল আলেক মাচিন। রাস্তায় একটা গাছ পড়ে আছে। ঘুর পথ ধরতে হলো ওকে। কাল থেকে

তিনদিনের ছুটি নিয়েছে সে। আবার কোনো গর্দভ লচসাইড হোটেলে গিয়ে মারা না পড়লেই হলো। তাহলে ওর ছুটিটা মাঠে মারা যাবে।

রেডিওতে ঘোষক বারবার ঝড়ের সংকেত দিচ্ছে। বলছে হারিকেন অ্যাঞ্জেলা দ্রুত গতিতে স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল অভিমুখে ধেয়ে আসছে। সকালের আগেই অভ্যন্তরভাগে আঘাত হানবে ঝড়। ঝড়ে হারামজাদা প্রাসাদ এবং হোটেলটা ধ্বংস হয়ে গেলে মন্দ হতো না, মনে মনে বলল মাচিন। সন্দেহ নেই আজ রাতটা খুব খারাপ যাবে।

এ যেন আগের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। কিম আর্মস্ট্রং বার্কাডি এবং কোকের গ্লাসে চুমুক দিল, বার-এ এরিকের পাশে বসা মহিলার দিকে তাকাতে ভয় লাগছে। মহিলার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, শরীরটা অবশ্য সুগঠিত, শেটল্যান্ড রোল-নেক সোয়েটারের ওপর ঢিলে কার্ডিগান চাপিয়েছে, পায়ে মোটা মোজা এবং ফ্ল্যাট শু। এ মহিলার মুখে হাসি তবে কেউ এর সাথে লাগতে আসলে এ যে তরবারির মতো ঝলসে উঠবে তা চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

'কাগজে খবরটা পড়ার পরই আমি এখানে ছুটে আসি,' বলছিল উরসুলা ইলিংশওয়ার্থ। 'ভ্যালান্সকে চিনতাম আমি। সে অবশ্য এমন আহামরি কোনো কাজ করে যায়নি তবে কোথায় রহস্যের সন্ধান মিলবে তা সে জানত। অবশ্য এখানে যা ঘটছে তা সামাল দেয়ার ক্ষমতা ভ্যালান্সের ছিল না।'

কিমের শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। 'পুলিশ বলছে এগুলো কাকতালীয় দুর্ঘটনা।'

'ওরা তো তা বলবেই!' রাগ ঝিলিক দিল উরসুলার চোখে।

'ওদের তো কিছু না কিছু বলতেই হবে কারণ বলতে তো আর পারে না যে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ওদেরকে লড়াই করতে হবে।'

'অশুভ শক্তি!' অবাক হলো এরিক।

'মহা শক্তিশালী এক শয়তান, এমন ভয়ংকর যা কল্পনারও বাইরে।' মহিলার কণ্ঠ ফিসফিসে এবং কর্কশ শোনাল। 'তোমরা এটা টের পাচ্ছ না, অনুভব করতে পারছ না!'

'এ জায়গাটায় আসা অবধি আমি আতংকের মধ্যে আছি,' বলল কিম।

'তা তো থাকবেই। কারণ প্রাসাদের অন্ধকার শক্তির প্রতি তুমি সংবেদনশীল। মাই গড, যে সব বোকা শয়তানের নিজের আস্তানায় বসে

শয়তানকে নিয়ে হাসিতামাশা করে তারা জানে না তাদের কপালে কী আছে।'

অস্বস্তি লাগছে এরিকের। প্রাসাদে যে সব ঘটছে তার ব্যাখ্যা পাওয়া মুশকিলই বটে। তবে ব্যাপারটা গড়িয়েছে অনেকদূর। কিমের মনে ভয় ঢুকে গেছে– এ জন্য ভ্যালান্স অনেকাংশে দায়ী। তবে এখানে যা ঘটছে, তিনটে মৃত্যু এবং হারিকেন ঝড়ের আগমন, এতে সবচেয়ে বাস্তববাদী মানুষটিরও আদি ভৌতিক ব্যাপারগুলোতে বিশ্বাস জন্মাতে বাধ্য। 'আমার মনে হয় আমরা বিষয়টি নিয়ে বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি করছি। সমস্যাটা ওখানেই।' হাসার চেষ্টা করল এরিক।

'এখানে শয়তান আছে, আছে বহুদিন ধরে। তোমরা ক্যাসলের ইতিহাস জান না?'

'না, জানি না,' বলল এরিক। এই মহিলা বকবকানি বন্ধ করলেই বাঁচে। চায় না এর কথা শুনে কিম আরও ভীত হয়ে উঠুক।

'হোটেল ব্রুশিয়ারে ক্যাসলের ইতিহাস লেখা নেই, শুধু মানুষকে ভয় দেখানোর কী কী জিনিস আছে তার বর্ণনা রয়েছে।

গলা নামাল উরসুলা। 'হোটেল কর্তৃপক্ষও বোধ হয় এ প্রাসাদের ইতিহাস জানে না। এ অঞ্চলের যে মালিক, সেই ভূস্বামী মারা যায় অষ্টাদশ শতকে। আসলে 'মারা যায়' বলাটা ভুল হলো। সে এখনও বেঁচে আছে। সে এবং তার শিষ্যরা একরাতে লুসিফারকে ডেকে আনে। ফলশ্রুতিতে কোভেনের অনেকেই মারা যায়, বাকিরা যায় পাগল হয়ে। ভূস্বামী ওই রাত থেকে শয়তানের শিষ্যে পরিণত হয়। শয়তান তাকে যে আদেশ করে তা তাকে পালন করতে হয়। এখানকার ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলো হয়ে ওঠে টর্চার চেম্বার। সেখানে নিরপরাধ পুরুষ, নারী এবং শিশুদের এনে নির্যাতন করে মেরে ফেলতে থাকে ভূস্বামী। শ্রুতি আছে, ঝড়ের রাতে পাতালঘর থেকে নাকি ভেসে আসে তাদের মরণ আর্তনাদ।'

কিমের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এরিক ওকে একহাতে জড়িয়ে ধরল। ইচ্ছে করল বলে ওরা এখন ঘুমাতে যাবে। কিন্তু মুখে রা ফুটল না। মহিলা যেন ওকে সম্মোহিত করে রেখেছে। পুরো গল্পটা না শুনে উঠতে পারবে না। মনকে বোঝাতে চাইল মহিলা যা বলছে সব তার কল্পনাপ্রসূত কিন্তু মনের ভেতর কে যেন বলে উঠল এ বানোয়াট কোনো ঘটনা নয়, সব সত্যি।

‘একবার বিনাহি গাঁয়ের একটি চাষী পরিবারের সবাইকে হত্যা করল ভূস্বামী,’ বলে চলল উরসুলা। তার তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ পালাক্রমে ঘুরছে কিম এবং এরিকের ওপর। ‘সে বাবা মা’র সামনে সন্তানদের জবাই করে। শোনা যায়, এই প্রাসাদের মালিক এবং তার অনুচররা নাকি বাচ্চাদের মাংস রান্না করেও খেয়েছে!’

গলায় হাত দিল কিম! পেট গোলাচ্ছে। ‘এ তো অবিশ্বাস্য!’

‘এ বিশ্বাস হয় না!’

‘কিন্তু তুমি বিশ্বাস করেছ যদিও ভান করছ করনি,’ আবছা হাসি উরসুলার ঠোঁটে। ‘এসব কথা বলার কারণ তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়া যে কীসের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করছ। হ্যাঁ, সে বাচ্চাদের মাংস খেত এবং এসব কথা ডায়েরিতেও লিখে রেখেছিল। তিনটে চামড়া বাঁধানো খাতায় লেখা ছিল সে সব বর্ণনা। ওগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় তার...বর্ণনার খাতিরে বলছি তার ‘মৃত্যু’র পরে।’

‘সে মারা গেল কীভাবে?’ প্রশ্নটি করতে চায়নি এরিক, মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

‘স্বৈরাচার বেশিদিন শাসন করতে পারে না, সে শয়তানের শিষ্য হলেও।’ একটি সিগারেট ধরাল উরসুলা, জোরে টান দিয়ে বুকের মধ্যে পুরল ধোঁয়া তারপর ধীরে ধীরে বের করে দিল নাক দিয়ে। ‘বিনাহি গাঁয়ের প্রতিটি মানুষের ভূস্বামীর ভয়ে ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানত না কখন কার ওপর নেমে আসবে অত্যাচারের খড়্গ। অক্টোবরের এক রাতে সবাই মিলে হামলা চালাল প্রাসাদে। তারা ভূস্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করল। তারপর ভয়ে পালিয়ে গেল পাহাড়ে। তবে আতংকের সমাপ্তি ওখানে ঘটেনি বরং বলা উচিত শুরু হয়েছিল মাত্র। চাষারা যদি জানত কীভাবে শয়তানকে চিরতরে ধ্বংস করা যায় তাহলে হয়তো তা-ই করত। কিন্তু অশিক্ষিত মানুষগুলো শয়তানকে ধ্বংসের উপায় জানত না। ভূস্বামীর ভৃত্যরা প্রভুকে তার প্রাসাদের পাতালঘরে কবর দিয়ে পালিয়ে গেল। শিষ্যের মৃত্যুতে ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হলো শয়তান। সে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি নামিয়ে আনল প্রকৃতির কোলে, বইতে লাগল প্রবল ঝড়ো হাওয়া এবং শুরু হলো মুষলধারে বর্ষণ। ঝড়-বৃষ্টির তোড় সইতে পারল না ভূস্বামীর প্রাসাদ, ধসে পড়ল। ধ্বংসপ্রাপ্ত ওই প্রাসাদের ধারে কাছেও বহুদিন কেউ ঘেঁষেনি, কিন্তু কয়েকটা নির্বোধ মানুষ এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল শয়তানের। সে আবার জেগে উঠেছে, এখন

প্রতিহিংসার নেশায় উন্মত্ত। সে ইতিমধ্যে তিনজনকে মেরে ফেলেছে। আরও হত্যা করবে। তাকে না থামানো পর্যন্ত এ হত্যাযজ্ঞ চলতেই থাকবে।'

শক্ত হয়ে গেছে এরিকের শরীর। বাইরে শোঁ শোঁ শব্দে বইছে বাতাস, জানালায় আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি। নরক থেকে আরেকটা ঝড় নেমে আসছে দুশো বছর আগের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য। 'কিন্তু এর মধ্যে আমাদের ভূমিকা কী?'

'তোমাদের সাহায্য দরকার আমার,' জোরে সিগারেটে টান দিল উরসুলা। 'এরিক, তুমি এই শয়তানের কিছু কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করেছ। আমি আমার গল্প বললাম। এখন তোমাদেরটা শোনাও।'

লচসাইড হোটেলে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল এরিক। মাঝে মাঝেই সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল উরসুলা, কখনও বা ঠোঁট কামড়াল। প্রথম সিগারেটের গোড়ার আগুন দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। সাদা মুখ নিয়ে বসে থাকল কিম। ওর মন বলছে কালও ওদের এ হোটেল ত্যাগ করা হবে না। ঘটনা ঘটবে সেই স্বপ্নের মতো আপনি একটা জায়গায় যেতে চাইছেন কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে পৌঁছুতে পারছেন না।

'তোমার গল্প খাপে খাপ মিলে যায়,' চিন্তিত গলা উরসুলার। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল সে, যেন নিঃশেষ হওয়া মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে নিল। 'ভ্যালান্সও বুঝতে পারেনি এই শয়তান এতটা ক্ষমতাধর। যাক, আমি এসেছি পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে।'

'আপনি কি ভূতের ওঝা?' জিজ্ঞেস করল এরিক।

হাসল উরসুলা। 'হ্যাঁ। আমি বহু ভূত তাড়িয়েছি।'

'কিন্তু আমরা আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?' জানতে চাইল এরিক।

'তোমাদের মরাল সাপোর্ট সবার আগে আমার দরকার।' আবার হাসল উরসুলা। 'তোমরা নিশ্চয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'করি। তবে চার্চে বেশি যাওয়া হয় না।' অপরাধী গলায় জবাব দিল এরিক।

'ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটাই আসল। আমি ইচ্ছে করলে এ হোটেলের অন্যান্যদেরকেও বলতে পারতাম। সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠত, আমার

দিকে বাড়িয়ে দিত সাহায্যের হাত। কিন্তু ওরা বিষয়টি বিশ্বাস করার ভান করত কেবল কারণ এরা এখানে এসেছে হরর শো দেখে ভয় পেতে। এদের দিয়ে কাজ হতো না আমার। মানুষ চিনতে ভুল হয় না আমার। তোমাদেরকে চিনতেও ভুল করিনি।'

'আমি জানি না আপনি কী ভাবছেন,' এরিক বারম্যান অ্যালেক্সকে আরেক রাউন্ড ড্রিংক দেয়ার ইংগিত করল।

'তবে আমার স্ত্রীকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না।'

'তোমার উদ্বেগের কারণ আমি বুঝতে পারছি,' উরসুলা কিমের হাতে হাত রাখল। 'তবে তোমার স্ত্রীকে এ থেকে বাইরে রাখা যাবে না। তাতে আমাদের সবারই বিপদ হবে। শত্রু আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন এবং হামলা করার জন্য প্রস্তুতও। আমি জানি তোমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছ। কিন্তু আমার জন্য দুর্ভাগ্য নাকি সৌভাগ্য জানি না, তোমাদের পক্ষে এ মুহূর্তে চলে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই সবচেয়ে ভালো হয় তোমরা যদি আমার সাথে যোগ দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি কর। প্রবাদ আছে আত্মরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হামলা করা। তোমাদের ওপর ইতিমধ্যে শারীরিক হামলা এসেছে ভ্যাম্পায়ার, নরখাদক, এগুলো সবই শয়তানী শক্তির প্রতীক। আর ওই অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা নিসন্দেহে মায়া নেকড়ে ছিল।'

'ওহ্, গড!' বিড়বিড় করল কিম।

'তবে তোমার স্বামীর অনেক সাহস,' উরসুলা আশ্বস্ত করল কিমকে। 'সে সাহসী না হলে তোমরা অনেক আগেই মারা যেতে। সে সাহসের সাথে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং এই অশুভ শক্তি সম্পূর্ণ শক্তিতে পুরোপুরি বলীয়ান হওয়ার আগে আমরা একত্রিতভাবে তাকে হঠিয়ে দিতে পারব। পুনর্জন্মের জন্য এখনও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি সে। পৌঁছানোর আগেই তাকে থামিয়ে দিতে হবে।

'কিন্তু কীভাবে করবেন কাজটা? হরর ছবিতে যেমন দেখা যায় রাত নামল তারপর প্রাসাদে ঢুকলেন জিন্দালাশ শিকারে?' জিজ্ঞেস করল এরিক।

'না, সাসপেন্স সৃষ্টির জন্য হরর ছবিতে ওসব দেখানো হয়। আমরা সারারাত ঘুমিয়ে, তাজা শরীর মন নিয়ে পরদিন দিনের বেলা বেরিয়ে পড়ব অভিযানে। এরকম আশা করা হাস্যকর হবে যে কাঠের কফিনে ঘুমিয়ে

থাকবে শয়তান এবং আমরা কাঠের গোঁজ বুকে ঢুকিয়ে তাকে মেরে ফেলব। এসব ফিল্মেই মানায়। নাটকীয় কিছুই করব না আমরা। শয়তানের উৎস বা মূল বের করতে হবে আমাদের, দেখতে হবে কখন সে অশুভ রূপে আকার নেয়। ওই তিন অভাগা যা দেখার পরে মারা গেছে, সেগুলো আমরা খুঁজে বের করব। আমি জানি না, তবে প্রার্থনা করি যা খুঁজছি তা যেন পেয়ে যাই। প্রত্যাশিত জিনিসগুলো খুঁজে পাবার পরেই কেবল ওগুলোকে ধ্বংস করতে পারব।'

'যদি খুঁজে না পাওয়া যায়?' ধ্যাত আবার বোকার মতো হয়ে গেল প্রশ্নটা, ভাবল এরিক।

'নেতিবাচক কোনো চিন্তা করবে না!' ধমক দিল উরসুলা। 'তাহলে সোজা শয়তানের খপ্পরে পড়বে। সব সময় ইতিবাচক চিন্তা করবে। আর ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখবে। কারণ আমরা তার নির্বাচিত প্রতিনিধি।'

'কিমের যদি কোনো আপত্তি না থাকে...' বলল এরিক।

'আমার রাজি না হয়ে উপায় নেই,' দুর্বল হাসল কিম। 'তবে ওই ভুতুড়ে পাতালঘরে আবার যাওয়ার সাহস আমার নেই।'

'আমরা যা খুঁজছি তা অপার্থিব নয়, পার্থিব জায়গাতেই হয়তো পেয়ে যাব,' অ্যাশট্রেতে শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেটটা গুঁজল উরসুলা, পিছলে নামল টুল থেকে। 'তবে আমরা যা করতে যাচ্ছি তাতে সিনেমার মতো কিছু ঘটবে না। আমি আর কিছু বলব না, কী ঘটবে নিজেরাই দেখতে পাব। তোমরা সকাল সকাল উঠে পোড়ো। গুড নাইট।'

দৃঢ় পা ফেলে লাউঞ্জ বার থেকে বেরিয়ে গেল উরসুলা, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক নারী।

কিম জানে না কেন, তবে ওর কেমন একটা স্বস্তি বোধ হচ্ছে। এই অজানা ভয়ংকরের বিরুদ্ধে লড়াইতে ওরা জিততে পারবে কিনা জানে না, তবে একজন সঙ্গী তো মিলল। আর আসল যুদ্ধ তো এখনও শুরুই হয়নি, শুরু হতে চলেছে মাত্র।

তেরো

আবার প্রেম করতে পারল ওরা। এটি একটি ভালো লক্ষণ, ভাবল কিম আর্মস্ট্রং। অল্প সময়ের জন্য হলেও সে লচসাইড হোটেল এবং তার প্রাসাদের চিন্তা মাথা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পেরেছে। ওগুলো ওর মনের ছায়ায় ওঁৎ পেতে ছিল। কিম এবারে ওই ছায়াটাকে ঠেলে সরিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেক্স থেরাপির কাজ করে। বিছানায় ঝড় তোলার পরে শরীর এবং মনের প্রবল শান্তি কিছুক্ষণের জন্য হলেও দুশ্চিন্তাগুলোকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

'এরিক?' স্বামীকে ওর একটা কথা বলার ছিল কিন্তু উপযুক্ত সময় বের করতে পারছিল না। কথাটা অবশ্য বাড়ি ফিরে গিয়ে বললেও হতো। কিন্তু আর তর সইছে না কিমের।

'কী?' জড়ানো গলায় সাড়া এলো; সেক্সের পরে মেয়েদের চেয়ে পুরুষরা বেশি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যায়, ভাবল কিম।

'এরিক...তুমি জানো আমরা... সংসার শুরু করার কথা বলেছিলাম?'

কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরবতা। এ সময়ে কথাটা বলা কি ঠিক হলো? ভাবছে কিম। এরিক আর দশটা পুরুষের মতো টিপিক্যাল ফ্যামিলি ম্যান নয়। অবশ্য বিয়ের পরে প্রথম প্রথম সব পুরুষই বোধহয় এরকম হয়। বিয়ে পুরুষকে পরিবর্তন করে। তবে এতে সময় লাগে।

'হুঁ,' এরিকের কণ্ঠ খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

'আমরা তো কিছুদিন অপেক্ষা করব ভেবেছি। আগে আমার ফুলের ব্যবসাটা জমে উঠুক, কিছু টাকা জমাই, মর্টগেজের খানিকটা লোন শোধ করি। তুমিও তো চাকরি করবে বলেছিলে।'

'বলেছিলাম, তবে...কিন্তু এখন ভাবছি যত তাড়াতাড়ি একটা বাচ্চা নেয়া যায় ততই মঙ্গল।' মনের কথাটা অবশেষে বেরিয়ে এলো কিমের। কথাটা বলে ফেলে স্বামীর মতো সেও কম বিস্মিত নয়। গতকালও এরকম কোনো চিন্তা তার মাথায় আসেনি। আসলে আজকের মিলনটাই ওর মধ্যে মা হবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে। কল্পনায় দেখতে পেল ওর

কোলে ফুটফুটে একটি বাচ্চা। প্রবল ইচ্ছে জাগল মনে ইস্, এখন যদি সত্যি ওর একটা বাচ্চা থাকত তাহলে পাশে শুইয়ে বুকের দুধ খাওয়াত।

'তবে বিষয়টি নিয়ে আমরা ভাবব।'

হঠাৎ চোখ ফেটে জল এলো কিমের। 'তুমি যদি সন্তান না চাও তো বললেই পারো। আমি বুকে পাথর বেঁধে থাকব।'

'অবশ্যই আমি সন্তান চাই। তবে যথাসময়ে। একটু সময় দাও। আমাদের বিয়ে হয়েছে এক হপ্তাও হয়নি।'

'বহু স্ত্রী হানিমুনের রাতে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। আমার মাও হয়েছিল।

ফুহ্, ঘুমাবার সময় কী সব উদ্ভট কথাবার্তা, ভাবছে এরিক। ওর মা মধুচন্দ্রিমার রাতে তার কুমারীত্বের অবসান ঘটিয়েছে!

'ঠিক আছে। এ বিষয় নিয়ে আগামীকাল কথা বলা যাবে। আজ রাতে আর তোমাকে গর্ভবতী করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি এখন জীর্ণ ঘোড়া।'

'এসব নিয়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না, এরিক। আমি খুব সিরিয়াস।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এরিক। জানে শেষতক কিমের জেদের কাছেই পরাস্ত হতে হবে তাকে। কিম গর্ভবতী হবে। নয় মাস পরে এরিককে বাবার ভূমিকা পালন করতে হবে। তাকে বাচ্চার প্রাম ঠেলতে হবে এবং কয়েক কদম যাওয়ার পরপর প্রতিবেশীরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ক্রন্দনরত বাচ্চার দিকে তাকাবে। শুক্রবারের রাতগুলোর আড্ডাকে বিদায় জানাতে হবে এরিককে।

বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল কিম। অন্ধকারে সাদারঙটা ফুটে আছে। মা হবার চিন্তাটা মাথা থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। একটা সন্তান নেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না কিম।

ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ বুজে এসেছিল কিমের। হঠাৎ জেগে উঠল ও, ছাদের দিকে চলে গেল দৃষ্টি। মা হবার চিন্তাটা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে মনে, কে জানে হয়তো ও ইতিমধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে, ভাবনাটা রোমাঞ্চিত করে তুলল শরীর। বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে রাখাবে সে বুকের মাঝে, এটুকুই তার একমাত্র চাওয়া। ওহ্ প্লিজ, গড...

ও সত্যি একটা বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে আছে!

উপলব্ধিটা বিদ্যুতায়িত করে তুলল যেন কিমকে, ক্ষুদ্র কাঠামোটা ওর বুকের সাথে সেঁটে রয়েছে, মুখ খুঁজছে ওর স্তন। নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে কিম, কিন্তু কী সুন্দর স্বপ্ন! নাইট ড্রেসটা টেনে বুকের ওপর তুলে ফেলল কিম, ছোট্ট মুখটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল একটি স্তনের বোঁটা।

বাচ্চার শরীর অসম্ভব শীতল, যেন একখণ্ড বরফ। ন্যাংটো শরীরটার ঠাণ্ডা ত্বক মোচড় খাচ্ছে কিমের গায়ে, ওর গায়ে হিম ছড়িয়ে দিচ্ছে যেন। দোষটা ওরই, ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, বাচ্চার দিকে নজর দিতে পারেনি, ওকে অগ্রাহ্য করেছে। ইস, বেচারী বাচ্চা, সোনা, তোমাকে আমি শরীরের উত্তাপ দেব।

স্তন চুষছে বাচ্চা, ব্যথা পেল কিম। দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে বোঁটা। কিন্তু একী করে সম্ভব? কিম জানে নবজাতক শিশুর মুখে দাঁত থাকে না। কিন্তু ও তো দুধ খাচ্ছে না। কিমের বুকে কামড় দিয়ে ওকে ব্যথা দিচ্ছে। ব্যথায় কুকড়ে গেল কিম। অন্ধকারে বাচ্চার চেহারা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা আবছা কাঠামো ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। ঝুলে আছে বুকের সাথে।

বাচ্চার গা থেকে বিকট গন্ধ আসছে। নাক কুঁচকে গেল কিমের। ওর ন্যাপি বদলানো দরকার। তবে কাজটা করতে পারবে কিনা জানে না কিম। কারণ কোনোদিন এসব করেনি সে। কিন্তু বাচ্চার পরনে কোনো ন্যাপি নেই, নিতম্বে হাত বুলাতে গিয়ে টের পেল কিম।

নরম, মসৃণ ত্বকের বদলে হাতে শক্ত চামড়ার স্পর্শ পেল। আর বাচ্চার গা থেকে যে গন্ধটা আসছে তা-ও ঠিক মলের গন্ধ নয়, কেমন পচা সব্জির দুর্গন্ধ!

হঠাৎ ওর মনে খটকা লাগল কোথাও কী যেন ঠিক মিলছে না, মস্ত একটা ভজকট হয়ে গেছে। স্বপ্নটা পরিণত হচ্ছে দুঃস্বপ্নে, ওর শান্তি বিঘ্নিত করতে পাঠানো হয়েছে এটাকে, ওর অবচেতন মনকে যে গ্রাস করে রেখেছে অশুভ জায়গাটা তা-ই যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। জেগে ওঠো, কিম। জেগে উঠলেই দেখবে তোমার বুকের ওপর কোনো বাচ্চা নেই। নিজেকে বলল ও। কিন্তু আমি একটি বাচ্চা চাই। তবে এটার মতো বাচ্চা নয়!

হঠাৎ ওটাকে দেখতে পেল ও, ওটার চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠল, বনমানুষের মতো ভীষণ কদাকার একটা মুখ, মুখটা খোলা, ভাঙা, কালো কতগুলো দাঁত বেরিয়ে আছে; গায়ের চামড়ায় ঝুলকালির মতো আঁশ, সুচালো, খসে খসে পড়ছে শরীর থেকে। কিমের দিকে তাকিয়ে আছে গভীর কোটরে ঢোকা দুটো চোখ। যেন প্রবল ঘৃণা বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখ জোড়া থেকে। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, বলছে যেন ওটা। দ্যাখো, তুমি কী জন্ম দিয়েছ!

না! যেভাবে দ্রুত এসেছিল সেভাবে চট করে চলে গেল কিমের মাতৃত্বভাব। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ও, খাটের বাজুর সাথে

ঠেকাল পিঠ। ভয়ংকর বাচ্চাটাকে শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল। কিন্তু ওটা শক্তভাবে এঁটে আছে গায়ের সাথে, ধারালো নখ দিয়ে খামচে ধরে রেখেছে কিমকে, সুচালো ডগাগুলো বিঁধছে চামড়ায়। কিম ওটাকে টেনে সরাতে চাইল বুক থেকে, মার দেয়ার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল।

হেসে উঠল বাচ্চা। কী ভয়ংকর খলখলে হাসি! মুখ দিয়ে ভক করে বেরিয়ে এলো বিকট, পচা গন্ধ। ধাক্কা মারল কিমের নাকে। কিম ঝট করে মাথাটা পেছনে সরিয়ে নিল। আমি বাচ্চা চাই না। আমি কখনও চাইনি। ওহ্, এটাকে দূর করো।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে চাইল কিম। কিন্তু কোনো রা বেরুল না শুধু শ্বাসকষ্টের মতো ফ্যাসফেসে একটা আওয়াজ ছাড়া। ঘরটা খুব ঠাণ্ডা, দমকা হাওয়া হামলে পড়ছে ভবনের গায়ে, যেন ধরে ঝাঁকাচ্ছে, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। নরক থেকে ছুটে আসা প্রতিহিংসা নেয়ার জন্য উন্মত্ত এক ঝড়, যে ঝড় দিয়ে শয়তান ধ্বংস করে দিয়েছিল শতাব্দী প্রাচীন প্রাসাদ। তুমি একটা বাচ্চা পেয়েছ, কিম আর্মস্ট্রং, শয়তানের সন্তান!

কোনোমতে হাচড়েপাচড়ে বিছানা থেকে নামল কিম, বাচ্চাটা ওর স্তনের বোঁটা কামড়ে ধরে এখনও ঝুলে আছে বুকে। কদম পেছাতে পেছাতে এরিককে খুঁজল ও। স্বামীকে দেখতে পাবার আশা করে না কিম তবে ও এখনও শুয়ে আছে বিছানায়। নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। এরিক ঘুম থেকে জাগবে না জানে কিম। ভয় এবং আতংক গ্রাস করল ওকে। পালাতে হবে ওকে, ল্যান্ডিং কিংবা অন্য কোথাও যাবে ও, এই ভয়াল জিনিসটার কবল থেকে মুক্তি পেতে হবে। এটা সত্যি হতে পারে না ভাবল কিম। কিন্তু এটা সত্যি। এটা খুবই বাস্তব একটা জিনিস এবং জিনিসটা মরা মানুষের মতো ঠাণ্ডা, কিমের পলায়ন দেখে যেন হিহি করে হাসছে।

দরজা বন্ধ থাকবে এবং আমি এখান থেকে বেরুতে পারব না, ভাবল কিম। তবে কাঁপা হাতে নবে মোচড় দিতেই খুলে গেল দরজা। টলতে টলতে অন্ধকার ল্যান্ডিং-এ পা রাখল ও। কাউকে ঘুম থেকে জাগাতেই হবে। আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব। আমাকে কেউ না বাঁচালে ঠিক পাগল হয়ে যাব।

অন্ধের মতো পালাচ্ছে কিম। কোথায় চলেছে জানে না। জানাটা এ মুহূর্তে জরুরীও নয়। কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে অসতর্ক ভঙ্গিতে নামছে, বেশ কয়েকবার নিজের নাইট ড্রেসে পা বেঁধে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ফড়ফড় করে ছিঁড়ে গেল পোশাক, তবে শেষ মুহূর্তে ভারসাম্য রক্ষা করল

কিম। বাচ্চাটাকে হত্যা করার পরে লাশ লুকিয়ে ফেলবে, সিদ্ধান্ত নিল ও। আরেকটা দরজা দিয়ে বেরুতেই কাঠের একটা প্লাটফর্মে চলে এলো কিম। ওর গায়ে হাঁ হাঁ করে আছড়ে পড়ল রাতের হিমশীতল বাতাস, যেন ছিঁড়ে ফেলবে রাত পোশাক, নগ্ন করে দেবে ওকে। ওর মাথার ঝড়ো আকাশ, বৃষ্টি পড়ছে গায়ে। হঠাৎ কিম বুঝতে পারল সে হোটেল ছেড়ে পুরানো প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে।

ছুটল কিম। একটা বৃত্তাকার রাস্তা ধরে দৌড়াল। কিন্তু ছুটতে ছুটতে আবার একই জায়গায় চলে এলো ও। আমি পাগল হয়ে যাব। ওর পায়ের নিচে পাথুরে উঠোন বৃষ্টিতে ভিজে শয়তানের মতো দাঁত বের করে হাসছে। কুড়ি গজ লম্বা উঠোন। দু'হাত দিয়ে বুকে ঝুলে থাকা সৃষ্টিছাড়া জীবটাকে টেনে আলগা করতে চাইল কিম। হারামীর বাচ্চা। তোকে আমি পাথরে আছাড় মেরে বের করে দেব ঘিলু। আমি...

কিমের হঠাৎ মনে হলো ও একা নয় এখানে, আরও কেউ একজন আছে। তবে তার পায়ের শব্দ শোনা না গেলেও উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে। পাঁই করে ঘুরল কিম। ওহ্, হোলি মাদার, না!'

ওর পাঁচ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। কিম অনুমান করল লোকটা হোটেল থেকে এখানে পিছু নিয়ে এসেছে। লোকটার মধ্যে ভয়ংকর অশুভ কিছু একটা আছে। সে বেশ লম্বা, সামান্য কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে, গায়ের আলখেল্লা পতপত করে উড়ছে বাতাসে। সেই সাথে লম্বা চুলও। তাকিয়ে আছে কিমের দিকে। চোখ নয় যেন তরল আগুন। ভয়ানক জ্বলজ্বল করছে। কুৎসিত হাসি মুখে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে হিসহিস আওয়াজ। ভ্যাম্পায়ার!

সভয়ে পিছিয়ে গেল কিম। ও এখন চিৎকার দিলেও লাভ হবে না। কেউ শুনতে পাবে না।

কিম জানে না কতক্ষণ ও ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পা জোড়া নড়াচড়া করতে চাইছে না। ঝুল বারান্দা ধরে থাকল কিম যাতে হাঁটু ভেঙে না পড়ে যায়। যেন রক্তপিপাসু বেজি সম্মোহন করে রেখেছে ইঁদুর। শিকারী শিকারকে বাগে পেয়ে গেছে। তাই হত্যা করার তাড়া নেই।

বাচ্চাটা সম্পর্কে যেন সচেতন নয় লোকটা, ভীতিকর চোখ জোড়া শুধু কিমের ওপর নিবদ্ধ। যেন বলছে এসো, মেয়ে, আমি তোমাকে অন্ধকারের জগতে নিয়ে যাব দুজনে থাকব অনন্তকাল।

'না!' দুর্বল গলায় প্রতিবাদ করল কিম। প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও যেন

হারিয়ে ফেলেছে। কয়েক মিনিট আগের ভীতিকর ঘটনাগুলো ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছে, তবু যুক্তির সরু সুতোয় ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। 'আমি যাব না। তুমি আমাকে আঘাত করতে পারবে না। তুমি তো প্লাস্টিকের ডামি মাত্র। ওরা তোমাকে ওখানে এনে রেখেছে আমাকে ভয় দেখাতে।'

ভয়ংকর রক্ত হিম করা খনখন হাসিতে ফেটে পড়ল ভ্যাম্পায়ার, ব্যথায় আর্তনাদ করল কিম, বাচ্চাটা জোরে কামড় বসিয়ে দিয়েছে বুকে। এটা কল্পনা নয়, বাস্তব, বুঝতে পারছে কিম।

সামনে পা বাড়াল ভ্যাম্পায়ার। যেন উড়ে আসছে কিমের দিকে, দুহাত সামনে বাড়ানো। মনটা ঝট করে পেছনে চলে যেতে চাইলেও বিদ্রোহ করল পা জোড়া, একচুল নড়ল না ও দুটো। বরফ ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে প্রবলভাবে কেঁপে উঠল কিম, শক্তিশালী মুঠোয় চেপে ধরেছে ওকে, টানছে সামনের দিকে...

এরিকের ঘুমটা ভালো হলো না। বিছানায় পিঠ দিয়ে ও কখনও সুস্থির থাকে না। ঘুমের মধ্যে বারবার এপাশ-ওপাশ করতে থাকে, বিড়বিড় করে, খোলা মুখের ভেতরে জিভ শুকিয়ে কাঠ। এখন ঠিকমতো ঘুম না হওয়ার কারণ একটা স্বপ্ন। দুঃস্বপ্নই বলা চলে–কিমকে ও খুঁজে পাচ্ছে না, হারিয়ে গেছে।

স্বপ্নে একটা বড় বাগান দেখল এরিক। নিজের বাড়ির বাগান। সযত্নে ছাঁটাই করা ঝোপঝাড়গুলো এখন ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। এরিক দু'হাতে ঝোপ ঠেলে এগোচ্ছে, কিমের নাম ধরে ডাকছে, তবে কোনো সাড়া পাচ্ছে না। হঠাৎ সামনে ফুটল অচেনা একটা মরুপথ, ধুধু মরুভূমি, এখানে লুকাবার জায়গা নেই। কিন্তু কিমকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না এরিক।

কী যে অসহ্য গরম। ওর জিভ ফুলে ঢোল, প্রচণ্ড তেষ্টায় ফেটে যেতে চাইছে বুক।

'পানি! পানি!' বলে চিৎকার করে উঠল এরিক। ও জানে ওর স্ত্রী এখানেই কোথাও আছে। ওকে শীঘ্রি খুঁজে না পেলে দুজনেই পানির তৃষ্ণায় মারা যাব। কিম, আমার ডার্লিং, কোথায় তুমি?

হঠাৎ ঝপ করে নেমে এলো শীত। ঠাণ্ডায় গায়ে কাঁটা দিল এরিকের। ঘুমের মধ্যে কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নিল শরীরে। দেখছে ও একটা প্রাসাদে ঢুকে পড়েছে। তবে এ প্রাসাদে এর আগে কখনও আসেনি। অন্ধকার প্যাসেজগুলো মুখ হাঁ করে আছে। এই প্যাসেজগুলোই লুকিয়ে রেখেছে ওর প্রিয়তমাকে। এরিক কিমের নাম ধরে ডাকল। চিৎকারটা

প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো ওর কাছে। ভয় পেয়েছে এরিক, তবে নিজের জন্য নয়, কিমের জন্য ভয় লাগছে। ওরা কিমকে অপহরণ করেছে। কোনো সর্বনাশ ঘটে যাবার আগেই কিমকে খুঁজে পেতে হবে।

হঠাৎ কিমের গলা শুনতে পেল এরিক। কিন্তু কী ভয়ংকর কণ্ঠ! এরিকের শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমাট করে দিল। ওটা নিশ্চয় কিম, কিন্তু এমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে কেন ওর কণ্ঠ। বুড়িদের মতো খনখনে এবং কর্কশ। কিম সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে না, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মশকরার সুরে বলছে, 'এরিক আমি এখানে। আমার একটি বাচ্চা হয়েছে। তুমি তো আর আমাকে সন্তান দেবে না। তাই ও দিয়েছে!'

ব্যাপারটা রোমহর্ষক। কিম এই ভয়ংকর জায়গাটায় বিকলাঙ্গ এক শিশুর জন্ম দিয়েছে যার বাবা মানুষের ছদ্মবেশে কোনো ভয়াল পিশাচ। আতংক এবং ক্রোধের হল্কা উঠল এরিকের শরীরে। ছুটল ও। দৌড়াতে গিয়ে বারবার আছাড় খেল। আবার সিধে হলো। হারামজাদাকে আমি খুন করব, মনে মনে শপথ নিল এরিক। কিন্তু কোথায় সে?

একটা বাঁক ঘুরল এরিক, একটা নারী কাঠামো চোখে পড়ল। ওর আনন্দ হঠাৎ পরিণত হলো হতাশায়। ওটা কিম নয়, অন্য কোনো মহিলা। মহিলাকে চেনা চেনা লাগছে কিন্তু নামটা মনে পড়ছে না। ও হ্যাঁ, ওটা তো উরসুলা। গায়ে কালো আলখেল্লা, হাঁটার সময় পেছনে উড়ছে, চেহারায় ফুটে আছে আতংক। ঠোঁট নড়ছে, কর্কশ, ফিসফিসে কণ্ঠটা বুঝতে বেগ পেতে হলো এরিকের।

'ওরা কিমকে নিয়ে গেছে,' চিৎকার করছে মহিলা, তবে ওর ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে কথা বুঝে নিতে হচ্ছে এরিককে।

'ওরা ওকে বাচ্চা দিয়েছে। এখন ওরা ওকে নিজেদের ব্যবহারের জন্য ধরে নিয়ে গেছে। ও প্রাসাদে আছে। জলদি যাও...হয়তো ইতিমধ্যে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে।

ছুটতে শুরু করল এরিক, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোতে জোর করল সাড়া দেয়ার জন্য, আর তখন ও জেগে গেল ঘুম থেকে। ও আধো অন্ধকার হোটেলের বেডরুমে শুয়ে আছে, বেডক্লথগুলো গুটিয়ে পড়ে রয়েছে পায়ের কাছে। গুঙিয়ে উঠল এরিক। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নটা মাথা ঝাঁকি দিয়ে দূর করার ব্যর্থ চেষ্টা করল। উরসুলার কথাগুলো ওর বিভ্রান্ত মস্তিষ্কে এখনও ঘুরছে, শুকনো জিভ বের করে ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করল। এখন একটা ড্রিংক খুব দরকার। বিশ্রী ওই স্বপ্ন!

হাত বাড়াল কিমকে জড়িয়ে ধরার জন্য, নিজেকে সন্তুষ্ট করতে যে ওর স্ত্রী পাশে আছে। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে এরিকের।

কোঁচকানো বেডক্লথে খামচে ধরল আঙুল। যেখানে ওর বউর শুয়ে থাকার কথা সে জায়গাটা খালি। ধক্ করে উঠল বুক। কিম নেই বিছানায়।

উঠে বসল এরিক। বিছানার আলোর সুইচ টিপে দিল খুট শব্দে। কিন্তু উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হলো না ঘর। ধ্যাত, নিশ্চয় ফিউজ হয়ে গেছে বাল্ব। হাচড়ে পাচড়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল এরিক, চেক করল টয়লেট, কিন্তু কিম নেই ওখানে। ব্যাপারটা হাস্যকর বুঝতে পারছে ও...কারণ এখনও শুনতে পাচ্ছে উরসুলার গলা। তার কর্কশ ফিসফিসানি বাজছে যেন কানে, ও প্রাসাদে আছে। জলদি যাও...হয়তো ইতিমধ্যে যা সর্বনাশ হবার হয়ে গেছে।

স্বপ্নে কে কী বলল না বলল তা বিশ্বাস করা স্রেফ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এরিকের তো কোনো উপায়ও নেই। অন্য কোনো জায়গা হলে স্বপ্নের ব্যাপারটা অবিশ্বাস করত ও। কিন্তু এটা বিনাহি প্রাসাদ বলেই বিষয়টি অবিশ্বাস করতে পারছে না।

খালি পা, শুধু পাজামা পরা এরিক কদম বাড়াল দরজায়, ঘরের পচা একটা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারছে। ওয়েস্ট ডিপোজাল ইউনিট থেকে গন্ধটা আসতে পারে ওখানে ছেলেটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এক সেকেন্ড ল্যান্ডিং করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল এরিক। আগে রিসেপশনে খবর নিয়ে তথাকথিত অল-নাইট সার্ভিসে ফোন করা উচিত। না, সিদ্ধান্ত নিল ও, সময় নেই। উরসুলা বলেছে একটা সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না। প্রাসাদে যেতে হবে ওকে।

প্রাসাদের একতলায় চলে এলো এরিক তীব্র বাতাসের সাথে যুদ্ধ করতে করতে। পায়ের নিচে ফুটল শক্ত বোর্ড, হাজার হাজার স্প্লিন্টার যেন ফুটো করে দেবে পায়ের পাতা। ব্যথাটা অগ্রাহ্য করল এরিক। পাজামায় যেন ঢেউ উঠেছে, বাতাসের চাপে খুলে পড়ে যেতে চাইছে। দাঁড়িয়ে থাকল এরিক, অন্ধকারে সয়ে নিচ্ছে চোখ।

লম্বা শরীরটাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও। কাঠামোটাকে চেনা যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে প্রায়-নগ্ন কিমকে ধরতে যাচ্ছে। বাতাস হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো এরিকের দিকে, প্রায় ধাক্কা মেরে ওকে ফেলে দিতে চাইল একতলার দেউড়ির দিকে। যেন বলতে চাইছে চলে যাও, এখানে তোমার কোনো ভূমিকা নেই! যে অদৃশ্য শক্তিটা ওকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলতে চাইছে, প্রবল বৃষ্টির চেহারা নিয়ে ওকে অন্ধ করে দেয়ার পাঁয়তারা কষেছে তার সাথে প্রাণপণে লড়াই করে

চলল এরিক। নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে চলল ওয়াকওয়ে ধরে, অভিশাপ দিচ্ছে বাতাস এবং বৃষ্টিকে, চিৎকার করছে লম্বা লোকটাকে উদ্দেশ্য করে। ওটা মানুষ নয়, ওটা তো ভ্যাম্পায়ারের ডামি মাত্র, নিজেকে বোঝাচ্ছে এরিক।

এরিক ভাবল ইস্, এখন যদি উরসুলা ইলিংশওয়ার্থ এখানে থাকত। সে নিশ্চয় বলে দিতে পারত কী করা উচিত। কিন্তু উরসুলা এখানে নেই। যুদ্ধটা একাই করতে হবে এরিককে। আবার গলা ফাটিয়ে চেঁচাল ও, ভ্যাম্পায়ারের প্রতি তীব্র রাগ এবং ঘৃণার বিস্ফোরণ ঘটল। 'ওকে ছেড়ে দে, শয়তান।'

ঘুরল ভ্যাম্পায়ার, কিমকে ধরে রাখা মুঠি আলগা হলো। এরিক দেখল ভ্যাম্পায়ারের চোখ জোড়া ভাঁটার মতো জ্বলছে। তাতে ঘৃণা এবং ভয়! হিস্স্ করে একটা শব্দ উঠল, সম্ভবত বাতাসের, তারপর ট্রাফিক কন্ট্রোল করা পুলিশ সার্জেন্টের মতো লম্বা একটা হাত ওর দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও মাঝপথে ঝট করে থেমে গেল। যেন অধৈর্য গাড়ির ড্রাইভারদেরকে থামতে বলছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল এরিক। একটা অস্ত্র যদি হাতে থাকত, ভাবল ও। আড়চোখে পায়ের নিচে তাকাল। জুৎসই কোনো পাথর চোখে পড়ল না। আগেরবার এখানে দাঁড়িয়ে অ্যালসেশিয়ানটা যখন কিমকে লক্ষ করে দাঁত খিচাচ্ছিল ওই সময় কুকুরটাকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল এরিক। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় লাগছে ওর। নিজের সুবিধাজনক অবস্থানের কথা ভেবে দাঁত বের করে হাসছে ওর শত্রু। অবিনাশীর বিরুদ্ধে মরণশীল মানুষের করার কিছু থাকে না।

বাঁ হাতটা তুলল এরিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর হরর ছবির নায়করা যা করে তা-ই করল ও, বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল। কাজটা বোকার মতো হয়ে গেল জানে এরিক, কারণ এতে কোনো ফায়দা হবে না। আবার মনে পড়ে গেল উরসুলার কথাগুলো : বিশ্বাস রাখুন। আমরা ঈশ্বরের ভৃত্য।

এরিক এবার ওপরে-নিচে হাত নাড়ল। 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, পিতা, পুত্র এবং হলি গোস্টে আমার বিশ্বাস রয়েছে।'

আবার হিস্স্ শব্দ করল ভ্যাম্পায়ার। তবে এবার হতাশার চিৎকারের মতো শোনাল শব্দটা, পিছিয়ে গেল সে কিমকে ছেড়ে দিয়ে। এরিক তাকাল কিমের দিকে। ঈশ্বর, ওর বুকে ভয়ংকর ওই জিনিসটা কী ঝুলে আছে? নজর ফেরাল অন্ধকারের জীবটার দিকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে ওর, প্রচণ্ড বৃষ্টি এবং বাতাসের চাবুক হামলে পড়ছে গায়ে, যেন শয়তানের শিষ্য হিসেবে প্রকৃতির দুই শক্তি নিষ্ঠুর নির্যাতন করে চলেছে ওকে।

'তুমি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, ভ্যাম্পায়ার।' চেঁচিয়ে উঠল এরিক। কথাগুলো যেন আঘাত হানল ওর দুশমনকে, পিছিয়ে গেল লম্বা শরীরটা, সেফটি রেলের সাথে ঠেসে ধরল শরীর। 'তুমি সেটা জানো। তুমি কিংবা তোমার নোংরা মিত্ররা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তোমাকে শায়েস্তা করতে আসছি!'

কিমের দিকে এগিয়ে গেল এরিক। কিম ওর হাত জড়িয়ে ধরল। ফোঁপাচ্ছে। কিছু একটা খসে পড়ল ওর বুক থেকে, মেঝেতে থপ্ শব্দ করল। ওই হারামজাদার দিকে চোখ রাখো, নিজেকে বলল এরিক, ও পালাবে কারণ ও ঈশ্বরকে ভয় করে।

আতংকিত হয়ে পড়েছে ভ্যাম্পায়ার। ছুটে পালাতে চাইল কিন্তু যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। সে উন্মাদের মতো রেইল বেয়ে উঠে পড়ল, উবু হয়ে বসে থাকল ওখানে, মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করছে।

আরেক কদম বাড়ল এরিক আবার ক্রস আঁকল। কুঁকড়ে গেল ভ্যাম্পায়ার, চিৎকার দিল এরিক, 'আমি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ দাস।'

দুলে উঠল ভ্যাম্পায়ার, পেছন দিকে হেলে গেল, তারপর নিচের দিকে পতন শুরু হলো ওটার। চেঁচিয়ে উঠল কিম।

হারিকেন অ্যাঞ্জেলার অগ্রদূত এই প্রবল ঝড়ো বাতাস আর্তনাদ তুলছে, বেদনায় যেন গোঙাচ্ছে তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে, যেন পরাজয়টাকে মেনে নিতে পারছে না, ঢেকে দিতে চাইল কুড়ি ফুট নিচ থেকে ভেসে আসা শরীর পতনের থপ্ শব্দটা।

'মাই গড!' ক্রন্দনরত কিমকে বুকের সাথে ধরে রাখল এরিক, দুজনেই কাঁপছে থরথর করে। 'ঈশ্বরের নামে...'

পায়ে কী একটা যেন বাঁধল। তাকাল এরিক। ঝড়ো মেঘের আড়াল থেকে ভেসে আসা মৃদু চাঁদের আলোয় দোমড়ানো মোচড়ানো একটা শরীর দেখতে পেল ও। একটা ভাঙা চোরা পুতুল, উঁচিয়ে রেখেছে মুখটা, রঙকরা বীভৎস একটা মুখোশ, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে সারা গা। বিবর্ণ, প্রাণহীন, করুণ তবে ভয়ংকর দেখতে একটা শিশুর প্রতিমূর্তি যেন এটা।

'ওহ্, এরিক,' কিম তাকাল ওটার দিকে, ঝট করে সরিয়ে নিল মাথা। 'ওরা...ওরা আমাকে একটা বাচ্চা দিয়েছিল। কী ভয়ংকর বাচ্চা!' এরিক ওটার গায়ে পায়ের আঙুল ঠেসে ধরতে শরীরে দেবে গেল আঙুল, পচপচ শব্দ হলো। গায়ের জোরে ওটাকে লাথি কষাল, ঝড়ো রাতের আঁধারে ছিটকে গেল সৃষ্টিছাড়া জীব। ডিগবাজি খেতে খেতে রওনা হয়ে গেল নিচে।

'আমাদের নিচের বন্ধুটির জন্য একটা খেলনা পাঠিয়ে দিলাম।' হাসার চেষ্টা করল এরিক। 'চলো, ভেতরে যাই। তবে আগে ভ্যাম্পায়ার ডামিটার কী দশা হয়েছে দেখে আসি। যা ঘটেছে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। তবে উরসুলা ঠিকই বলেছিল।' ভাগ্যিস, ঈশ্বর ওকে পাঠিয়েছিলেন, মনে মনে বলল ও।

উঠোনের পিচ্ছিল পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ওরা। প্রচণ্ড দমকা হাওয়া আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ে, ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকল। লোহার রেইল ধরে ধরে নামছে। প্রকৃতির দুই শক্তিকে শয়তান পাঠিয়েছিল ওদেরকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে।

এক টুকরো চাঁদের আলোয় দেখা গেল ভ্যাম্পায়ার চিৎ হয়ে পড়ে আছে, নাক-মুখ থেঁতলানো, ভাঙাচোরা একটা শরীর। বাতাসে উড়ছে ওটার ছিন্ন পোশাক। হাত-পা ছড়িয়ে নিশ্চল পড়ে রয়েছে ভ্যাম্পায়ার।

কিম পিছিয়ে গেল। ওটার সামনে যেতে চাইছে না। ভ্যাম্পায়ারের পাশে বিকট চেহারার বাচ্চাটা। ওটাও মরেছে তার প্রভুর সাথে। তবে জড় পদার্থরা মরে না, তাদের কেবল পরিবর্তন হয়।

এরিকের মনে খুব আনন্দ হলো। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে সবাইকে জানান দেয় দেখেছ আমি শয়তানের সহচরকে হত্যা করেছি। আমি অপরাজেয়। তবে একইসাথে মনে করিয়ে দিল নিজেকে ঘটনার সমাপ্তি এখানে নয়। ভ্যাম্পায়ার কাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে, এটা একটা প্রতীক, শয়তানের শয়তানীর প্রমাণ।

'এটা...এটা দেখতে এমন বাস্তব...' কিম অন্যদিকে ঘুরে তাকাল। কিম ঠিকই বলেছে। খুবই বাস্তব মনে হচ্ছে ওদুটোকে হঠাৎ শিরদাঁড়া বেয়ে নামল বরফ জল। প্লাস্টিকের গা থেকে তো রক্ত পড়ে না...

ওটার মুখ থেকে রক্ত পড়ছে! শুধু তা-ই নয়, ভ্যাম্পায়ারের চেহারাও বদলে গেছে অনেকটা। ভৌতিক ভাবটা আর নেই, সেখানে ভয় এবং যন্ত্রণার ছাপ। খুব বাস্তব লাগছে!

'ওহ্, মাই গড!' এবারে বুঝি সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে যাবে কিম। অন্যদিকে তাকিয়ে শক্ত করে বুজে ফেলল চোখ। কিন্তু মন ছবি থেকে দূর করতে পারল না চেহারাটা।

ভ্যাম্পায়ারের বদলে যাওয়া মুখটা বদলে গিয়ে হয়ে গেছে হোটেলের ম্যানেজার সাইমন উইভার।

চোদ্দ

‘ধ্যাত, বাতি নষ্ট,’ ল্যান্ডিং-এর লাইটের সুইচ টিপে দিল এরিক খুট্ শব্দে। কিন্তু অন্ধকার দূর হলো না। জ্বলেনি আলো। ‘আমাদের ঘরের বাতিও জ্বলেনি। ঝড়ে বোধহয় তারটার ছিঁড়ে গেছে।’

‘ওহ্, গড,’ গুঙিয়ে উঠল কিম।

‘বেডরুমে একটা টর্চ আছে,’ অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগোল এরিক কিমকে নিয়ে। ‘আগে তোয়ালে দিয়ে ভালো করে শরীর মুছে নিয়ে শুকনো কাপড় গায়ে দাও।’ তারপর...তারপর কী করবে জানে না ও।

কিম পিছিয়ে গেল। ঘরে ঢুকতে ভয় লাগছে। যদি ভয়ংকর বাচ্চাটাকে বেডরুমে আবার দেখতে পায়! এটা একটা উদ্ভট চিন্তা, জানে কিম। কারণ বাচ্চাটা ভাঙাচোরা একটা পুতুল ছাড়া কিছুই ছিল না। দুমড়ে মুচড়ে উঠোনে পড়ে রয়েছে সিমন উইভারের লাশের পাশে। কিন্তু যে জায়গায় মৃতদের মৃত্যু নেই সেখানে অসম্ভব ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

একটা টর্চ খুঁজে পেল ওরা। আলোতে কিমের বুকের দিকে তাকাতেই চমকে গেল এরিক। ‘ক্রাইস্ট!’ একটা স্তন স্পর্শ করল ও, কুঁকড়ে গেল কিম। ‘এটা কেমন করে হলো...?’

‘ওই...ওই পুতুলটা,’ বাচ্চা শব্দটি উচ্চারণ করার প্রবৃত্তি হলো না কিমের। ‘ওই দুঃস্বপ্ন আজীবন তাড়া করে ফিরবে আমাকে। এরিক, পুলিশে খবর দাও।’

‘সময় হলে দেব,’ বলল এরিক। ‘তবে প্রাসাদের ভ্যাম্পায়ার আর বিকট বাচ্চাদের কথা বললে ওরা বিশ্বাস করবে না। আমাদের বন্ধু মাচিন এসব কথা শুনলে কী মন্তব্য করবে বুঝতেই পারছ।’

‘ওরা হয়তো...ওরা হয়তো ভাববে তুমি উইভারকে খুন করেছ, এরিক।’ ওরা হয়তো দুজনের বিরুদ্ধেই খুনের অভিযোগ এনে জেলে পুরে দেবে।

‘এমনটি ঘটতেই পারে,’ এরিকের কণ্ঠে আগের মতো আর আত্মবিশ্বাস

নেই। 'তবে আশা করি আমাদের গোয়েন্দা বন্ধুটি এটাকে আরেকটি 'দুর্ঘটনা' বলে রিপোর্ট করবে।'

'আমরা এখন কী করব? আমার এখানে আর একমুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না।' উন্মাদিনীর মতো বলে উঠল কিম।

'কিন্তু এখান থেকে যাবারও উপায় নেই। চলো, বিষয়টি নিয়ে উরসুলার সাথে কথা বলি।'

উরসুলা ইলিংসওয়ার্থ ১৯ নম্বর রুমে উঠেছে। ওই ঘরে আগে থাকত রোজ শেলর এবং ডেভি। নক করতে দরজা খুলে দিল উরসুলা। বাইরে যাবার পোশাক পরনে। কুঁচকে আছে। বোঝা যায় এ পোশাক পরেই ঘুমিয়ে ছিল সে। মাথার চুল আলুথালু।

হাতের টর্চ দিয়ে ওদেরকে এক নজর দেখে নিল উরসুলা, তারপর ভেতরে ঢোকার ইংগিত দিল। 'তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম,' ফিসফিস করল সে। চেহারা বিধ্বস্ত, মলিন। 'তোমরা ঠিক আছ তো? কী হয়েছে বলো।'

কী হয়েছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল এরিক। ঘটনাটা শুনল উরসুলা মুখ শক্ত করে, সরু হয়ে থাকল চোখ। উত্তেজিত হয়ে পড়ল মহিলা, পাঁয়চারি করতে লাগল তবে গল্প শোনার সময় একটি প্রশ্নও করল না।

'আর পুরো ব্যাপারটিকে জটিল করে তুলতে ঝড়ের দাপটে বিদ্যুতও গেছে চলে,' উপসংহার টানল এরিক।

'ওরা বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে,' আপত্তির ভঙ্গিতে বলল উরসুলা। 'স্বার্থ হাসিল করতে ওরা ঝড় ডেকে এনেছে হয়তো তবে আমি নিশ্চিত বিদ্যুত লাইনে বিপর্যয় ঘটানোর জন্য ওরাই দায়ী।'

'আমাদের এখন করণীয় কী?' জিজ্ঞেস করল এরিক।

'এ মুহূর্তে করার কিছু নেই। কাল সকালে যে শয়তানটার খোঁজে আমরা বেরিয়ে পড়ব ওটা আমাদের সন্ধান পেয়ে গেছে। তুমি যা করার দরকার তা-ই করেছ। আমি নিজেও হয়তো এরচেয়ে ভালো কিছু করতে পারতাম না।'

'পুলিশে যদি খবর দিই...'

'পুলিশের কথা ভুলে যাও। ওরা উল্টো আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাবে। লাশটা অন্য কারও চোখে পড়ুক আমি চাই। তবে আমরা পুরোটা জায়গা আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজব। নাস্তা খেয়ে লেগে যাব কাজে। যে কোনো পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।' গলার স্বর নামাল সে। 'ওরা আজ রাতের মতো কিন্তু আমাদেরকে খুঁজবে।'

শিউরে উঠল কিম। এরিক বলল, 'এই উইভার ব্যাটাকে আমার বিপজ্জনক কিছু মনে হয়নি। মনে হয় না সমস্ত কিছুর জন্য সে-ই দায়ী। ক্যারোলিন চাডারটন, ভ্যালান্স এবং ছেলেটাকে হত্যা, কিমের ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া, ওর ওপর যৌন হামলা ইত্যাদি ঘটনাগুলো ও একা ঘটিয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ওকে তো ব্যবহার করা হয়েছে,' ধমকে উঠল উরসুলা। 'একদল নিরীহ মানুষ অজান্তেই শয়তানের এ রাজত্বে ঢুকে পড়েছে। আজ রাতে যা করেছে উইভার সে সম্পর্কে সে নিজেই সচেতন ছিল না, ও ছিল সাইকিক ফোর্সের ভিক্টিম। এরকম ঘটনা আমাদের যে কারও জীবনেই ঘটতে পারে। কাজেই সাবধান! আমি যদি ওদের পরবর্তী শিকারে পরিণত হই, তোমাদেরকে যা যা বলেছি সেভাবে আমার বিরুদ্ধে তোমরা ব্যবস্থা নেবে।' হাত ব্যাগ হাতড়ে রুপোর দুটো ক্রুস বের করল সে। 'এগুলো রাখো। প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।'

রুপোর ছোট ক্রুস দুটো হাতে নিয়ে আশ্চর্য এক স্বস্তি অনুভব করল কিম। গলায় যত্নে ঝুলিয়ে নিল চেইন। এরিক ঘড়ি দেখল। 'ভোর হতে আর আধঘণ্টা দেরি।'

'আমরা ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব,' বলল উরসুলা। 'এখন থেকে আমরা তিনজন একত্রে থাকব।'

বাইরে প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে হু হু গর্জনে বয়ে চলেছে বাতাস। কিছু একটা পতনের শব্দ শুনতে পেল ও দড়াম করে। কোনো আলগা পাথর-টাথর পড়ে গেছে হয়তো।

পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হারিকেন অ্যাঞ্জেল।

ডাইনিংরুম ভর্তি লোকজন, গল্প গুজবে মত্ত। এরিক অতিরিক্ত একটা চেয়ার নিয়ে এসেছে ওদের টেবিলে উরসুলার জন্য। ঘরটা অন্ধকার, কেমন থমথমে। বিদ্যুত আসেনি এখনও। লম্বা জানালাগুলোর কাচে ঝরছে বৃষ্টির ধারা, আঁধার করে রেখেছে। বারম্যান অ্যালেক্সকে দেখতে পেল ওরা। নতুন ভূমিকায় যেন মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে নিজকে।

'দুঃখিত, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া নাশতা ছাড়া কিছু দিতে পারব না,' ওদেরকে দেখে এগিয়ে এলো বারম্যান।

'বিদ্যুত নেই। খাবার গরম করার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের। আমাদের বেশিরভাগ মেহমান কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন। তবে স্টোভ আছে। কফি বানিয়ে দেয়া যাবে।'

'বেশ,' হাসল উরসুলা ইলিংসওয়ার্থ। 'তবে কফি না আমি বরং ফলের রস খাব। আবহাওয়ার খবরে কী বলল?'

'ভালো খবর নেই,' মুখটা যেন ভেংচাল বারম্যান। 'রেডিওতে বলছে আরও ভয়ংকর ঝড় আসছে। শুধু বিদ্যুতই চলে যায়নি রাস্তাঘাটও প্লাবিত হয়েছে। রাস্তায় উপড়ে পড়ে রয়েছে গাছপালা।'

'আমরা মানি আর না-ই মানি এখানে যে বন্দি হয়ে আছে সেটাই মোদ্দাকথা,' মন্তব্য করল এরিক।

'আমাদের হোটেলের কোনো ক্ষতি হবে না, স্যার। এ হোটেল যথেষ্ট মজবুত। আমরা অতিথিদেরকে বলেছি যেন প্রাসাদে না যায়। রাতের বেলা একটা ওয়ার টাওয়ার ভেঙে পড়েছে ঝড়ের দাপটে। আর...

'আচ্ছা?' এরিক আর্মস্টং-এর কলজে খামচে ধরল বরফশীতল আঙুল। আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর।

'ম্যানেজার, স্যার। মি. উইভার। ঈশ্বর জানেন গত রাতে তিনি কী করতে উঠোনে গিয়েছিরেন। টন টন পাথরের নিচে চাপা পড়েছেন ভদ্রলোক। ক্রেন ছাড়া লাশ বের করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাতেও সময় লাগবে। অ্যালেক্সের কণ্ঠে উত্তেজনা যেন উইভারের মৃত্যুতে খুশি হয়েছে। এমন সুখবর যেন শোনেনি অনেকদিন।

'তুমি পুলিশে খবর দিয়েছ তো?' ওকে বাজিয়ে দেখতে চাইল উরসুলা।

'না, ম্যাডাম। পুলিশে খবর দিতে পারিনি। ফোনও নষ্ট। বাইরের জগতের সাথে আমাদের সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এ ঝড় কবে থামবে তার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আপনাদের জন্য নাশতা নিয়ে আসি। তিনটে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট এবং ম্যাডামের জন্য ফলের রস...'

'যাক, বাবা বাঁচা গেল।' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এরিক। 'পুলিশ যখন এখানে আসবে, আমাদের বন্ধু মাচিন আরেকটি অ্যাক্সিডেন্টের কথা লিপিবদ্ধ করবে তার রেকর্ডে। বলবে প্রবল বাতাস উইভারের মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'বাতাস ওদের চিহ্ন মুছে ফেলবে,' বলল উরসুলা। 'আমাদের প্রাসাদের ভেতরে যেতে মানা করল। কিন্তু ওখানেই যেতে হবে। শুধু প্রার্থনা করি আমরা যেন টনকে টন পাথরের নিচে কবর না হয়ে যাই।'

লচসাইড হোটেলের সর্বশেষ অতিথিটির নাম মার্ক পেন্ডিফোর্ড। ঝড় শুরুর আগে সে হোটেলে এসেছে। বয়সে তরুণ মার্ক। ভীষণ সিগারেট খায়। চোখে ভারী কাচের চশমা, হালকা-পাতলা গড়ন। তার বাড়ি উডস ফার্ম

এস্টেটে। তার বাড়িতে ভূতের আছর রয়েছে। একটি নয়, অনেকগুলো ভূত। ভূত তাড়ানোর ওঝা এনেছিল মার্ক। কাজ হয়নি। গ্যাঁট হয়ে তার বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে ভূত।

মার্ক নিজেই কয়েকবার ভূত দেখেছে বাড়িতে। একবার মরা মাকে দেখল কিচেনের সিঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চাকরিতে প্রমোশন না হওয়ায় বকাবকি করছিল ছেলেকে। তবে সিঁড়ি গোড়ার ভূতটাকে দেখে সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিল মার্ক। কংকালের মতো চেহারা, গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা সাদা নাইট শার্ট গায়ে, এক হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল। ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল মার্কের দিকে। মার্ক ভূতটাকে শুধু দেখেইনি, তার পায়ের আওয়াজও শুনেছে।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় নেমে পড়ে মার্ক। জানতে পারে খামারবাড়িতে যে কৃষক বাস করত, রাতের বেলা চুরি করতে এসে চোর ওই লোককে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তারপর চাষা ভূত হয়ে যায়। তার অতৃপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায় ওই বাড়িতে।

তবে মার্কের স্ত্রী হেলেনের ভূত-টূতে বিশ্বাস নেই। কিন্তু ভূতের ভয়ে অস্থির স্বামীর সাথে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না বলে সে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যায় বাপের বাড়ি।

ঘুমের বড়ি খেয়েও রাতে ঘুম হয় না মার্কের। তাই সে বড়ি খাওয়া বাদ দিয়েছে। সে প্রায়ই ভূত দেখে। সবসময়ই যে অশরীরীরা স্বমূর্তিতে তার সামনে হাজির হয় তা নয়, হাঁটাহাঁটি করেও জানান দেয় তারা আছে। তাদের গা থেকে ভেসে আসা গন্ধ প্রমাণ করে বাড়িতে একা নেই মার্ক, সঙ্গী কেউ রয়েছে। দিন-রাত বাড়িতেই বন্দি অবস্থায় থাকত মার্ক, পালিয়ে যাওয়ার উপায়ও নেই। তার গাড়ি নেই। সে রাতে সমস্ত বাতি জ্বালিয়ে রাখে। ফলে মাস শেষে বিরাট অংকের বিদ্যুত বিল আসছিল। হুক থেকে ফোন খুলে রেখেছে মার্ক আগেই। কারণ ফোন বাজলেও অপরপ্রান্তে কেউ কথা বলে না, শুধু বোঝা যায় কেউ ধরে আছে ফোন এবং তার উপস্থিতি বেশ প্রবলভাবেই অনুভূত হয় মার্কের কাছে।

বাড়িটি বিক্রি করতে মনস্থ করল মার্ক। লোকসান দিয়ে হলেও বেচে দেবে। কিন্তু ভুতুড়ে বাড়ি কেনার মতো আগ্রহী গ্রাহক পাওয়া গেল না। নিজের বাড়িটি জেলখানা মনে হচ্ছিল মার্কের। আত্মহননের ইচ্ছে জেগেছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। আত্মহত্যা তার দ্বারা অন্তত সম্ভব নয়, শেষে মেনে নিয়েছে মার্ক। শুধু প্রার্থনা করল বিছানাতেই যেন তার

মৃত্যু হয় এবং সেটা যেন হয় স্বাভাবিক মৃত্যু এবং খুব তাড়াতাড়ি ঘটে।

এমন সময় একদিন ইভনিং এক্সপ্রেস কাগজে লচসাইড হোটেলের বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ল মার্কের। 'আসুন, ভয় কাকে বলে তার স্বাদ নিয়ে যান। এমন ভয় জীবনেও পাবেন না।' বিজ্ঞাপনটিতে একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটি সরিয়ে রেখেছিল মার্ক। আবার টেনে নিল হাতে। একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, সিদ্ধান্ত নিল সে। লচসাইড হোটেলের ভূতগুলো কৃত্রিম। ওগুলো দেখে প্রথমে হয়তো ভয় পেয়ে যাবে মার্ক, তবে পরে সয়ে গেলে পুরো ব্যাপারটাই মনে হবে মস্ত ঠাট্টা এবং ভয়টাও চলে যাবে। মার্ক আর ভূত দেখে ভয় পাবে না। সত্যি কি এরকম কিছু ঘটবে? এটা হয়তো ওর ভয় দূর করতে থেরাপির কাজ দেবে। অন্তত মানুষজনের সান্নিধ্য তো পাবে, সেটাই বা কম কীসে? সুড়ঙ্গের শেষে সবসময় আলোর রেখার দেখা পাওয়া যায়। এখন শুধু দরকার ফোন তুলে বুকিং-এর কথা বলার সাহস সঞ্চয় করা।

ট্রেন এবং বাসে চোদ্দ ঘণ্টার জার্নি, শেষের কুড়ি মাইল প্রবল বৃষ্টি আর হাওয়ার মাতম ঠেলে চলল গাড়ি। তবে অবশেষে লচসাইড হোটেলে পৌঁছুতে পারল মার্ক পেন্ডিফোর্ড।

ডাইনিংরুমে ঢুকল সে। সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল তার দিকে, কানে ভেসে এলো লোকের ফিসফিসানি। 'ওই লোকটা নাকি ভূত দেখেছে। সত্যিকারের ভূত!' অল্প খাবার খেল মার্ক। ঘুমের ট্যাবলেট ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল। ওর ধারণা এখন থেকে জীবন অন্যরকম গতিধারায় প্রবাহিত হবে।

খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ঢুকল মার্ক। বার-এ গেল না। মদ তাকে টানে না। বহুদিন ধরে মদ পান বাদ দিয়েছে মার্ক ডাক্তারের নির্দেশে। এতদূর আসা এবং থাকার খরচ দিয়ে ওর পকেট প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। শুধু বাড়ি ফেরার রিটার্ন টিকেটটা আছে।

ঝড়টা ভীত করে তুলেছে মার্ক পেন্ডিফোর্ডকে। বারবার জানালার পর্দা টেনে উঁকি দিচ্ছে বাইরে, বৃষ্টি স্নাত জানালায় নিজের চেহারার বিকৃত প্রতিচ্ছবি ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ল না। আলো জ্বেলে ঘুমাবার সিদ্ধান্ত নিল মার্ক।

আশ্চর্য ব্যাপার, চমৎকার একটা ঘুম হলো মার্কের, দিনের আলো ফুটবার পরে ভাঙল ঘুম। লক্ষ করল না ওর মাথার ওপরের আলোটা আর জ্বলছে না। চুপচাপ শুয়ে রইল মার্ক, ভাবনাগুলোর ডালপালা মেলে ছড়িয়ে

দেয়ার সুযোগ দিল। বাইরে এখনও হুংকার ছাড়ছে বাতাস। তবে দিনের বেলা বলে ভয় লাগছে না ওর। সে আজ সারাটা দিন ঘুরে দেখবে প্রাসাদ। ওদের যত হরর শো আছে, বুকে সাহস নিয়ে উপভোগ করবে। ওগুলো তো আসলে নকল জিনিস। ওগুলোকে ভয় পাবার কিছু নেই।

বিছানা থেকে নামল মার্ক। পোশাক পরছে। আশপাশটা কেমন গুমোট লাগছে, চেপে আসছে যেন চারদিক থেকে। একটা ট্যাবলেট গিলতে মন চাইল। পরক্ষণে শাসাল নিজেকে। না, সারা হপ্তা সে ট্যাবলেট ছুঁয়েও দেখবে না। টয়লেটে সমস্ত ট্যাবলেট ফেলে দেবে মার্ক। ডাক্তারকে বলবে, দেখেছেন ডাক্তার, বড়ি না খেয়েও থাকতে পারি আমি।

বিদ্যুত নেই। মার্ক ব্যাপারটা টের পেল নাশতা খাওয়ার সময়। সে এক বাটি কর্ন ফ্লেক্স নিয়ে বসেছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিলছে খাবারটা। লোকজন কথা বলছে ফিসফিস করে। ব্যাপারটা কেমন অস্বস্তিকর, গা ছমছমে।

ওয়েটার অতিথিদেরকে প্রাসাদে যেতে মানা করল। বলল প্রাসাদের কোন্ একটা অংশ নাকি ধসে পড়েছে। মার্ক সিদ্ধান্ত নিল তবু সে প্রাসাদে যাবে। সাথে টর্চ নেবে। যদি সত্যি বিপজ্জনক কোনো ব্যাপার থাকত, বন্ধ করে দেয়া হতো প্রাসাদ। পুরোটাই আসলে ভাওতাবাজি।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চারপাশে চোখ বুলাল মার্ক। নানান বয়সের মানুষজন। কেউ তরুণ, কেউবা বুড়ো। মার্কের বিপরীত দিকের টেবিল দখল করেছে তিনজন মানুষ তরুণ এক দম্পতি, সাথে এক পৌঢ়া মহিলা। সম্ভবত ওদের মা।

অতিথিদের কয়েকজন টেবিল ছাড়ল। মার্কও উঠে পড়ল। চলে এলো ফয়ারে, লোকজনের ভিড়ে। মানুষজনের সাথে থাকলে আর কোনো ভয় নেই, মনে মনে বলল মার্ক। সবাই যেন একটা করে দল তৈরি করে নিয়েছে। দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করছে, কথা বলছে নিচু স্বরে, প্রাসাদে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে কিনা এটাই তাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রাসাদে যাবার সাইনবোর্ডে চোখ পড়ল মার্ক পেন্ডিফোর্ডের। ওর ধারণা, কেউ না কেউ প্রাসাদে যাবেই। সে ওই লোকের পেছন পেছন যাবে।

পৌঢ়া ও সেই তরুণ দম্পতি সবার আগে পা বাড়াল প্রাসাদ অভিমুখে। দৃঢ় পদক্ষেপে চলেছে মহিলা। যেন নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্ষুদ্র দলটির। তরুণ দম্পতির ইচ্ছে হোক বা না হোক, তারা যেন যেতে বাধ্য ওই মহিলার সাথে। ভদ্রসূচক দূরত্ব রেখে ওদের পিছু নিল মার্ক।

হোটেলের বাইরে পা রাখতেই সগর্জনে গায়ে আছড়ে পড়ল ঝড়ো বাতাস। সেই সাথে চোখ অন্ধ করে দেয়া প্রবল বৃষ্টি। বাতাস এবং বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা পেতে পাথুরে একটা দেয়ালে আড়াল নিল মার্ক। উঠোনে হাজার হাজার নুড়ি আর আবর্জনা। ব্যাটলমেন্টের ওপরে তৈরি হওয়া একটা ফাটল বা গর্ত দিয়ে উড়ে আসছে ওগুলো। মার্কের মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। কেউ যদি ওর মধ্যে পড়ে যায়...

ওরা তিনজন কী করে তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছে মার্ক। ওরা প্রাসাদের পাতাল ঘরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। কাজেই ওদের পিছু পিছু এগোল মার্ক। ওদের আরেকটু কাছে গেলেও ক্ষতি নেই, লক্ষ করবে না ওরা, মনে মনে বলল মার্ক। আর লক্ষ করলেও কিছু মনে করবে না। হঠাৎ হোটেলে ফিরে যেতে ইচ্ছে করল মার্কের। হোটেল নিরাপদ এবং আরামদায়ক। পরক্ষণে চিন্তাটা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিল মাথা থেকে। সে যদি এখন ফিরে যায়, পুরো ব্যাপারটাই খেলো হয়ে যাবে। আবার ঘুমের ওষুধে ফিরে যেতে হবে মার্ককে।

পাতালঘর অন্ধকার, নিস্প্রাণ একটা জায়গা, না, নিস্প্রাণ নয়, জ্যান্ত, মনে মনে বলল মার্ক। গতি দ্রুত হলো তার, ওদের তিনজনের কাছাকাছি চলে এলো। এই শীতল, স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধযুক্ত জায়গায় কার যেন উপস্থিতি টের পাচ্ছে মার্ক। কবর থেকে উঠে এসে হিম ঠাণ্ডা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করছে শরীর। নিজের টর্চটা জ্বালানোর প্রয়োজন হলো না মার্কের, অন্যরা আগেই জ্বালিয়ে নিয়েছে। পাতাল ঘরের প্রতিটি কানাকঞ্চি দেখছে আলো ফেলে।

আলোয় প্রতিফলিত হতে লাগল কৃত্রিম, ভয়ংকর সব চেহারা। একজনের পায়ের নিচে ক্যাপশন লেখা–টর্চারার। সে হাতে কী যেন একটা জিনিস ধরে রেখেছে। জিনিসটা কী দেখার জন্য তাকাল না মার্ক। তবে টর্চারার ওকে ভীত করে তুলতে পারেনি। ও ভয় পাচ্ছে যাকে এখনও দেখতে পায়নি, কিন্তু উপস্থিতি টের পাচ্ছে, তাকে। ও নিশ্চিত হয়ে গেছে এখানে কেউ আছে।

ভয় গ্রাস করেছে মার্ককে। এখনও সময় আছে, ফিরে যাও, মনে মনে নিজেকে বলল মার্ক। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে পেছন ফিরে তাকাল ও। শুধুই অন্ধকার। দুর্ভেদ্য আঁধার যেন জ্যান্ত, নিশ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে। ফিরে যেতে ভয় লাগছে ওর। কাজেই এদের সাথে লেগে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ওরা কিছু একটা খুঁজছে। কিন্তু কী খুঁজছে বুঝতে পারছে না মার্ক। আশপাশের ভয়াল মূর্তিগুলো নিয়ে ওদের যেন কোনো মাথাব্যথা নেই। গলা নামিয়ে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। ডানে-বামে মাথা নাড়ছে। বামে মোড় নিল দলটা, প্যাসেজটা সরু, ছাদ ঢালু, ফলে মাথা নিচু করে চলছে হচ্ছে।

এবার মার্ক পেন্ডিফোর্ড অনুভব করতে পারছে ওটাকে। আগের চেয়েও প্রবল যেন উপস্থিতি। ওটা যাই হোক, চলে এসেছে খুব কাছে। গা গোলানো একটা গন্ধ ধাক্কা মারছে নাকে, ওটার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ক্রুদ্ধ অশুভ, ইতর কিছু একটা ফুঁসছে।

মার্ক জানে সামনের মহিলাও ব্যাপারটা টের পেয়েছে। থেমে গেল পৌঢ়া, চারপাশে টর্চের আলো ফেলল। আলোকরশ্মিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল মার্কের। চিৎকার দিতে চাইল ও, কিন্তু স্বর ফুটল না গলায়, শুধু ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। পালাও গর্দভের দল জলদি ভাগো! তোমরা বুঝতে পারছ না কী আসছে।

ভয়ে-আতংকে নিশ্চল মার্ক নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ওদের টর্চের আলো দেখছে শুধু। ওদের সবার গলায় ক্রুস ঝুলছে। ক্রুসগুলো হাতে উঁচিয়ে ধরে রেখেছে। মহিলা মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে কী যেন বলছে। মার্ক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে বুঝতে পারত কী বলছে। কিন্তু ভয়ে অসাড় মস্তিষ্কে কিছু ঢুকছে না। ভাগ, গাধার দল, শিগগির ভাগ।

ওরা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো সাদা আলোর মাঝখানে ছায়াগুলো যেন পাক খাচ্ছে। অন্ধকারের চেয়েও কালো, আকার আকৃতিহীন কতগুলো ছায়া। এমন সময় ওটাকে দেখতে পেল মার্ক পেন্ডিফোর্ড।

ভীষণ লম্বা সে, প্রায় ছাদ ছুঁয়েছে মাথা। মুখটা ধীরে ধীরে একটা আকার নিচ্ছে, ফ্যাকাসে সাদা একটা প্রত্যঙ্গ, মাথায় কোনো চুল নেই, মাথার নিচে ধড়টা অদৃশ্য, শুধু ঘাড়ের পেশী দেখা যাচ্ছে, যেন কাঁধ থেকে টান মেরে ছিঁড়ে আনা হয়েছে মাথাটা। ওটার কোটরের ভেতরে চোখের বালাই নেই। তবু শূন্য গহ্বর জোড়া যেন সব দেখতে পাচ্ছে। নাকটা বাঁকা এবং ভাঙা, ঠোঁট বলতে কিছু নেই। মুখটা তীব্র ক্রোধ এবং রাগের ভঙ্গিতে বেঁকে রয়েছে। ওটা নড়ছে, দুলছে, ভয় দেখাচ্ছে।

তিনজনের দলটা ওটাকে যে দেখতে পায়নি তা বেশ বুঝতে পারছে মার্ক। তবে ওটার উপস্থিতি টের পেয়েছে বলেই হাতের ক্রুসগুলো মুঠোয় চেপে রেখেছে। ভৌতিক অবয়বটার গাল জোড়া বেলুনের মতো ফুলছে,

মাথাটাও খুলে চলেছে। ওটা যেন এখুনি বার্স্ট করবে। ওটা হামলা চালাতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শরীর কুঁকড়ে গেল মার্কের, আকুতি করল ওকে যেন ছেড়ে দেয়, ওদের ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু চক্ষুহীন কোটর জোড়া শুধু মার্কের দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

শুধু তুমিই আমাকে দেখতে পাচ্ছ, যেন বলছে ওটা।

ওটা ক্রমে আবছা হতে লাগল, রোদে উবে যেতে থাকা কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে; আকার-আকৃতিহীন, গলে যাচ্ছে আঁধারে, তার আস্তানায় ঢুকছে। মার্ক পেন্ডিফোর্ডের গলায় অবশেষে রা ফুটল।

'ওহ্ মাই গড!' তার কর্কশ, ভয়ার্ত ফিসফিসে কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। 'আপনারা ওটাকে দেখতে পাননি? আপনারা অন্ধ নাকি?'

উরসুলা ইলিংসওয়ার্থ ছুটে এলো মার্কের কাছে। শক্ত আঙুলে চেপে ধরল বাহু। মার্কের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো সে। 'কী দেখব?'

'ওটা...ওটা...' তোতলাচ্ছে মার্ক, থরথর কাঁপুনি উঠে গেছে শরীরের প্রতিটি পেশীতে। 'আমাকে ছাড়ুন। এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে...ওটা ফিরে আসার আগেই।'

'বলুন?' উরসুলা হাত তুলল যেন মারবে মার্ককে। 'কী দেখেছেন বলুন। জলদি!'

'ওখানে ছিল ওটা,' তাকাল মার্ক কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ধূসর কুয়াশার ফালি অদৃশ্য। 'একটা মুখ। ওহ্, গড, কী ভয়ংকর মুখ...যেন ঘাড় থেকে লাশের মাথা ছিঁড়ে আনা হয়েছে...চোখ নেই কিন্তু তবু ওটা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। জেসাস, ওটার গায়ের গন্ধ পাননি?

'গন্ধ পেয়েছি,' নরম গলায় জবাব দিল উরসুলা। 'তবে গন্ধটা ক্রমে উবে আসছে। এখন নেই!' টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল সে।

'যখন ওটার উপস্থিতি টের পেলাম ঠিক সে মুহূর্তে ওটা চলে গেল।'

'না, ওটা এখনও আছে...'

'থাকলে জানতে পারতাম,' মার্কের হাত ছেড়ে দিল মহিলা। 'তবে খুব ভালো করেই জানি ওটা এখন নেই। শুনুন, আপনার সাথে কথা বলা খুব দরকার। দিনের আলোয় কোথাও। বুঝতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'আপনি কে?'

'এ জায়গাটাকে যে শয়তান কলুষিত করছে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে এখানে এসেছি। এজন্যই ওটা আমাকে তার চেহারা দেখায়নি। ভূত-

প্রেতের চেহারা দেখার মতো সাইকিক ক্ষমতা আমার বন্ধুদের নেই বলে ওরা ওটাকে দেখতে পায়নি। ওটা যে আছে তা আপনি প্রমাণ করে দেখাবেন।'

'না, আমি কিছু প্রমাণ করতে পারব না। আমি চলে যাচ্ছি।'

'যেতে পারবেন না,' ধমকের সুরে বলল উরসুলা, যেন শিক্ষয়িত্রী শাসাচ্ছে তার ছাত্রকে। 'রাস্তা ডুবে গেছে পানিতে, গাছপালা উপড়ে পড়ে চলাচলের অযোগ্য করে রেখেছে পথঘাট। বিদ্যুত নেই। টেলিফোনের লাইন কাটা। কাজেই এখান থেকে কেউ বেরুতে পারছে না। আমার কথা বুঝতে পারছেন?'

মাথা দোলাল মার্ক।

'বেশ। এখন চলুন দোতলায় যাই। কথা বলার জন্য আমার হোটেল রুমটাই উৎকৃষ্ট স্থান।'

সাদা হয়ে আছে মার্কের চেহারা, কাঁপছে সে। দুঃখ লাগছে তরুণ দম্পতির জন্য ওরা এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে বলে। তবে পৌঢ়া মহিলাকে তার অন্যরকম মনে হচ্ছে। বেশ আত্মবিশ্বাসী।

'তোমরা এসেছ বলে আমি খুশি,' একটা সিগারেট ধরাল উরসুলা। 'তোমাদের প্রতি আমি কতটা কৃতজ্ঞ বলে বোঝাতে পারব না। পিশাচটাকে আমরা দেখতে পাইনি। চলে গেছে ওটা। তবে এখন জানি কীসের বিরুদ্ধে লড়াই করছি আমরা।'

'জানি কি?' এই প্রথম কথা বলল এরিক আর্মস্ট্রং। বিছানার কিনারে বসেছে সে, কিমকে জড়িয়ে ধরেছে এক হাতে। ভাগ্যিস, পিশাচটাকে দেখতে পায়নি ও, ভাবল এরিক।

'তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আমাদের বন্ধুটি যে মাথাটাকে দেখেছে, কোনো মানুষ বোধহয় এই প্রথম শয়তান ভূস্বামীর আসল চেহারায় দেখতে পেল। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে, কৃষক এবং খামারের মালিকরা ভূস্বামীকে হত্যার আগে জ্বলন্ত শিক ঢুকিয়ে পুড়িয়ে দেয় চোখ। তারপর তাকে ছুরি মারে। রক্তক্ষরণে সে যখন মৃতপ্রায়, ছোরা দিয়ে তার মাথা কেটে ফেলা হয়। কুখ্যাত ভূস্বামী আবার হাজির হয়েছে তার কাটা মুণ্ডু নিয়ে। তবে আমি পিশাচটাকে দেখতে পাইনি বলে আফসোস হচ্ছে। হয়তো প্রকৃত শত্রুদের কাছ থেকে সে অদৃশ্য থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছে। ঠিক জানি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি খুব ধূর্ত একজনের বিরুদ্ধে লেগেছি আমরা। একে ধ্বংস করা সহজ নয়। আর কাজটা আমার একার পক্ষে করা সম্ভবও

হবে না। ওকে দেখার জন্য চোখ লাগবে আমার। কাউকে দেখিয়ে দিতে হবে ওর উপস্থিতি।'

'আমি আর ওদিকে পা মাড়াচ্ছি না,' দেয়ালের মধ্যে যেন সেঁধিয়ে যেতে চাইল মার্ক পেন্ডিফোর্ড। তাকাল দরজার দিকে। 'লক্ষ টাকা দিলেও না।'

'তোমাকে ওখানে যেতে হবে না,' 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে নেমে এলো উরসুলা। 'বিনাহির ভূস্বামী মাটির নিচে তার আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। সে জানে আমি এখানে। সে আমার শক্তিকে সমীহ করে, না করলে এতক্ষণে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কাজেই তাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। প্রাসাদ কিংবা হোটেল যে কোনো জায়গায় সে লুকিয়ে থাকতে পারে।'

'এখানে?' বিছানার চাদর মুচড়ে ধরল মার্ক পেন্ডিফোর্ড। নার্ভাস ভঙ্গিতে মোচড়াতে লাগল। হাত কাঁপছে। 'সে নিশ্চয় হোটেলে ঢুকবে না। ঢুকবে কি?'

'সে যেখানে খুশি যেতে পারে। একটা সময় তো এ সমস্ত জায়গা-জমির মালিক সে-ই ছিল। শুধু পুরানো জায়গাগুলোতে সে হামলা করবে, এরকম ভাবা ভুল।' বিরতি দিল উরসুলা। বাইরে বাতাসের দাপাদাপি আরও বেড়েছে। কাচের শার্সিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে হুহুংকারে।

'তুমি ওকে দেখলেই চিনতে পারবে,' মার্ককে উদ্দেশ্য করে বলল উরসুলা। সিধে হলো। 'দেরী করার সময় নেই। চলো সবাই। গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব। যত সময় যাচ্ছে, আমাদের শত্রুর শক্তি ততই বেড়ে চলেছে। এই ঝড়টা তার শক্তি জোগাচ্ছে, এটা তার রক্তের মতো, তাকে পুনরুজ্জীবিত করছে। তার প্রভু একবার এ ঝড় পাঠিয়েছিল প্রাসাদ ধ্বংস করার জন্য এখন পাঠিয়েছে তাকে শক্তি জোগাতে, তাকে আশ্বাস দিতে। তবে আমাদের সবার জন্য এ হলো কেয়ামতের আলামত!'

পনেরো

গত বসন্তে উদ্বোধনীর পর থেকে লচসাইড হোটেলের রিসেপশনিস্টের দায়িত্ব পালন করে আসছে মেরী অ্যান্ড্রুজ। তার ম্লান ত্বকে লম্বা কালো চুল মানিয়ে গেছে। মেরীর মা দুশ্চিন্তা করতেন মেয়ে বুঝি রক্তশূন্যতায় ভুগছে। তবে ডাক্তার দেখানোর পরে মায়ের ভয় দূর হয়েছে। মেয়ে অ্যানিমিয়ার রোগী নয়। বিপরীত লিঙ্গের চোখে মেরী যথেষ্ট আকর্ষণীয়া তবে তার সহজাত লজ্জা এবং রসিকতা করার অভাব তার ভেতরে এক ধরনের উদাসীনতা এনে দিয়েছে। তাকে দেখলে মনে হয় সে কাউকে পাত্তা দেয় না। মেরী বই পড়তে খুব ভালোবাসে। সারাক্ষণই দেখা যায় বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে।

হোটেলের চাকরিটার সাথে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে মেরী। ট্যুরিস্ট সিজনে টেলিফোনে ব্যস্ততা এবং বোর্ডারদের নানান প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময়টুকু বাদে বই পড়ার প্রচুর সময় পায় সে। হোটেল ম্যানেজার মি. উইভার কখনও লক্ষ করেনি যে মেরী তার কাজের বেশিরভাগ সময় নাক ডুবিয়ে রাখে পেপারব্যাক নভেলে। মেরী রোমান্টিক বই পড়তে পছন্দ করে। তার বয়স সাতাশ। সে এখনও মিলস অ্যান্ড বুন বইয়ের মতো একজন নায়ক খুঁজছে প্রেমে পড়ার জন্য। যদিও এ ব্যাপারে খুব একটা তাড়া নেই মেরীর। সে এখনও বাবা মা'র সাথেই থাকে। বাবা মা বাস করেন বিনাহি গাঁয়ে। সেখান থেকে প্রতিদিন গাড়ি চালিয়ে লচসাইড হোটেলে আসে মেরী।

গত রাতে সিমন উইভারের মৃত্যুর খবর মেরীর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। খবরটা অ্যালেক্সের কাছ থেকে শোনার পরে মেরী আজ সকালে উপন্যাসে একটুও মনোযোগ দিতে পারেনি। এক হপ্তায় চারটা মৃত্যু এবং বিরামহীন হারিকেন ঝড়—বিষয় দুটি নিয়ে ভাবলেই শিউরে ওঠে গা।

মেরী তার কাস্টোমারি ডেস্কে বসে আছে, দেখছে নাশতা সেরে ডাইনিংরুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অতিথিরা। চশমা পরা ওই লোকটাকে কেমন অদ্ভুত লাগে মেরীর। লোকটা অস্থিরভাবে গা মোচড়ামুচড়ি করছে

যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্য। রেজিস্টার খাতা খুলল মেরী। লোকটা শুধু নিজের জন্য ঘর ভাড়া করেছে। অবশ্য ওই লোক কী করল না করল তাতে কিছু আসে যায় না মেরীর।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ফিরে এলো প্রাসাদ থেকে। অস্থির এবং উত্তেজিত। তার সাথে হানিমুন করতে আসা সেই নবদম্পতি এবং প্রৌঢ়া মহিলাটি। ওদের প্রত্যেকের চেহারায় কেমন একটা ভয়ের ছাপ। প্রাসাদের অংশ বিশেষ ধসে পড়ার দৃশ্য দেখে বোধহয় ভয় পেয়েছে, অনুমান করল মেরী। অথচ অ্যালেক্স পইপই করে বলে দিয়েছে প্রাসাদে যাওয়া যাবে না।

হাই তুলল মেরী। আজকের দিনটা খুব দীর্ঘ হবে। তাকে আরেকটা অস্বস্তিকর রাত কাটাতে হবে এ হোটেলে ইমার্জেন্সির জন্য বরাদ্দ অতিরিক্ত একটি বেডরুমে।

এখন সন্ধ্যা। আর এক ঘণ্টা বাদে মেরীর ডিউটি শেষ। অলস চোখে দেখছে হোটেলের বাসিন্দারা ডাইনিংরুমে ঢুকছে ডিনার খেতে। চশমাঅলাটা নবদম্পতি আর ওই পৌঢ়ার সাথে জোঁকের মতো সেঁটে রয়েছে। সাড়ে আটটা বাজলেই আমি বিছানায় শুয়ে পড়ব হাতে একটা বই নিয়ে, ভাবছে মেরী। তবে পড়ায় মন দিতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। হোটেলের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে মন। একটা বলপয়েন্ট দিয়ে টেলিফোন প্যাডে আঁকিবুকি কাটতে লাগল মেরী।

এখানে খামোকাই একটা রাত কাটাতে হবে ওকে। এ জন্য মেরীকে কোনো ওভারটাইম দেয়া হবে না। বরং বেতন থেকে ঘর ভাড়ার টাকা কেটে রাখা হবে। মেরী প্রার্থনা করল কালকের মধ্যে যেন ঝড়বৃষ্টি কমে যায়। রেডিও অবশ্য নিয়মিত ঘোষণায় সাবধান করে দিচ্ছিল স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরা যেন ভুলেও এ ঝড়ের মধ্যে বাইরে না যায়। খুব প্রয়োজন ছাড়া আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ করা হয়েছে। গুঙিয়ে উঠল মেরী। তার মানে কাল রাতটাও ওকে এখানেই থাকতে হবে।

উইভার মারা গেছে। এখন দায়িত্ব নেবে অ্যালেক্স। মেরী মনে মনে পছন্দই করে এই বারম্যানকে। দু'একবার গোপনে ইশারা ইংগিতও করেছে অ্যালেক্সকে লক্ষ করে। কিন্তু তার ইশারা বারম্যান বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। কোনো সাড়া আসেনি ও তরফ থেকে। আজ রাতে হয়তো ওর দরজায় টুকটুক শব্দে টোকা দেবে অ্যালেক্স, কল্পনার ডানা মেলল মেরী। 'আমি ভেতরে আসতে পারি, বালিকা?' বলবে অ্যালেক্স। অ্যালেক্স সবসময় মেরীকে 'বালিকা' বলে সম্বোধন করে। মেরী তখন বলবে অবশ্যই তুমি

ভেতরে আসতে পারো, অ্যালেক্স। আজ রাতটা তুমি আমার সাথে থাকবে। তুমি যা খুশি আমাকে নিয়ে করতে পার, বাধা দেব না। কল্পনা করতে গিয়ে এই দ্যাখো কেমন শিরশির করছে মেরীর শরীর...

'গুড ইভনিং।'

স্বপ্নের সুতোটা ছিড়ে গেল, প্রায় লাফিয়ে উঠল মেরী। আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছিটকে গেল বল পয়েন্ট, ফ্লোরে পড়ে বার কয়েক ঠকাঠক নাচল। তারপর গড়িয়ে স্থির হলো। অ্যালেক্সের স্বপ্নের জগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল মেরীর। তারপর সামনে দাঁড়ানো গোলগাল চেহারার মোটাসোটা লোকটার দিকে তাকাল। লোকটার জামার কলার এমন শক্তভাবে এঁটে রয়েছে ঘাড়ে, ফুলে উঠেছে মাংসের দলা। মাথার চুল পাতলা, পলকহীন ধূসর চোখ, কাঠের পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ হাসি ঠোঁটে। তার কালো রঙের ওভারকোটের বোতাম আটকানো যদিও কোট ফেটে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে বিশাল ভুড়ি। গোলাপি হাতে ধরে রেখেছে কালো রঙের হোমবুর্গ হ্যাট।

জবাবে কিছু বলল না মেরী। সে খুব কম কথায় কাজ সেরে নেয়ার দক্ষতাটি অর্জন করেছে। পাদ্রীর পোশাক পরা লোকটাকে তার চেনা চেনা লাগছে। একে সে বিনাহি গাঁয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকবার দেখেছে। এ নিশ্চয় সেই পাদ্রী। ধর্মের বুলি কপচাতে এসেছে। তবে মেরী গির্জায় যায় না বললেই চলে। যদিও এ লোককে সে যে গাঁয়ে দেখেছে এখন তার পরিষ্কার মনে পড়ছে।

'আমি রেভারেন্ড পসন,' মৃদু গলায় নিজের পরিচয় দিল লোকটা। কথা বলার সময় অতি সামান্য তোতলাল।

'আমি দুঃখিত। আমাদের সবগুলো ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।'

এ কথা শুনলেই লোকটা হয়তো কেটে পড়বে, ভাবছে মেরী।

'আমি কিন্তু এখানে থাকার জন্য আসিনি,' পাদ্রীর হাসিটা একবারও ম্লান হলো না, তবে অন্তর্ভেদী চোখে শুধু ফুটল বিরক্তি। 'ওরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে একটা কাজ করতে। বাইরের অবস্থা তো দেখছেনই। আমাকে লাউঞ্জে একটা ডিভান পেতে দিলেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারব। আমি আপনাদের ম্যানেজার মি. উইভারের সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'আ-ইয়ে আমাদের ম্যানেজার সাহেব...' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল মেরী। 'ওনাকে এখন পাওয়া যাবে না।'

'অঃ।' মুখ থেকে মুছে গেল হাসি, বেঁকে গেল ঠোঁট। 'খুবই দুঃখের

কথা। উনি আমাকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছিলেন আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে যেন এখানে হাজির হয়ে যাই। গতকাল সকালে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন।'

'উনি আসলে...' সত্য কথাটা বলতেই হবে, লুকিয়ে রাখার কোনো উপায় নেই। 'উনি মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন!' পাদ্রীর গোলাপি মুখখানা শোকে এবং দুঃখে বিকৃত হয়ে গেল, কারও মৃত্যুসংবাদ শুনলে এ লোক নিশ্চয় সবসময় এভাবেই অভিনয় করে, ভাবল মেরী। 'ওহ মাই গুডনেস। নিশ্চয় ওটা আরেকটা কোনো দুর্ঘটনা ছিল না?'

'তাঁর মাথায় কয়েক মন পাথর পড়ে যায়,' জবাব দিল রিসেপশনিস্ট। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেল না। এটা তার কাজ নয়, অ্যালেক্সের কাজ।

'কী ভয়ংকর। শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত, ইয়াং লেডি।'

'এ ব্যাপারে কিছু জানতে হলে অ্যালেক্সের সাথে কথা বলুন, স্যার। সে এখন চার্জে রয়েছে।'

রেভারেন্ড পসন কিছুক্ষণ ভাবল। কী করবে বোধহয় চিন্তা করল। তারপর বলল, 'তার সাথে দেখা করার দরকার নেই। আমাকে কী করতে হবে জানি। আপনার কাছে কি প্রাসাদের নকশা আছে?'

'ব্রুশিয়ারে আছে,' কাঠের ডিসপ্লে হোল্ডারে সাজানো চকচকে লিফলেটের গাদার দিকে ইংগিত করল মেরী।

'ও, আচ্ছা।' একটা লিফলেট তুলে নিল পাদ্রী। খুলে চোখ বুলাতে লাগল। 'সবকিছু পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা আছে। আপনি নিশ্চয় ভাবছেন আমি কেন এখানে এসেছি।'

তা-ই ভাবছিল মেরী তবে কণ্ঠে কৌতূহল ফুটতে দিল না। লোকটা নিজের থেকে বলতে চাইলে বলুক। ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে মেরী। রেভারেন্ড বুক ভরে দম নিল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। সম্ভবত বক্তব্যগুলো গুছিয়ে নিল।

'আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে ভূত তাড়ানোর জন্য,' পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি কাঠামো নিয়ে শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়াল রেভারেন্ড পসন। কণ্ঠে ফুটল গর্ব। 'এ জায়গাটা ভুতুড়ে, জানেন নিশ্চয়।'

'শুনেছি আমি।'

'এখানে ভূত আছে,' মেরীর ভাবলেশশূন্য চেহারা অবাক করে তুলেছে রেভারেন্ডকে। 'তবে শক্ত ওঝার পাল্লায় পড়লে ভূতের বাপ বাপবাপ করে

পালাবে। আচ্ছা যে ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে সে আর তার মা কত নাম্বার রুমে ছিল?'

'১৯ নাম্বার রুমে। কিন্তু ঘরটা আবার ভাড়া হয়ে গেছে।'

'তবু ঘরটা আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে,' বলল পাদ্রী পসন। 'আপনার কাছে ওই ঘরের চাবি আছে নিশ্চয়?'

'ঘরের বাসিন্দার কাছে চাবি আছে। স্টাফ ছাড়া অন্য কারও কাছে ডুপ্লিকেট চাবি দেয়ার নিয়ম নেই।'

'আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমি ওই ঘরের কোনো কিছু স্পর্শ করব না। শুধু একটু ভেতরে যাব।'

'কিন্তু তবু আপনাকে চাবি দিতে পারব না আমি,' পাদ্রীটাকে এখন কেমন ভয় লাগছে মেরীর। এমন ব্যবহার করছে লোকটা যেন সে যা চায় তা-ই পেতে অভ্যস্ত।

'অ্যালেক্সের কাছে যান। সে লাউঞ্জ বার-এ আছে।'

'আমি তাকে বিরক্ত করতে চাই না। ওই ঘরের বাসিন্দাটি কি এখানে কোথাও আছেন?'

'ভদ্রমহিলা এ মুহূর্তে ডাইনিংরুমে বসে খাচ্ছেন। তার নাম মিসেস ইলিংসওয়ার্থ। পাঁচ নাম্বার টেবিলে আছেন উনি।'

'আচ্ছা,' আবার কী যেন চিন্তা করল পাদ্রী। মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শিসের মতো বাতাস বেরিয়ে এলো।

'ভদ্রমহিলাকে খাওয়ার সময় বিরক্ত করা উচিত হবে না। আমি বরং তাঁর ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করি।'

'আপনি বরং ওই চেয়ারটাতে গিয়ে বসুন।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু ওপরতলায় গিয়ে অপেক্ষা করাটাকেই আমি শ্রেয় মনে করছি। এখানে বসে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই না। আপনাকে আবারও ধন্যবাদ। আমি ওপরে গেলাম।'

ঘুরল পাদ্রী, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। মেরীর মনে হলো ওর শিরদাঁড়ায় কেউ এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে। খালি সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল ও। সিমন উইভার নিশ্চয় অহেতুক এই পাদ্রীটাকে খবর দিয়ে আনায়নি। তবে উইভারকে যতটুকু চেনে মেরী, এরকম কাজ তাকে ঠিক মানায় না। অবশ্য ভয় পেলে মানুষ কত কিছুই না করে বসে। হোটেলের বোর্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যও কাজটা করা হতে পারে। ভূত তাড়ানোর কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠবে তারা। শীতের সিজনটাতে

ট্যুরিস্টের অভাব হবে না হোটেলে। এর মধ্যে যুক্তি আছে, কথাটা বিশ্বাস করতে চাইল মেরী। কিন্তু রেভারেন্ড পসনের মধ্যে অস্বাভাবিক কী যেন একটা ব্যাপার আছে...না, শুধু ব্যাপারটা তা নয়...বিদ্যুত নেই, ফোনের লাইন কাটা, রাস্তাঘাট চলার অগম্য। তাহলে লোকটা কী করে হোটেলে এলো?

আবার গায়ে কাঁটা দিল মেরী অ্যান্ড্রুজের।

ঠাণ্ডা ডিনার পরিবেশন করা হলো। খাবারের মেনুতে আছে ফলের রস, স্যামন, চিকেন সালাদ, টিনজাত ফল, চিজ এবং বিস্কিট। সকালের নাশতার খাবারও থাকে ঠাণ্ডা, শুধু কফিটা গরম।

আর্মস্ট্রং দম্পতি বলেকয়ে মার্ক পেন্ডিফোর্ডকে নিজেদের টেবিলে বসাতে রাজি করিয়েছে। সে বসেছে উরসুলার পাশে। হোটেলের ঘর ভর্তি লোক। সবাই নিচু গলায় কথা বলছে। পরিবেশই বাধ্য করেছে তাদেরকে ফিসফিস স্বরে কথা বলতে। বাইরে বেড়ে গেছে হারিকেনের মাতম, তেলের বাতিটা মিটমিটে, ভুতুড়ে একটা আলো ছড়াচ্ছে, টেবিলে বসা লোকগুলোর ভৌতিক ছায়া ফেলেছে ঘরের কোণে। ফায়ার প্লেসে জ্বলন্ত এক খণ্ড কাঠ টাশ্‌শ্‌ শব্দে ফাটল, সাপের মতো হিশশ আওয়াজ তুলল। ইলেকট্রিসিটির অভাবে সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম বন্ধ বলে ঘর শীতল। উঠোনে স্তূপ করে রাখা লাকড়ির জ্বালানী প্রশস্ত ডাইনিংরুমকে উষ্ণতা দিতে ব্যর্থ।

'ঠাণ্ডায় জমে গেলাম,' কিম জ্যাকেটটা শক্ত করে জড়াল গায়ে, লাগিয়ে দিল বোতাম।

অন্যরা চুপ করে রইল। কারও কথা বলতে ভালো লাগছে না। শয়তানের অশুভ কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। সে আশংকায় সবাই শংকিত।

উরসুলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে মার্ক পেন্ডিফোর্ডকে। গত কয়েক ঘণ্টায় ছেলেটার চেহারা যেন আমূল বদলে গেছে। দুশ্চিন্তা এবং ভয়ে রীতিমতো কাহিল সে। পাতাল ঘরে যে দৃশ্য মার্ক দেখে এসেছে তারপরে কারও মাথা ঠিক থাকার কথা নয়। সে উরসুলার হাতে অ্যান্টি ডিপ্রেশান্ট ট্যাবলেটের বোতল গুঁজে দিয়ে বলেছে, 'এগুলোর যদি প্রয়োজন হয় বলব আপনাকে।' এগুলোর এখন খুব দরকার মার্কের। কিন্তু সে এখনও ট্যাবলেট না খাওয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ফলের রসের গ্লাস অর্ধেকটা মাত্র শেষ করেছে মার্ক, সালাদ ছুঁয়েও দেখেনি, বিস্কিট খুঁটছে দাঁত দিয়ে, চিজ স্পর্শ করেনি। মাঝে মাঝেই চোখ বুজে ফেলছে মার্ক, হতাশায় নুয়ে আসছে কাঁধ।

'তুমি ঠিক আছ তো, মার্ক?' অপর দুজন যে প্রশ্নটি করার সাহস পায়নি সে প্রশ্নই করে বসল উরসুলা। ওরা জানে যুবক ভালো নেই।

উরসুলার প্রশ্নটা যেন শারীরিকভাবে আঘাত করল মার্ককে, ঝাঁকি খেয়ে সটান হলো সে, খুলে গেল বুজে রাখা চোখ।

'জ্বী, আমি ঠিক আছি...' তার ইতস্তত গলা শুনেই বোঝা যায় মিথ্যা বলছে মার্ক।

'না, তুমি মোটেই ভালো নেই,' উরসুলা নিজের মুখ নিয়ে এলো মার্কের মুখের সামনে।

'আ-আমি একটা বড়ি খাব,' গলার স্বর কেঁপে গেল মার্কের আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে। 'শুধু একটা। তাহলেই ঠিক হয়ে যাব।'

শক্ত হয়ে গেল উরসুলার ঠোঁট। মার্ককে বড়ি দেবে না ভাবল একবার। কিন্তু ট্যাবলেট না খেলে ছেলেটা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে? আবহাওয়ার যা অবস্থা, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না।

'ঠিক আছে,' চেয়ারে নখ দিয়ে আঁচড়াল উরসুলা। 'আমি তোমার জন্য বড়ি নিয়ে আসছি।'

'না, না,' ভয়ের চরমে পৌঁছে গিয়েও সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করতে ভুলে যায়নি মার্ক। 'আপনি বসুন। আমি বড়ি নিয়ে আসি।'

'বসো। আমি এক্ষুনি ফিরব।'

'আমি যাব?'

'জেসাস ক্রাইস্ট! তাহলে দুজনেই চলো যাই।' মার্ককে বিশ্বাস করতে পারছে না উরসুলা। ছেলেটা হতাশায় হয়তো অনেকগুলো বড়ি গিলে ফেলবে। আর তা হবে আত্মহত্যার শামিল।

'আচ্ছা, চলুন।'

ওরা দুজনে মিলে পা বাড়াল দরজায়, টের পেল লোকজন লক্ষ করছে ওদেরকে, তাদের গলাও শোনা গেল—ওই লোকটার কী হয়েছে, অমন বিধ্বস্ত লাগছে কেন ওকে দেখতে? মার্ক এবং উরসুলা ফয়ারে চলে এলো।

রিসেপশনিস্ট বই পড়ছে না কিংবা আঁকিবুকি করছে না প্যাডে, স্রেফ বসে আছে চেয়ারে চেহারায় আতংক ফুটিয়ে। উরসুলা মেয়েটাকে কিছু বলতে গিয়েও বলল না। রিসেপশনিস্টের ওপর থেকে সরিয়ে নিল চোখ।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো ওরা, কার্পেট মোড়া করিডরে লঘু পায়ে হাঁটছে, কক্ষের নাম্বারগুলো গুণছে...১৫...১৬...১৭...১৮...

'দাঁড়ান!' মার্ক খামচে ধরল উরসুলার হাত। দাঁড়িয়ে পড়ল মহিলা।

'কী হলো?' বিরক্ত উরসুলা। ঝাঁকি মেরে মুক্ত করতে চাইল নিজেকে। কিন্তু শক্ত হাতে তাকে ধরে রেখেছে মার্ক। অয়েল-ল্যাম্পের নিস্তেজ আলোয় মার্কের চেহারা অস্বাভাবিক সাদা লাগছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল মার্ক, কুঁকড়ে গেল, তারপর পিছু হঠতে লাগল।

'না! আমরা...ওই ঘরে কিছুতেই ঢুকব না!'

'কেন ঢুকব না?' উরসুলা ইলিংসওয়ার্থের চাউনি সরু হয়ে এলো। সেও শয়তানের উপস্থিতি টের পেয়েছে। শীতল, ভয়ংকর। কিন্তু শয়তান তো ওদেরকে চারদিক থেকেই ঘিরে রেখেছে। 'তোমার ট্যাবলেট আনতে হলে ঘরে তো যেতেই হবে। বোকার মতো কথা বলো না।'

'না!' মার্কের দাঁতে দাঁত বাড়ি খেয়ে খটাখট শব্দ হচ্ছে।

'ঠিক আছে, তাহলে তুমি এখানে থাক।' উরসুলা ঝাঁকি মেরে মুক্ত করে নিল নিজেকে।

অদৃশ্য কোনো স্প্রিং যেন ধাক্কা মারল মার্ক পেন্ডিফোর্ডকে, এক লাফে চলে এলো উরসুলার সামনে, ঘরের চাবি টান মেরে হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। চাবি ঢোকাল তালায়। ক্লিক। খুলে যেতে লাগল দরজা।

বিস্ফারিত চোখে ঘরের ভেতরে তাকাল মার্ক। বিছানার কোনে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। ল্যান্ডিং ল্যাম্পের আলো পড়েছে গায়ে। এক পাদ্রী। মোটাসোটা, পরনে কালো ওভারকোট, মুখে নিষ্ঠুর হাসি। এবং তার চেহারায় ভাঙচুর শুরু হলো...

পাদ্রীর চোখ দুটো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ঢুকে যাচ্ছে অক্ষিগোলকের মধ্যে, মুখটা লম্বালম্বিভাবে দুখণ্ড হয়ে গেল শয়তানি হাসির ঢঙে, ফুলে উঠল মাথার খুলি, শরীরটা যেন ছায়ার মধ্যে গলে যাচ্ছে। তারপর শুধু রইল একটা মাথা, বেলুনের মতো ফুলে থাকা একটা খুলি, ওটা ডানে-বামে ঘুরছে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে বিকট দুর্গন্ধ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছে ঘর।

টলে উঠল মার্ক পেন্ডিফোর্ড, ঝাঁকি খেল, দুহাতে চেপে ধরল গলা, যেন বন্ধ হয়ে আসছে নিশ্বাস। আতংকের কর্কশ চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা চিরে। উরসুলা দেখল মার্কের শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, তারপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেয়।

ঠিক তখন ছায়া থেকে বেরিয়ে আসা চক্ষুহীন অক্ষিগোলকের দৃষ্টি যেন ঢুকে গেল উরসুলার শরীরে। ওটার শক্তি টের পেল সে, শয়তানের লাগামহীন শক্তি, উরসুলার ভেতরে কেউ চিৎকার করে বলে উঠল 'পালাও! পালাও!' উরসুলা গলায় ঝোলানো ক্রুসটা কাঁপা হাতে মুঠো করল, তুলে

ধরল শূন্যে। মনে হলো আঙুলে ইলেকট্রিক শক লাগল, ক্রুসটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে। উল্টে গেল ওটা, কর্কশ খনখনে, বিজয়ীর একটা হাসি ভেসে এলো। ওল্টানো ক্রুসটা দ্রুত সোজা করল উরসুলা।

শয়তানটা চলে এলো উরসুলার কাছে। কনকনে একটা বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে। উরসুলার মাথা ঘুরছে বনবন করে। শয়তানের শক্তি এমনই প্রবল, যেন উরসুলাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে অতল কোন খাদের।

হাতের রুপোর ক্রসটা যেন জ্বলন্ত কয়লা। তীব্র জ্বলুনি সয়েও ওটাকে ধরে থাকল উরসুলা। সে জানে তাকে এখন প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তবু জোরে জোরে বলল উরসুলা, 'আমি ঈশ্বরের ভৃত্য, তার হুকুম আমি তামিল করছি।'

আবার সেই কর্কশ গলার হাসি, তবে আগের মতো জোরালো নয়, উরসুলার গায়ে বানের জলের মতো একটার পর একটা যে ঢেউ আছড়ে পড়ছিল তার তীব্রতাও হ্রাস পেল। যুদ্ধ করো এবং প্রার্থনা করো মনে মনে বলল উরসুলা। কথাগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করল 'দূর হও...ঈশ্বরের নামে, পিতা এবং পুত্র... ও হলি ঘোস্টের নামে বলছি তুমি দূর হও!'

প্রচণ্ড রাগে হিসিয়ে উঠল ওটা, তারপর ভয়ংকর মাথাটা আঁধারের মধ্যে সংকুচিত হতে লাগল। ওটার পরাজয়ের আর্তনাদ শুনতে পেল উরসুলা। না, পরাজয় নয়, এটা জিন্দালাশ বিনাহির ভূস্বামীর কৌশলগত পিছু হঠা মাত্র। ও আবার ফিরে আসবে। শয়তানের সাথে সামান্য একটা লড়াই হয়েছে মাত্র।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে উরসুলা। ওটা এত কাছে এসে পড়েছিল, প্রায় কব্জা করে ফেলছিল ওকে। কিন্তু মার্ক...

হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসল উরসুলা। হাঁ করা, উল্টে থাকা মুখটার দিকে এক নজর তাকিয়েই যা বোঝার বুঝে নিল। নিজে মরে উরসুলাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে মার্ক পেন্ডিফোর্ড।

চোখে জল এসে গেল উরসুলার, তবে নিজেকে সংযত করল। এই বিপদের সময়ে দুর্বল হওয়া চলবে না, কান্নাকাটি করা যাবে না। মুঠো পাকাল উরসুলা, উঁচিয়ে দেখাল অন্ধকারে। অন্ধকার যেন এখনও পাক খাচ্ছে।

মুখে শুধু প্রতিশোধ নেব বললেই হবে না, কাজ করতে হবে। সিধে হলো উরসুলা। বেরিয়ে এলো ল্যান্ডিং-এ, পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। তার নিজের বেডরুম পরিণত হয়েছিল শয়তানের আস্তানায়। তবু সে বেঁচে আছে। তাকে বেঁচে থাকতে হবে।

ষোলো

কোথাও বিশাল কোনো পাথরের স্তূপ ভেঙে পড়ল, থরথর করে কেঁপে উঠল লচসাইড হোটেলের ডাইনিংরুমের মেঝে। ভীত শ্রোতারা শুনতে পেল ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়েছে কাচ, হারিকেন অ্যাঞ্জেলা পূর্ণ শক্তি নিয়ে হামলে পড়েছে হোটেলে।

কিম হলঘরের দরজা এবং ফয়েরের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দমকা একটা হাওয়ায় কেঁপে উঠল দরজা। লাফিয়ে উঠল ও। মনে মনে প্রার্থনা করল উরসুলা এবং মার্ক পেন্ডিফোর্ড যেন চলে আসে এখুনি। তারা ওপরে গেছে অনেকক্ষণ।

'ওরা এখনও আসছে না কেন একবার খোঁজ নেয়া দরকার। কুড়ি মিনিট হয়ে গেল দুজনে গেছে।' বলল কিম।

'আর মিনিট দশেক অপেক্ষা করব ওদের জন্য,' বলল ওর স্বামী। উরসুলা হয়তো নিজের ঘরে বসে মার্কের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে শলা-পরামর্শ করছে। ওদের অনুপ্রবেশে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটার জন্য রেগে উঠতে পারে বদ মেজাজী উরসুলা। সে হয়তো ট্যাবলেট না খেতে মানা করছে মার্ককে।

'ওই তো...উনি আসছেন!' উরসুলাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল কিম। কিন্তু পৌঢ়াকে একা আসতে দেখে ধক করে উঠল বুক। যদিও চেহারায় চিরাচরিত দুর্বোধ্য ভাবটা ফুটে আছে। দেখে বোঝার উপায় নেই মনের ভেতরে কী চলছে।

টেবিলে এসে বসল উরসুলা, এক কাপ কফি ঢেলে নিল।

'মারা গেছে মার্ক,' বলল সে।

টেবিল খামচে ধরল কিম। মনে হলো টেবিলটা একবার এদিকে তারপর ওদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে। গোটা রুম দুলতে শুরু করল। যেন সমুদ্রগামী জাহাজে আছে ওরা, প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েছে জলযান। ফ্যাকাশে হয়ে গেল এরিকের মুখ। শক্ত হয়ে এলো মুঠো। 'কীভাবে?'

'মেডিকেলের ডাক্তাররা বলবে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছে মার্ক।

স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর জন্য দায়ী শয়তান ভূস্বামী!'

এক দৌড়ে এখান থেকে ছুটে পালানোর প্রবল ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমন করল কিম। মন চাইছে বহু দূরে কোথাও চলে যায়। ঝড়-ঝঞ্ঝা কিছুই মানবে না কিম। কিম কী ভাবছে বুঝতে পেরেই হয়তো ওর হাত চেপে ধরল এরিক, মৃদু চাপ দিল। উরসুলার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য শান্ত স্বরে বলল, 'ঘটনাটা বলুন।'

কুড়ি মিনিট আগে ঘটে যাওয়া ভয়ংকর ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল উরসুলা। শুধু কালো কফিতে চুমুক দেয়ার সময় বিরতি দিল।

'গির্জার পাদ্রীর ছদ্মবেশে এসেছিল দানবটা। আমার ধারণা গির্জার রেভারেন্ড ভদ্রলোক আজই মারা গেছেন এবং বিনাহির ভূস্বামী পাদ্রীর ভৌতিক দেহ আশ্রয় করে এখানে এসেছিল আমাকে খতম করতে। ধূর্ত একটা ফাঁদ। আমি পাদ্রীকে এক নজর কেবল দেখেছি তারপরই ওটার কাঠামো আবছা হয়ে যায়। মার্ক ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। আমাকে আত্মরক্ষার শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়ে নিজেকে শয়তানের হাতে তুলে দেয় সে। আমি মার্ককে বাঁচানোর কোনো চান্স পাইনি। শয়তানের প্রবল শক্তির তোড়ে ভূত তাড়ানোর মন্ত্র পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম। আত্ম-রক্ষাটাই তখন আমার কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। আমি শয়তানের সাথে প্রাণপণে যুদ্ধ করি। সে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তবে জানি আবার সে ফিরে আসবে।'

'তাহলে এখন আমরা করব কী?' প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেল বুঝতে পারল এরিক।

'করণীয় রয়েছে একটাই,' এরিক ভাবল চোখে ভ্রম দেখেছে কিন্তু সত্যি উরসুলার হাতে ধরা কাপটা কাঁপছে। 'আমি ওকে ধাওয়া করব, যে স্টিজিয়ান আঁধার ওকে লুকিয়ে রেখেছে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ব। আর এজন্য তোমাদের সাহায্য আমার দরকার।'

কিম অস্বস্তি নিয়ে নড়ে উঠল। ডাইনিংরুমের আলো আগের চেয়েও পান্ডুর, আঁধার যেন ঝুলছে মাথার ওপর, এ জায়গাটা কখন গ্রাস করে নেবে সে অপেক্ষায় আছে।

সম্মতি দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল এরিক। ওরা উরসুলাকে সাহায্য করবে কারণ এ ছাড়া ওদের আর কিছু করারও নেই। শয়তানটা একের পর এক মানুষ হত্যা করে চলেছে, এরপরে কে তার শিকার হবে তা সহজেই অনুমেয়।

'বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার সময় আমার নেই,' আগের আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে উরসুলার মাঝে।

'এই ভয়ংকর শত্রুর সাথে মোকাবেলা করতে হলে আগে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমরা এখন আমাদের রুমে যাব, ওটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। তারপর আমার ভৌতিক শরীর নিয়ে খুঁজতে থাকব শয়তানকে। এরকম কাজ আমি আগেও করেছি। এবারও আশা করি করতে পারব। তবে আমার শরীরে আত্মরক্ষার কোনো শক্তি থাকবে না। আর এজন্যই তোমাদেরকে আমার দরকার। আমি যখন ভৌতিক শরীর নিয়ে শয়তানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব তখন তোমরা আমাকে প্রটেকশন দেবে। তোমরা হয়তো আমার কথা বুঝতে পারছ না। কারণ আমার কথা সম্ভবত বিশ্বাস হচ্ছে না তোমাদের। তবে তোমাদের যা করতে হবে তা হলো আমার শরীরটাকে পাহারা দেবে এবং কাউকে ঢুকতে দেবে না ঘরে। শয়তান ঘরে ঢোকার জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করতে পারে। তোমরা ওর ফাঁদে পা দেবে না। এখন চলো। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই একদম।'

উরসুলার পেছন পেছন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। একবার তাকাল পেছন ফিরে। অতিথিরা কৌতূহল নিয়ে লক্ষ করছে ওদেরকে তবে কেউ সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করল না। ডিনার বোধহয় আজ দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। মানুষ বিপদের সময় একত্রে থাকতে পছন্দ করে। তাতে তাদের ভয় কমে। তারা ভাবে আমরা একত্রে আছি, একত্রে থাকব। ওরা তিনজন চলে গেছে যাক। কিন্তু আমরা কেউ এ ঘর ত্যাগ করছি না। কেন ত্যাগ করতে চাইছি না তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা কথা বলব না শুধু কফি পান করে চলব। আমরা ভয় পেয়েছি, সবাই খুব ভয় পেয়েছি।

মার্ক পেন্ডিফোর্ডের লাশ চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে উরসুলা। বিছানার পাশে পড়ে রয়েছে চাদরে ঢাকা মৃতদেহ। কিম ওদিকে না তাকানোর চেষ্টা করছে। সে এর আগে কোনোদিন মরা মানুষ দেখেনি। এখনও দেখতে চায় না। মৃত্যুর মাঝে ভীতিকর একটা ব্যাপার আছে। মৃত্যু মানে সবকিছুর অবসান। কিম ভাবতে চাইছে মেঝেতে যে জিনিসটা শোয়ানো রয়েছে তা মানুষের লাশ নয়, লিলেন কাপড়ের স্তূপ। কাজের বুয়া সকালে এসে স্তূপটা নিয়ে যাবে।

উরসুলা ঘরে ঢুকেই কাজে নেমে পড়ল। তার আজব কাণ্ডকারখানা হাঁ করে দেখছে কিম এবং এরিক। বিছানার ওপরে রাখা ছোট একটি সুটকেস খুলে লম্বা একটা পিকচার কর্ড আর কিছু ড্রইং পিন বের করল উরসুলা। খুলল দরজা, দরজার বাইরে, কাঠের মধ্যে তিনটে পিন গাঁথল তারপর রশি দিয়ে ওগুলো পেঁচাল, একটা ত্রিভুজের আকৃতি পেল ওগুলো। 'মানুষের

ছদ্মবেশে কেউ ঢুকতে চাইলে এগুলো তাকে বাধা দেবে।' বলল উরসুলা। সে বন্ধ করে দিল দরজা। ইয়েল লক্ খুট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। 'এবার এরিক, কার্পেটটা ভাঁজ করব। আমার সাথে একটু হাত লাগাও।

খাটের নিচ থেকে কার্পেট বের করে এনে গোল করে মুড়ে নিতে বেশ কসরত করতে হলো দুজনকে। মোড়ানো কার্পেট দেয়ালের দূরপ্রান্তে ঠেলে রাখল ওরা। তারপর বিছানা টেনে নিয়ে এলো ঘরের মাঝখানে। ওদেরকে লাশ তুলতে দেখে চোখ বুজল কিম। মার্কের লাশ চিৎ করে শোয়ানো হলো বিছানায়। এই মহিলা পাগল অথবা দিবাস্বপ্ন দেখছে, ভাবছে ও। এসবের কোনো মানে হয়?

'আত্মরক্ষার জন্য যা যা দরকার তার পুরোপুরি প্রস্তুতি আমি নিতে পারিনি,' বিছানা এবং ওদেরকে ঘিরে একটা বৃত্ত আঁকতে আঁকতে বলল উরসুলা।

'শুধু যেটুকু ব্যবস্থা না নিলেই নয় তা করছি। সময় আমাদের অনুকূলে নয়। আমি গোসল সেরে ডিনার করেছি। তোমাদের কী অবস্থা?'

'আমরাও গোসল করেছি,' জবাব দিল এরিক।

'ভালো করেছ। ঈশ্বরকে পেতে হলে পূতঃপবিত্র থাকতে হয়। তোমরা জামাকাপড় খুলে বৃত্তের বাইরে ছুড়ে ফ্যালো।' উরসুলা ইলিংসওয়ার্থ ইতিমধ্যে কাপড় খুলতে শুরু করেছে। জ্যাকেট খুলে ফেলল সে, হাত দিল ব্লাউজের বোতামে।

'এটা কী...খুব দরকার,' কিম বিব্রতবোধ করছে বুঝতে পারছে এরিক। তাছাড়া ঠাণ্ডাও কম নয়। সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেম অচল বলে বরফ শীতল হয়ে আছে ঘর।

'অবশ্যই দরকার। জলদি, প্লিজ!' কোনোরকম সংকোচ নেই উরসুলার মাঝে, সে নগ্ন হয়ে ওদের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সুটকেসটি নিয়ে। এরিক শার্ট খুলে ফেলল, খুলল বেল্ট, কিম স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

এ স্রেফ পাগলামি, মনে মনে বলল এরিক। কিন্তু সৃষ্টিছাড়া এ জায়গায় যে সব ঘটনা ঘটছে তা উন্মাদনাকেও হার মানায়। ওরা এ পর্যন্ত যা যা ঘটতে দেখেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই অশরীরী কোনো শক্তিই এসবের জন্য দায়ী।

'কোনোভাবেই বৃত্তের বাইরে পা দেবে না,' ধাতু গলানোর জন্য ব্যবহৃত রুপোর একটি পাত্রে ছোট একটি প্যাকেট থেকে লবণ ঢালছে পৌঢ়া। ঠোঁট নড়ছে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে। তবে কিম কিংবা এরিক কারও কাছেই

দুর্বোধ্য উচ্চারণে বলা শব্দগুলো বোধগম্য হচ্ছে না। উরসুলা মন্ত্র পড়তে পড়তে ছোট একটি বোতলের পানি ঢেলে দিল রুপোর একটি কাপে। তারপর আরেকটি মন্ত্র পড়তে লাগল। লবণ ঢালল পানিতে। হিসহিস শব্দ উঠল। চক দিয়ে আঁকা বৃত্তের চারপাশে হাঁটতে লাগল উরসুলা। তারপর পানির পাত্রে ঢুকিয়ে দিল তর্জনী। ক্রুসের চিহ্ন আঁকল কপালে, তার সঙ্গীদের কপালেও এঁকে দিল একই চিহ্ন।

বাইরে হুংকার ছাড়ল বাতাস, ক্রিইইইচ শব্দ তুলল, ভবনের গায়ে আছড়ে পড়ল, যেন ক্রুদ্ধ কোনো দানব এই পবিত্র ধর্মীয় আচারে বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে।

'নিজেদেরকে রক্ষা করার মতো মোটামুটি একটা ঢাল আশা করি তৈরি করতে পেরেছি,' উরসুলা দেখে নিল সবার গলায় ক্রুস আছে কিনা। 'এর বেশি কিছু করার সাধ্য বা সময় কোনটাই আমাদের নেই। এখন আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। আমাকে শীঘ্রি হত্যার চেষ্টা করা হবে,' শিউরে উঠল কিম। ওর ভীষণ শীত করছে। মনে হচ্ছে ঘরের তাপমাত্রা নেমে গেছে কয়েক ডিগ্রি। 'নানাভাবে তোমাদেরকে বিরক্ত করার চেষ্টা করা হবে। কেউ দরজায় কড়া নাড়লেও খবরদার দরজা খুলবে না। যাই ঘটুক না কেন এ বৃত্তের বাইরে যাওয়া চলবে না কিছুতেই। বুঝতে পেরেছ?'

দুজনেই মাথা ঝাঁকাল। কী ঘটবে কোনো ধারণাই নেই ওদের। তবে উরসুলার নির্দেশ মাফিক কাজ করবে, প্রতিশ্রুতি দিল দুজনে। বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল উরসুলা, বন্ধ করল চোখ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ছন্দায়িত ভঙ্গিতে নিশ্বাস পড়তে লাগল তার, বুক উঠছে এবং নামছে। নিজেকে রিলাক্স করো, শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করো।

ঘুমিয়ে পড়ো, উরসুলা।

শরীর এবং মনকে রিলাক্স করতে যোগ ব্যায়ামের পুরানো একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে উরসুলা। তবে কাজটা সহজ নয়, বিশেষ করে সাথে যদি থাকে একটা লাশ এবং মানুষজন। তুমি একটা বোকা, নিজেকে চোখ রাঙিয়েছে উরসুলা। মৃতরা তোমাকে আঘাত করতে পারবে না আর জীবিতরা উপস্থিত রয়েছে তোমার শরীর রক্ষা করার জন্য। তোমার একটা কাজ আছে। ওটা তোমাকে শেষ করতে হবে।

উরসুলা জোর করে চারপাশের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল নিজেকে। এ পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই, সে এখন মুক্ত। সে যেখানে খুশি যেতে পারে। তার মন রওনা হয়ে গেল গন্তব্যে। ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলোর

ওপর মনোনিবেশ করল উরসুলা, আবার সেই ভৌতিক মূর্তিগুলো দেখতে পেল, সেই অন্ধকার। এখানে আগে যেতে হবে উরসুলাকে। ধৈর্য ধরো, নিজেকে সাবধান করল উরসুলা।

একটা উষ্ণ সাগরে যেন ভেসে আছে উরসুলা, স্রোত তাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে আরও রিল্যাক্স করে তুলল উরসুলা। একটা অদ্ভুত অনুভূতি যেন প্রবেশ করল শরীরে, এটা টাইট ওয়েট সুট থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে সে। শুধু এক মুহূর্তের জন্য ঝিমঝিম করল মাথা। উরসুলা সম্ভব করেছে, শরীর থেকে বিযুক্ত করতে পেরেছে নিজেকে!

এতক্ষণে চোখ মেলে চাইল উরসুলা। যা চোখে পড়ল তাতে অবাক হলো না। সে সিলিং থেকে এক হাত নিচে ঝুলছে, তাকিয়ে রয়েছে ১৯ নাম্বার রুমের দিকে। আগে যখনই সে দেখতে পেত নশ্বর দেহটাকে ছেড়ে এসেছে, বিছানায় পড়ে আছে তার দেহ, শক্ পেত উরসুলা। অবশেষে বিষয়টিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে উরসুলা। একবার মাত্র নিজের শরীরের দিকে তাকাল সে। দেখল বয়সের ভারে কোঁচকানো চামড়া, ঝুলে পড়া বক্ষ, চর্বিবহুল উরু। চোখ সরিয়ে নিল উরসুলা। তাকাল অন্যদের দিকে। এরিক এবং কিম পাশাপাশি বসেছে। হাত দিয়ে একে অপরের নগ্ন শরীর জড়িয়ে রেখেছে। ওরা উৎকণ্ঠিত এবং ভীত। মনে মনে ওদের সাহসের প্রশংসা করল উরসুলা, ধন্যবাদ জানাল সহযোগিতার জন্য।

পুরানো ভয়টা আবার ফিরে এলো উরসুলার মাঝে। তবে এটার জন্য প্রস্তুত ছিল সে। ভয়টা দূর করে দিল উরসুলা। আমি যদি আমার শরীরে ফিরে যেতে না পারি, ভাবল সে, নির্ঘাত মারা যাব। অসীম এক আধিভৌতিক জগতের আঁধারে আমার আত্মা অনন্তকাল ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এমনটি ঘটবে না, নিজেকে আশ্বস্ত করল উরসুলা, এরকম ঘটার সম্ভাবনা নেই কারণ ওরা আমার রক্তমাংসের শরীরটা পাহারা দিয়ে রাখছে। আমি ওদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়ে এসেছি ওরা সেভাবেই আমাকে প্রটেক্ট করবে। আমার ভয় পাবার কিছু নেই।

নিজেকে ছেড়ে দিল উরসুলা, ভৌতিক শরীরটাকে ইচ্ছেমতো চলাফেরার স্বাধীনতা দিল। ঘরের ছাদ এবং অন্ধকার ফুঁড়ে ওপরে উঠতে লাগল উরসুলা। বেরিয়ে এলো ঝড়ের মধ্যে। শিষ দিয়ে বাতাস বইছে, মুষলধারে পড়ছে বৃষ্টি। বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে উরসুলা তবে টের পাচ্ছে না। ঠাণ্ডা কিংবা গরম কোনোরকম অনুভূতিই তার হচ্ছে না, ঝড়ের দাঁতের মাঝে ওলোট পালোট খাচ্ছে উরসুলা, দেখছে প্রাচীন প্রাসাদের দেয়ালগুলো

বাতাসের আঘাতে কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। ভোর হবার আগেই ওগুলো ধসে পড়বে, অনুমান করল উরসুলা।

উরসুলা টের পেল ধ্বংসস্তূপ এবং হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে শয়তান, ঢেউর মতো কেঁপে কেঁপে উঠে ভবনের ওপরে অদৃশ্য একটা মেঘ সৃষ্টি করেছে। যেন শয়তান বা যীশুর শত্রু নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটা দেয়াল তুলে রেখেছে।

কালক্ষেপণের সময় নেই, নিচের দিকে রওনা হয়ে গেল উরসুলা, এবড়োখেবড়ো পাথরের মূর্তিগুলোর মাঝ দিয়ে চলেছে, চলে এলো সিঁড়ির মাথায়। এ সিঁড়ি সোজা চলে গেছে ভূগর্ভস্থ টর্চার চেম্বারে। পচা, বিকট গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে, বর্ণনাতীত কোনো ভয়ংকর প্রাণীর আস্তানা থেকে এমন বিশ্রী, বোঁটকা গন্ধ আসছে। আবহমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে অত্যাচারে জর্জরিত নারী-পুরুষের চিৎকার।

সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল উরসুলা। প্লাস্টিকের একটা মূর্তি ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল, টর্চারার। খুবই বিশ্রী দেখতে। একে অনায়াসে ধ্বংস করতে পারে উরসুলা কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। এদের প্রভুর সাথে যখন দেখা হবে উরসুলার, তখন তাকে মোকাবেলার জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি দরকার হবে তার।

হঠাৎ থেকে গেল উরসুলা। টর্চারের চাকাটা আকস্মিক ককিয়ে উঠে ঘুরতে শুরু করেছে। এমনটি হওয়ার কথা নয়। কারণ বিদ্যুত ছাড়া যান্ত্র কাজ করে না। আর এ মুহূর্তে কোথাও বিদ্যুত নেই।

হয়তো উঠোন থেকে ধেয়ে আসা বাতাসের চাপে চাকা ঘুরছে, ভাবল উরসুলা। সে দেখল চাকার নিচ থেকে একটা শরীর বের হয়ে আসছে। নারী শরীর। জ্যান্ত। ব্যথায় গোঙাচ্ছে, কাঁদছে, প্রতি সেকেন্ডে দুর্বল হয়ে আসছে কাতর আর্তনাদ।

ঘাম এবং রক্তের গন্ধ পেল উরসুলা। বুঝতে পারল ওটা কোনো মডেল নয়, শরীরটা নয় কৃত্রিম, রক্তটাও আসল, নকল লিকুইড নয়। বমি উগরে আসতে চাইল উরসুলার, ইচ্ছে করল এক লাফে সামনে বাড়ে, লিভারটা ওপরের দিকে টেনে দিয়ে বন্ধ করে দেয় রক্তের এ হোলি খেলা, লোহার শিকে গাঁথা নারী শরীরটাকে যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু হায়, উরসুলা তা করতে পারবে না। কারণ ভৌতিক শরীরের পক্ষে কোনো কিছু স্পর্শ করা সম্ভব নয়। সে যা করতে পারে তা হলো এসব অত্যাচারের মূল হোতাকে খুঁজে বের করে তাকে ধ্বংস করে দেয়া।

চাকার পাশ কাটাল উরসুলা। মেয়েটি দেখতে পেল ওকে। তার মানে বেচারী মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। আকুল গলায় সাহায্য চাইল সে। তার কান্না পরিণত হলো অভিশম্পাতে তারপর সে গোঙাতে লাগল, অবশেষে গোঙানির রূপান্তর ঘটল ফোঁপানিতে। নিজেকে শক্ত করল উরসুলা। তাকাল না পেছনে। মনে মনে প্রার্থনা করল, ঈশ্বর আমি যেন দিনের আলো ফোটার আগেই পশুটাকে হত্যা করতে পারি।

গুহার ভেতর থেকে গর্জে উঠল মায়া নেকড়ে। দেখতে পেয়েছে উরসুলাকে। ওটার গলায় প্লাকার্ড ঝুলছে। রক্তচক্ষু চাউনিতে প্রবল ঘৃণা। নিশব্দে হেসে ওয়্যারউলফের পাশ দিয়ে চলে গেল উরসুলা। মায়া নেকড়েটো দিনের বেলায় অ্যালশেসিয়ান কুকুরের ছদ্মবেশ ধরে। উরসুলা এটাকে সহজেই হত্যা করতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ নেই কোনো। শয়তানের শরীর থেকে একটা প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে ওটার কলজে ফুটো করে মূল শক্তিটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই হবে বুদ্ধিমতীর কাজ, ভাবল উরসুলা।

বোঁটকা গন্ধটা আরও প্রবল হয়েছে, অন্ধকার আরও কালো এবং ঘন। যার খোঁজে এসেছে, যত তার কাছে যাচ্ছে, দুশ্চিন্তা ততই বাড়ছে উরসুলার। সামনের সংঘর্ষ নিয়ে চিন্তিত সে। ব্যর্থতার পরিণাম হবে ভয়াবহ, অন্যরাও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। ইতিবাচক চিন্তা করো, মনে মনে বলল উরসুলা, তুমি এখন ওর মতোই শক্তিশালী।

হঠাৎ খনখনে, অমানুষিক একটা হাসি পাতালঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল, প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করল, কাঁপন তুলল দেয়ালে। থমকে দাঁড়াল উরসুলা, কর্কশ পাথুরে দেয়ালে নিজের অজান্তেই ঠেকে গেল পিঠ, ভৌতিক শরীর নিয়ে কোথাও লুকানোর উপায় নেই। হাত তুলে ক্রুসের চিহ্ন আঁকল উরসুলা। গরম পানির কেতলি থেকে বাষ্প বেরুনোর মতো হিস্‌স্‌ হিস্‌স্‌ শব্দ উঠল, তারপর আবার শোনা গেল ভয়াল হাসি। এবারে খুব কাছে থেকে।

'আমার কথা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ বিনাহির ভূস্বামী?' অস্বাভাবিক ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল উরসুলা। ওগুলো যেন নড়ে উঠল। 'তোমাকে আমি ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং হলি গোস্টের নামে হত্যা করতে এসেছি।

'আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমাকে তুমি ধ্বংস করতে পারবে না। আমি মৃত্যুর পরে তোমার ঈশ্বর পুত্রের মতোই বেঁচে আছি।

ঠাট্টার সুরে বলা হলো কথাগুলো। তবে উরসুলা তাকে দেখতে পাচ্ছে

না। তাতে কিছু আসে যায় না। সে খুব কাছে চলে এসেছে। উরসুলা এখন শয়তানের মুখোমুখি। তীক্ষ্ণ গলায় বিরতিহীন সুরে মন্ত্র আউড়ে চলল সে। সেই সাথে বুকে অনবরত ক্রুস আঁকছে। মন্ত্র পড়া শেষ হলে মনে মনে বলল, আমার পক্ষে যতদূর করা সম্ভব করেছি। আর কিছু করার নেই আমার।

নীরবতা। টগবগে কালো ধোঁয়ার মতো অন্ধকার ছুটে এলো উরসুলার দিকে উন্মত্ত ক্রোধে। কিন্তু ওকে স্পর্শ করল না। দ্বিধায় পড়ে গেছে অন্ধকারের অধিপতি, কী করবে বুঝতে পারছে না। সে যেন লড়াইয়ে বিধ্বস্ত এক বক্সার, তবু রিং ছেড়ে যেতে রাজি নয়।

উরসুলা হাত দুটো শূন্যে তুলে চিৎকার করল।

এখান থেকে চলে যাও, শয়তান। তোমার প্রভুর নরকে চলে যাও, তোমার ব্যর্থতার কথা আরেকবার গিয়ে বলো তাকে। যে ব্যর্থতার দায়ভার তোমাকে বইতে হয়েছিল শত বছর আগে। যখন তুমি মানুষের রূপে তার কাছে নিজেকে তুলে দিয়েছিলে। তোমার প্রভুকে বলো তোমাকে শাস্তি দিতে, পাতাল ঘরের টর্চার চেম্বারে যেন তোমাকে সাজা দেয়া হয় যেখানে বহু লোককে হত্যা করেছ তুমি। এ জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যাও। আর কোনোদিন ফিরে এসো না।

আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে হাঁ হাঁ করে উঠল বাতাস; অন্ধকারের অধিবাসীদের রাজ্যে প্রবেশের সাহস কে দেখাল তাকে খুঁজতে লাগল ঝড়ো হাওয়া। উরসুলা ঠিক নিশ্চিত নয় তবে ওর মনে হচ্ছে ও সফল হয়েছে। ভৌতিক শরীরে সে ভূস্বামীর আত্মরক্ষার প্রাচীর ভেঙে ঢুকে পড়েছে। তারই আস্তানায় তাকে খুঁজেছে। এখানে থাকার আর দরকার নেই, হার হোক কিংবা জিত, উরসুলার কাজ শেষ।

উরসুলা চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে সে মুহূর্তে বুঝতে পারল মস্ত কোনো ভজকট হয়ে গেছে, তার এতদিনের ভয়টা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তার আধিভৌতিক কাঠামোটা নড়াচড়া করতে পারছে না, যেন পেরেক গেঁথে দেয়া হয়েছে পায়ে। নড়ার চেষ্টা করল উরসুলা। পারল না। অনুভব করল তার মানসিক শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

ওকে এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল উরসুলা। শয়তানটা বেঁচে আছে এবং উরসুলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত নয়, জানে সে, শয়তান ওর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

উরসুলার পার্থিব শরীরটাকে ওরা দখল করে ফেলেছে আর উরসুলা বন্দি হয়ে গেছে পাতাল ঘরে যেখান থেকে ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই!

সতেরো

এত তাড়াতাড়ি বিছানায় চলে আসা ঠিক হলো না, ভাবল মেরী অ্যান্ড্রুজ। ছোট, বৈশিষ্ট্যহীন ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল ও। হোটেল কর্মচারীদের জরুরী প্রয়োজনে এ ঘরটি ব্যবহার করা হয়। কী ঠাণ্ডারে বাবা! শিউরে উঠল মেরী। দেয়ালের টুইন-বার ইলেকট্রিক হিটার যেন দাঁত বের করে মশকরা করছে ওর সাথে। এখানে সবকিছুই বড্ড বেশি বিদ্যুৎ নির্ভর। কারও মাথায় এ কথাটা আসেনি যে বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটলে হতভাগা হোটেল বাসিন্দাদের কী দশা হবে। যেমন এখন হচ্ছে।

মোমবাতি জ্বলছে ঘরে। তবে নড়বড়ে জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া দমকা বাতাসের ঝাপটায় ওটার শিখা মাঝেমাঝেই বিপজ্জনকভাবে কেঁপে উঠছে, নিভে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে। বিছানায় একটা ইলেকট্রিক ব্লাংকেট আছে বটে তবে হিটারের মতো ওটাও মরা লাশ।

মেরীর সাথে নাইটড্রেস নেই। হয় ওকে পোশাক পরেই বিছানায় যেতে হবে অথবা ন্যাংটো হয়ে ঘুমাতে হবে। জামাকাপড় গায়ে ঘুমাবার কথা ভাবতেই অস্বস্তি লাগল মেরীর। এর চেয়ে নগ্ন হয়ে ঘুমানো ভালো। অথবা না ঘুমিয়ে ভোরের অপেক্ষায় জেগে থেকে রাতটাও কাটিয়ে দেয়া যায়।

মোমবাতিটি বেডসাইড টেবিলে নিয়ে এলো মেরী। হলদে, ম্লান আলোয় বই পড়া যাবে কিনা সন্দেহ। পড়া না যাক বইয়ের পাতায় এমনিই মুখ গুঁজে রাখবে মেরী। অন্ধকারে তার ঘুম আসবে না। আর মোমবাতি সকাল পর্যন্ত আয়ু পাবে কিনা বলা মুশকিল। এর আগে দীর্ঘসময় মোমবাতি জ্বালিয়ে কখনও কাজ করার প্রয়োজন হয়নি।

মেরী একবার ভাবল নিচে, কিচেনে গিয়ে এক কাপ চা পান করে আসবে। পরক্ষণে নাকচ করে দিল চিন্তাটা। নাহ্, ঘর থেকে বেরুবে না ও। মেরী স্কার্টের বেল্ট খুলল এবং সাথে সাথে প্রায় চিৎকার দিল বজ্রপাতের শব্দে। ঘরের মেঝে কাঁপিয়ে দিয়ে খুব কাছে বাজ পড়েছে। প্রাসাদের কোনো অংশ হয়তো বজ্রপাতে ধসে পড়েছে।

বিছানায় উঠে পড়ল মেরী। বাপরে, কী ঠাণ্ডা! কম্বলের নিচে গুটিশুটি মেরে শুলো ও। আফসোস হলো ঘরে ঢোকার আগে কেন গরম পানির বোতলটা নিয়ে আসেনি। কিন্তু এখন আবার কাপড় পরে নিচে গিয়ে গরম পানির বোতল খোঁজার শখ নেই মেরীর।

মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করল মেরী। রাস্তাঘাট চলাচলের যোগ্য হয়ে ওঠার পরে সে বাড়ি ফিরবে এবং আর কোনোদিন এ হোটেলের ত্রিসীমায় ঘেষবে না। দ্বিগুণ বেতন দিলেও না। এরকম চাকরির তার দরকার নেই। কাল সকালে তার প্রথম কাজ হবে পদত্যাগপত্র টাইপ করে অ্যালেক্সের হাতে তুলে দেয়া। বলবে, 'দুঃখিত, অ্যালেক্স। আমি আর ফিরছি না। তোমার বা অন্য কারও সাথে আমার কোনো বিবাদ নেই। কিন্তু এ বিশ্রী জায়গায় আমার পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব নয়।'

হাতে বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল মেরী। তবে এভাবে বেশিক্ষণ পড়া যাবে না। ঝিঁঝি ধরে যাবে হাতে। তাছাড়া হাত উঁচিয়ে রেখে বই পড়ছে বলে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে কম্বলের মধ্যে।

ধ্যাত্তেরি, বই পড়ায় একটুও মনোযোগ দিতে পারছে না মেরী। কানে ভেসে আসছে বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ। বুক কাঁপছে মেরীর আবার না বিকট শব্দে বাজ পড়ে কোথাও। ওর মালিকরা হোটেল বানানোর আর জায়গা পেল না! এখানে যত রাজ্যের অদ্ভুত মানুষের বাস। ওদেরকে দেখলেও বিতৃষ্ণা জাগে মেরীর। জানে অ্যাক্সিডেন্টে মেরী মারা গেলেও তার লাশের দিকে ওরা ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু আমার কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, মনে মনে বলল ও। কেন হবে?

অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভাবতে শিরশির করে উঠল মেরীর গা। মস্তিষ্ক থেকে জোর করে দূর করে দিতে চাইল চিন্তাটা। পারল না। হয়তো সিঁড়িতে পা পিছলে ঘাড় ভেঙে অক্কা পেল ও, ভাবছে মেরী। ওরা ওর লাশটা নিয়ে দ্রুত সরিয়ে ফেলবে হোটেলের বাসিন্দারা দেখে ফেরার আগেই (অথবা হোটেলের লোকজনকে দেখাতেও পারে। তারা লাশ দেখে হয়তো আমোদ পাবে।)

পার্থ থেকে শব বহন করার গাড়ি চলে আসবে ওকে নিয়ে যেতে। ওরা মেরীকে কিচেনের চেস্ট ফ্রিজারের মতো ডিপফ্রিজারের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখবে। ওর অটোপসিও করা হতে পারে। ওর শরীর কাটাছেঁড়া করবে ওরা। তারপর চাদরে লাশ মুড়ে ঢুকিয়ে ফেলবে কফিনে। কেঁপে উঠল মেরী। অ্যাক্সিডেন্টের শিকার হওয়া যাবে না, মনে মনে বলল ও। প্রথম

সুযোগেই এখান থেকে চলে যাবে মেরী। এ জনমে এ হোটেলে ফিরছে না সে।

জানালার ফ্রেমের নিচ থেকে ছুটে আসা দমকা হাওয়া দপদপ করে উঠল মোমের শিখা, প্রায় নিভু নিভু দশা। চমকে উঠল মেরী। হাত থেকে পিছলে বই ঠাশ করে পড়ল মেঝেয়।

ধ্যাত, বইটি আর তোলার চেষ্টা করল না মেরী। বই তুলতে হলে বিছানা থেকে নামতে হবে ওকে। রক্ত জমাট বাঁধা ঠাণ্ডায় বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া আলোর নাচনে বই পড়া সম্ভবও নয়। মেরী সিদ্ধান্ত নিল ও জেগে থাকবে, না ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেবে রাত। মোমের শিখা আবার দপদপিয়ে উঠল, আঁধারে যেন ভেংচি কাটল মেরীকে।

মেরী কান পেতে শুনল ঝড়ের মাতামাতি। হাওয়ার গর্জন যদি বন্ধ করা যেত! মানুষজনের সাড়া শব্দ পাচ্ছে না ও। লোকজন নিশ্চয় হাঁটাহাঁটি করছে, কেউ হয়তো নিজেদের ঘরে যাচ্ছে কেউবা ঘর থেকে বেরুচ্ছে। কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না মেরী। সমস্ত শব্দ গিলে খেয়েছে বাতাসের হুংকার। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া ঠিক হয়নি বুঝতে পারছে মেরী। কিচেনে, প্রদীপের আলোয় এখনও যারা বসে গল্প করছে তাদের সাথে যোগ দিলেই বরং ভালো হতো। হোটেলের অতিথিদের ডিনার পর্ব শেষ হয়েছে কিনা কে জানে। হয়তো সারা রাতই ওরা ডাইনিংরুমে বসে থাকবে। উঠবে সকালের নাশতা খাওয়ার পরে।

ঝড়ো হাওয়ার দাপাদাপি ছাপিয়ে একটা শব্দ ভেসে এলো মেরীর উৎকীর্ণ কানে। ফ্লোরবোর্ড ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাড়ছে, কেউ চলে আসছে ল্যান্ডিংয়ে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল মেরী মানুষের সাড়া পেয়ে। তখন কেউ টোকা দিল ওর ঘরের দরজায়।

দম বন্ধ করে রইল মেরী। সত্যি কি কেউ টোকা দিয়েছে দরজায়? সেরকমই তো মনে হলো। এমনও হতে পারে কেউ ভুল করে কিছু একটি ছুড়ে দিয়েছে দরজায়। মেরীর মনে হয়েছে টোকার শব্দ। আবার হলো শব্দটা। টোকা দিল কেউ। পরপর দুবার।

'কে?' জোরে বলল মেরী।

'আমি...অ্যালেক্স।'

আশ্চর্যের ব্যাপার, কণ্ঠটা শোনামাত্র মেরীর নাড়ির গতি বেড়ে গেল। ও কেঁপে উঠল মৃদু। কিছুক্ষণ আগে অ্যালেক্সকে নিয়ে রচিত মধুর স্বপ্নগুলো মনে পড়ে গেছে। নাহ্, ওরকম কিছু ঘটবে না, খুব বেশি আশা করে

ফেলেছে ও। অ্যালেক্স হয়তো রিসেপশন ডেস্ক চেক করার ব্যাপারে কিছু বলতে এসেছে। বুকিং এর এনকোয়ারির বিষয় হতে পারে। মেরীকে এক্সট্রা শিফটে কাজ করতে বলবে হয়তো। কারণ যাই হোক, দেখা দরকার।

'ভেতরে আসতে পারো। দরজা খোলা আছে,' বলল মেরী।

অ্যালেক্স যাওয়ার পরে দরজা বন্ধ করে দেবে ও।

খুট্ শব্দে খুলে গেল দরজা, দোরগোড়ায় বারম্যানের কাঠামোটা আধা আলোয় নজরে এলো মেরীর। পরনে সাদা জ্যাকেট এবং কালো ট্রাউজার্স। ভেতরে ঢুকল অ্যালেক্স। পেছনে লাগিয়ে দিল দরজা।

'বাহ্, শুয়ে পড়েছ দেখছি,' রসিকতার সুরে কথাটা বলা হলেও ভঙ্গিটা ভালো লাগল না মেরীর। অশুভ কিছু একটা আছে অ্যালেক্সের গলায়। বুকের ভেতরে কলজেটা ধড়াশ ধড়াশ লাফাতে লাগল, বিছানার চাদরটা বুকের ওপর টেনে দিল মেরী। তুমি বড্ড ওভার অ্যাকটিং করছ, নিজেকে বলল ও, তোমার নার্ভ খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে তোমাকে দুর্বল করে ফেলছে।

'বাইরে প্রবল ঝড়,' অনুমতির ধার না ধেরে বিছানায় বসে পড়ল অ্যালেক্স। 'তোমাকে সারা হোটেলে খুঁজলাম। কোনো বিপদে পড়লে কিনা ভেবে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল খুব।'

ও তাহলে কোনো বদ মতলব নিয়ে আসেনি, স্বস্তি পেল মেরী। বেডক্লথের মুঠি আলগা হলো। 'কাজ ছিল না বলে চলে এসেছি।'

মেঝেয় পড়ে থাকা বইটির দিকে এক ঝলক তাকাল অ্যালেক্স। ঘন গোঁফের আড়ালে মুচকি হাসল। 'আবার সেই রোমান্টিক। তুমি রোমান্টিক বই পড়ে সময় নষ্ট কর কেন, মেরী?'

মেরীর হার্টের একটা বিট মিস করল। ওর হাতের সাথে অ্যালেক্সের হাত, সে মৃদু চাপ দিচ্ছে আঙুলে। কী ঠাণ্ডা হাত! অবশ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত এ হোটেলের কোন্ মানুষটিরই বা উষ্ণতা রয়েছে শরীর?

'ভাবছিলাম তোমাকে বলব চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি,' মেরীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলো অ্যালেক্স। তার চোখ যেন অতল পুকুরের মতো কালো। 'কিন্তু এমন আবহাওয়ায় তো বেরুবার জো নেই।'

মেরীর মনে হচ্ছে ও স্বপ্ন দেখছে। ঘুম থেকে জেগে উঠতে ইচ্ছে করছে না। ওর শরীরে জাগছে রোমাঞ্চ। ওদেরকে কেবল বেডক্লথটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। চাদরের নিচে সম্পূর্ণ নগ্ন মেরী।

'প্রস্তাবটা মন্দ নয়, অ্যালেক্স,' খসখসে গলায় ফিসফিস করল ও। 'আমার ভালো লেগেছে।'

অ্যালেক্সের ঠোঁট খুঁজে পেল মেরীর টসটসে অধর, জিভের চাপে ফাঁক হয়ে গেল ওষ্ঠদ্বয়, মুখের ভেতরে প্রবেশ করল জিভ। ক্রাইস্ট, জিভ নয় যেন একখণ্ড বরফ ঢুকে গেছে মেরীর মুখে। জিন এবং টনিক মেশানো জিভ। চোখ মুদল মেরী, টের পেল অ্যালেক্স চাদরটা টেনে নামাচ্ছে শরীর থেকে। বুকের ওপর থেকে নামিয়ে আনল বেড ক্লথ। উত্তেজনার স্রোত বইছে শরীরে, মেরী জানে অ্যালেক্স তাকিয়ে আছে ওর নগ্ন বুকে। আমার শরীরের যেখানে ইচ্ছা তুমি দেখতে পার, অ্যালেক্স, আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পার, নিশব্দে ওকে বলল মেরী।

ঠাণ্ডাটা কোনো ব্যাপার নয়, মেরী এখন ঠাণ্ডা টেরই পাচ্ছে না, নড়েচড়ে শুয়ে অ্যালেক্সের জন্য জায়গা করে দিল। নেশার মতো লাগছে ওর, কাঁপছে শরীর। অ্যালেক্স জানে মেয়েদের কোথায় স্পর্শ করলে তারা সুখ পায়, শিহরিত হয়ে ওঠে। অ্যালেক্স যেভাবে ওকে ছেনেছুনে অস্থির করছে, কিছুক্ষণের মধ্যে রেতঃপাত হয়ে যাবে মেরীর।

চোখ না খুলেই মেরী বুঝতে পারছে অ্যালেক্স ওর কাপড় খুলছে উন্মাদের মতো। মেরী অ্যালেক্সের মুখে জিভ ঢুকিয়ে দিল, ঘাড়ের বরফ শীতল মাংস খামচে ধরল দুহাতে। আই য়্যাম গোয়িং টু কী ফাকড, ভাবছে মেরী এবং রমণ লীলার প্রতিটি সেকেন্ড আমি উপভোগ করব।

মেরীর গায়ের ওপর উঠে এলো অ্যালেক্স। অ্যালেক্সের শরীর একই সাথে নমনীয় এবং শক্ত, মেরীর ঘাড়ে চুমু খাচ্ছে সে। চুমু তো নয় যেন বরফের ছ্যাঁকা। তবে এসব নিয়ে মোটেই ভাবছে না মেরী। তার শরীর তীব্র উন্মাদনায় জেগে উঠেছে, রেতঃপাত হতে চলেছে। দু'পা দিয়ে অ্যালেক্সের কোমর শক্ত করে পেঁচিয়ে ধরল ও, আরও জোরে আকর্ষণ করল নিজের শরীরের গভীরে।

অ্যালেক্স কোনোরকম বিরতি ছাড়াই প্রচণ্ড গতিতে কোমর ওঠা-নামা করছে, হাত দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে মেরীর কাঁধ, প্রতিবার কোমরের ধাক্কায় মেরীর শরীরের গভীর থেকে গভীরে ঢুকে যাচ্ছে, পাগল করে তুলছে ওকে। বিরামহীন মন্থনে নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড় মেরীর। বেডক্লথ বহু আগেই মেঝেতে খসে পড়েছে। মেরী আর নিতে পারছে না, এখন ব্যথা পাচ্ছে ও। মেরীর মানসিক এবং শারীরিক অবস্থাটা যেন বুঝতে পারল অ্যালেক্স, মন্থর হয়ে এলো গতি, অবশেষে থেমে গেল।

ঈশ্বর, কী যে সুখ! একটুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ও হয়তো আবার শুরু করবে, ভাবল মেরী। সেই বিবাহিত লোকটার মতো। গত গ্রীষ্মে, মিসেস

ম্যাকগ্রেগরের কটেজে ট্যুরিস্ট হিসেবে এসেছিল বিবাহিত লোকটা। দারুণ রমণ করতে পারত সে। এক বিকেলে লোকটার সাথে বিনাহির পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল মেরী। পাহাড় চুড়োয় শুয়ে ওরা প্রেম করে। পরপর কয়েকবার। তবে সে সব এখন অতীত। অ্যালেক্স ওই লোকটার চেয়েও বেশি সুখ দিয়েছে মেরীকে। অ্যালেক্সের রমণ শক্তির তুলনাই হয় না। আচ্ছা, অ্যালেক্সের জিনিসটা কত বড়? শরীরের ভেতরে ওটার অস্তিত্ব ভালোই অনুভব করেছে মেরী তবে চোখে দেখার মজাও তো আলাদা!

চোখ মেলে চাইল মেরী। ধ্যাত্তেরি, নিভে গেছে মোম। বাতাসের সাথে লড়াইয়ে আর টিকতে পারেনি। কালি গোলা অন্ধকারে ডুবে আছে ঘর। অ্যালেক্স মেরীর ফাঁক করা দুই পায়ের মধ্যে এখনও শুয়ে আছে, তবে ওকে দেখা যাচ্ছে না। ঘরটা আগের চেয়েও বেশি ঠাণ্ডা লাগছে।

'তুমি একটা দারুণ গরম জিনিস, বালিকা,' ঘ্যাসঘেসে গলায় হেসে উঠল বারম্যান।

'তুমিও কম দারুণ নও, অ্যালেক্স,' বলল মেরী। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত। 'কম্বলটা বিছানা থেকে তোলো। এসো, জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে থাকি।'

'প্রস্তাবটা লোভনীয়,' মন্তব্য করল অ্যালেক্স। 'তবে এখন না। পরে হবে। এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

'নতুন আর কী জিনিস দেখাবে?' খিলখিল হাসল মেরী। 'কিন্তু মোমবাতি না জ্বালালে তো দেখতে পাব না।'

'মোমবাতি লাগবে না,' অ্যালেক্স পিছলে নামল বিছানা থেকে, মেরীর হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল বিছানায়।

'যে জিনিসটা তোমাকে দেখাতে চাইছি সেটা এখানে নেই। এসো আমার সাথে।'

'তোমার সাথে যেতে হবে?'

'হুঁ। যেতে হবে। জলদি করো।'

'আরে বাবা, কাপড়টা তো অন্তত পরতে দেবে।'

'কাপড় পরতে হবে না,' অধৈর্য শোনাল অ্যালেক্সের গলা। রেগে গেছে। 'চলো তো!'

'আরি, কেউ দেখে ফেলবে তো।' মেরীকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল অ্যালেক্স, 'তাছাড়া বাইরে হাড় কাঁপানো শীত।'

'কেউ দেখবে না,' মেরী অবাক হয়ে গেল দেখে ল্যান্ডিং করিডর পুরোপুরি অন্ধকার। হুমড়ি খেয়ে পড়ার ভয়ে সঙ্গীকে জাপটে ধরে থাকল

ও। পায়ের নিচে কার্পেটের স্পর্শ পেল প্রথমে, তারপর নগ্ন কাঠের মেঝে। অবশেষে পাথরের সিঁড়ি, নেমে গেছে নিচে, অমসৃণ এবং শীতল।

'অ্যাই, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' জবাব দিল না বারম্যান।

হঠাৎ আলো চোখে পড়ল মেরীর। ইলেকট্রিক লাইট কিংবা বাতির আলো নয়, চারপাশের পাথুরে দেয়াল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ধূসর রঙের আলো রহস্যময়, অশুভ সব কাঠামোর রেখা ফুটিয়ে তুলেছে।

'আমরা পাতালে চলে এসেছি!' পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মেরী কিন্তু তার সঙ্গী শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে কব্জি, ব্যথা লাগছে। 'আমাকে ছাড়ো, অ্যালেক্স। করছ কী তুমি?'

এবারও জবাব দিল না অ্যালেক্স। মেরীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আশপাশে কী আছে দেখতে বাধ্য করছে মেয়েটাকে। বড়বড় পেরেক বসানো টর্চার হুইল এবং রক্ত মাখা কাঠের রিম দেখে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল মেরী। ভয়ার্ত মেরী লক্ষ করল হুইলের সাথে প্লাস্টিকের সেই ডামিটা নেই। শুধু চাকাটা আছে। যেন অপেক্ষা করছে।

মেরীকে সামনের দিকে ধাক্কা মারল অ্যালেক্স, কব্জি মুচড়ে ধরে হাত নিয়ে এলো পিঠের পেছনে। তারপর হেসে উঠল। শিকারী তার শিকারের গায়ের ছাল ছাড়ানোর সময় যেমন ঘোঁতঘোঁত শব্দে হাসে সেরকম কুৎসিত হাসি।

চোখের পলকে মেরীকে এক পাক ঘুরিয়ে ফেলল বারম্যান। মেরীর মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে আসার আগেই ও বুঝতে পেরেছে ওকে নিয়ে কী করতে যাচ্ছে অ্যালেক্স। শরীর শক্ত হয়ে গেল ওর; কল্পনায় দেখতে পেল রক্তাক্ত পেরেকগুলো ওর শরীরে ঢুকে যাচ্ছে।

ওহ্, কী ব্যথা, কী বেদনা! পেরেকগুলো ঢুকে গেল মেরীর পিঠ, নিতম্ব, কব্জি এবং পায়ের গোছে। ওকে হুইলের সাথে বেঁধে ফেলেছে অ্যালেক্স। গরম রক্ত ঝরঝর ঝরতে শুরু করল মেরীর নগ্ন শরীর বেয়ে। প্রতি সেকেন্ডে সুচাল পেরেকগুলো একটু একটু করে ওর নরম মাংসের মধ্যে আরও ঢুকে যাচ্ছে। ধূসর, কুয়াশার মতো আলোটাকে এখন মনে হচ্ছে টকটকে লাল। মেরীর সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ও তো অ্যালেক্স নয়। ও অ্যালেক্স হতে পারে না। ওই লোকটার সাথে অ্যালেক্সের চেহারার কিছুটা মিল আছে বটে তবে নগ্ন শরীরটা নোংরা, গায়ে শুকিয়ে আছে রক্ত। লোকটার পেছন থেকে ভেসে এলো ইঁদুরের কিচমিচ। পাতাল ঘরে জ্যান্ত মাংসের গন্ধে অস্থির ওরা।

কথা বলার চেষ্টা করল মেরী, আকুতি জানাতে চাইল, কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু গোঙালি আর রক্তমাখা গাঁজলা বেরুল।

লোকটা মেরীকে দেখছে। খিকখিক হাসছে। আবার শরীরে তীব্র ব্যথার হুল ফুটল। আরেকটা পেরেক ঢুকে গেছে মেরীর গায়ে, ফিনকি ফুটে বেরুল রক্ত। নড়ে উঠল লোকটা। তার কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও।

ধাতব কী একটা জিনিস ঝনঝন শব্দ তুলল, কেঁপে উঠল হুইল, নড়তে লাগল। চাকা ঘুরছে সেই সাথে শিকলে বাঁধা মেরীর নগ্ন, রক্তাক্ত শরীরটা উঠে যাচ্ছে ওপরে। মাথা ওপরে, পা নিচে। বিস্ফারিত চোখে পাতাল ঘরের ছাদ দেখল। মাকড়সার জালে ঢাকা ছাদ। জালে বসে আছে কুৎসিত দর্শন মাকড়সা, কচমচ শব্দে চিবিয়ে খাচ্ছে মাছি। মৃত্যুর গন্ধ ধাক্কা মারল মেরীর নাকে, চারদিকে শুধুই মৃত্যু।

প্রথমে ওপরে তারপর নিচু হতে লাগল মেরীর শরীর। মস্তিষ্কে যেন বানের মতো ধেয়ে এলো রক্ত। মেরীর মাথা মেঝেতে বাড়ি খেতে চলেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেতে চাইছে মাথা। ব্যথার মাত্রাটা বেড়ে চলল প্রতি মুহূর্তে। পরিষ্কার ভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে না মেরী শুধু বুঝতে পারছে ওর দুর্বল, রক্তাক্ত শরীরটা কেটে টুকরো হয়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে হাড়গোড়, লোহার স্পাইকগুলো তাদের হত্যাযজ্ঞের চূড়ান্ত সীমায় চলে এসেছে।

সজোরে মেঝেতে বাড়ি খেল মেরী। খুলির হাড় ভেঙে ঢুকে গেল মগজে। সাথে সাথে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অনন্ত লোকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল ও। তবে লোহার চাকা থামল না। মেরীর নিস্তেজ, ভাঙাচোরা শরীরটাকে ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে চলল।

আঠারো

'আমি আর সইতে পারছি না,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল কিম আর্মস্ট্রং। বিছানার কোণে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে, তার স্বামী তাকে এক হাতে জড়িয়ে রেখেছে। হাতটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে কিমের। তীব্র মন চাইছে এক ছুটে দরজা খুলে নিচের ডাইনিংরুমে চলে যায়। ওখানে অন্তত কিছু স্বাভাবিক মানুষজন আছে। তারা ভয়ে শিটিয়ে থাকলেও এই অদ্ভুত, অর্থহীন কাণ্ডকারখানার যন্ত্রণা তাদের সইতে হচ্ছে না।

'জাস্ট রিল্যাক্স,' ফিসফিস করল এরিক। 'আর বেশিক্ষণ লাগবে না।'

উরসুলা ইলিংসওয়ার্থের শক্ত শরীরটার দিকে কটমট করে তাকাল কিম। শ্বাস করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। গভীর ঘুমে অচেতন মহিলা। এমন ঘুম, যেন মারা গেছে। কিম কখনও মৃত্যু দেখেনি, তবে ঘুম তো মৃত্যুরই নিকটাত্মীয়। 'কতক্ষণ?'

'জানি না। তবে বোধহয় শীঘ্রি ফিরে আসবেন উনি।'

কিমের নার্ভ প্রায় ভেঙে জোগাড়। শীঘ্রি ফিরে আসবেন! বোকা বুড়িটা তো ওদের সামনেই ঘুমাচ্ছে! আবার ফিরে আসবে কী? এরিক এসব ব্যাপার বিশ্বাস করলেও কিমের এতে কোনো বিশ্বাস নেই। উরসুলা আসলে নিজেকে শো করতে চাইছে। মহিলার মাথায় গণ্ডগোল আছে।

হঠাৎ ঝট করে দাঁড়িয়ে গেল কিম। 'আমি কাপড় পরে এক্ষুনি নিচে যাব।' খেঁকিয়ে উঠল ও। 'ঠাণ্ডায় জমে গেছি। আর এসব সহ্য করতে পারছি না। যথেষ্ট হয়েছে!'

'বসো! আর একদম কথা বলো না!' এরিকের খুব টেনশন হচ্ছে। উরসুলা ঘুমিয়ে পড়ার আগে বলেছিল যা-ই ঘটুক না কেন বৃত্তের বাইরে যাওয়া একদম বারণ। মহিলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। এরিক শপথ করেছিল, কিমও।

'আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না। আমি...'

ঠাস করে চড় কষাল এরিক। বন্ধ ঘরে বেশ জোরেই হলো শব্দটা।

কিমের ফর্সা গালে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়ে গেল। ওর চোখ জোড়া ভীষণভাবে জ্বলে উঠল। দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল কিম, জল চলে এসেছে চোখে। মুখ রক্তশূন্য, কাঁপতে কাঁপতে এরিকের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল কিম। ভেতরের রাগটা ধীরে ধীরে পড়ে এলো।

'আমি দুঃখিত, এরিক। জানি না কীসে ভর করেছিল আমাকে। হঠাৎ খুব ইচ্ছে করল...একটানে খুলে ফেলি দরজাটা।'

উরসুলার সতর্কবাণী মনে পড়তে শিরদাঁড়াটা শিরশির করে উঠল এরিকের! 'আমরা যে কেউ এমন অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারি, এমনকি আমার ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। ভয়াল শক্তি শুরু করে দিয়েছে হামলা। 'যদি যদি আমি উল্টোপাল্টা কিছু শুরু করে দিই।' বলতে ভয় লাগছে এরিকের, আবার একই সাথে নিজেকে বোকা বোকাও লাগছে। 'যেভাবে পারো বাধা দেবে আমাকে। প্রয়োজনে আমার অণ্ডকোষে লাথি মেরে অজ্ঞান করে দেবে।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা ঝাঁকাল কিম। জানে শক্তিতে স্বামীর সাথে ও পারবে না তবে সহজে হাল ছেড়ে দেবে না কিম। লড়াই করবে। উরসুলার জন্য, ওদের সবার জন্য।

ওর অপেক্ষা করতে লাগল।

সময় যেন থেমে গেছে, ওরা মস্ত একটা শূন্যের মধ্যে পড়ে গেছে, এই শূন্য থেকে কোনোদিন যেন বেরিয়ে আসতে পারবে না। হারিকেন অ্যাঞ্জেলা বাইরে হুংকার ছেড়েই চলেছে। এরিক হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের কথা ভাবছে। ওরা কী করছে? অ্যালেক্স হয়তো সারা রাতের জন্য খুলে রেখেছে বার। ওরা ফ্রি মদ খাচ্ছে। আমাদেরও উচিত ওদের সাথে যোগ দেয়া। না, ঈশ্বরের দিব্যি, এ বৃত্তের বাইরে যাব না আমরা!

দরজায়...দরজায় কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে!'

কিমের ফিসফিসানি এক ধাক্কায় বাস্তবে নিয়ে এলো এরিককে। ওর বাহুতে কিমের নখ বসে গেছে, কম্পিত কণ্ঠে আতংক।

শুনতে পেল এরিক। দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ। এ সামান্য বৃত্ত কি ওদেরকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? দরজায় রশি আর ক'টা সামান্য পিন কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে শয়তানকে? ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখো, মনে মনে বলল এরিক। বাইরে, দরজায় আঙুলের গাঁট দিয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে টোকা পড়তে শুরু করেছে।

'কে ওখানে?'

'দরজা খুলুন।'

'কে?'

সাড়া নেই। দীর্ঘক্ষণ নীরবতার পরে এরিক ভাবল যে এসেছিল সে চলে গেছে অথবা এমনও হতে পারে কেউ আসলে আসেইনি। তারপর জবাব দিল একজন, কণ্ঠটা সাথে সাথে চেনা গেল। 'আমি স্যার, অ্যালেক্স।

অ্যালেক্স, বারম্যান, পার্টিতে আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছে, ভাবল এরিক। যত ইচ্ছা মদ খাও, পয়সা দিতে হবে না। মি. উইভারের উদ্দেশে টোস্ট করা হবে। সে মারা না গেলে কি আমরা পার্টি দিতে পারতাম?

'দরজা খুলতে পারব না, অ্যালেক্স। দুঃখিত।'

'কিন্তু দরজা খুলতেই হবে, স্যার। আপনাদেরকে সাংঘাতিক দরকার। মিসেস ইলিংসওয়ার্থ এখুনি তাঁর সাথে আপনাদেরকে দেখা করতে বলেছেন।' দরজার হাতল ধরে টান দিল অ্যালেক্স।

'না, উনি দেখা করতে বলেননি, অ্যালেক্স। তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কারণ উনি এ মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন।'

এবার দরজায় প্রচণ্ড জোরে কিল ঘুসি পড়তে লাগল। কাঠের ফ্রেম বারবার কেঁপে উঠল, ঝনঝন শব্দ উঠছে তালায়। ধীরে ধীরে কমে এলো বাইরের উন্মত্ততা। তারপর সব চুপচাপ। অ্যালেক্স বা যেই হোক, চলে গেছে ওখান থেকে জানে এরিক।

'চলে গেছে,' নিশ্বাস বন্ধ করে বলল কিম। 'ওহ্, এরিক। যা ভয় পেয়েছিলাম!'

'ওরা ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে,' গলায় রসিকতার সুর ফোটানোর চেষ্টা করল এরিক, চাপড় মারল কিমের নগ্ন উরুতে। 'তবে ঢুকতে পারছে না। কারণ ওদের চেয়ে উরসুলার শক্তি অনেক বেশি। আমরা যতক্ষণ এখানে আছি, নিরাপদে থাকব।'

ঝড়ের দাপাদাপিও যেন কিছুটা কমে এসেছে, যেন এখানে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মানুষগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছে।

'ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে,' অনেকক্ষণ পরে মন্তব্য করল কিম।

'শ্‌শ্‌। হয়তো বা। তবে উরসুলা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়ছি না। ঘুমন্ত শরীরের দিকে আড়চোখে তাকাল এরিক। একটি

রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তের জন্য মনে হলো নিশ্বাস নিচ্ছে না উরসুলা, তার বক্ষ জোড়া স্থির। তারপর নড়ে উঠল বুক, খুব আস্তে ফুলে উঠল, তারপর নেমে এলো। যেন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে পিছলে যাচ্ছে উরসুলা।

'এরিক, উনি কী...?'

'আমার ধারণা উনি ভালো আছেন।' সামনে ঝুঁকল এরিক, নিশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘরের বাইরে অকস্মাৎ গর্জন ছাড়ল বাতাস, বাধা দিল এরিককে। 'ওনার অবস্থা সুবিধের ঠেকছে না...মনে হচ্ছে উনি দুর্বল হয়ে পড়ছেন...' হয়তো মারা যাচ্ছে উরসুলা। ওহ্, জেসাস, আমরা এখন কী করি? ডাক্তার ডাকার কোনো অবকাশ নেই। তবে ডাক্তার ডাকাও যাবে না। উরসুলার সতর্কবাণী মনে পড়ে গেল সাবধান, এমনকি স্বয়ং আমিও আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যুহের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারি।'

'এরিক...ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। কী যেন পুড়ছে।'

নাক টানল এরিক। ধোঁয়ার গন্ধ পেল। নাক দিয়ে গলার মধ্যে ঢুকে গেল পোড়া গন্ধটা, কেশে উঠল ও। আতংকের ঢেউ উঠল বুকে, তবে স্বাভাবিক থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করল ও। 'ঠিকই বলেছ তুমি। কিছু একটা কোথাও পুড়ছে।'

'দ্যাখো!'

কিমের আঙুল লক্ষ করে তাকাল এরিক। দরজার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুকছে, লম্বা, ধূসর কিলবিলে আঙুলের মতো লাগল প্রথমে, তারপর শুঁড়ের আকার ধারণ করল ধোঁয়া, শেষে ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

'হোটেলে আগুন লেগেছে!'

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে গেল এরিক। একটা গর্জন শুনতে পাচ্ছে ও। ঝড়ো বাতাসের হুংকার নয় ওটা। আগুনের শিখা গর্জন ছাড়ছে! কিমকে জড়িয়ে ধরল এরিক, তাকাল জানালায়। জানালার ছয় ফুট নিচে একটা কাঠের ক্যাটওয়াক আছে। ক্যাটওয়াকটা চলে গেছে ভাঙাচোরা প্রাসাদের এক তলায়। জানে বাঁচতে হলে ওদিক দিয়ে পালাতে হবে। অন্য কোনো উপায় নেই।

'আমাদেরকে ঘর থেকে বের করার জন্য ওরা হোটেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে!' ফিসফিস করল এরিক। ওরা ভীষণ রকম অসহায়, ওর কণ্ঠে ভীতি। আঁধারের শক্তি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছে, অবশেষে জিত হয়েছে

তার। 'জানালা দিয়ে নামব আমরা। এসো, উরসুলাকে ঘুম থেকে তুলব।'

পৌঢ়াকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করল ওরা। ওকে ধরে ধাক্কা দিল, কানের পাশে তারস্বরে চিৎকার করল। কিন্তু উরসুলার চোখ বোজাই থাকল। ঝাঁকির চোটে মাথাটা একবার ডানে, আরেকবার বামে দুলছে। যেন মারা গেছে সে। ধোঁয়ায় দ্রুত ঢেকে যাচ্ছে ঘর। ওদের চোখ জ্বালা করছে। বেদম কাশছে দুজনে।

জানালা খুলে ফেলল এরিক। ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ঢুকল ভেতরে। নিচে এক ঝলক তাকাল ও, তারপর উরসুলার কাঁধ আকড়ে ধরল, কিম ধরল পা। মহিলাকে তুলতে বেশ কষ্ট হলো। তারপর চৌকোনা ফাঁকটা দিয়ে ছেড়ে দিল উরসুলাকে। নিচে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হতে পারে মহিলা, মারাও যেতে পারে। কিন্তু এ ঘরে তাকে রেখে গেলে সে পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে।

উরসুলা নিচের ক্যাটওয়েতে ধুপ করে পড়ল। এরপর এরিক কিমকে জানালা থেকে নেমে পড়তে সাহায্য করল। লাফ দিল কিম। এরপরে ও লাফিয়ে পড়ল। ভেজা, পিচ্ছিল বোর্ডে আছাড় খেল এরিক, গড়িয়ে গেল, ঠেকল এসে ছাদে খাড়া হয়ে থাকা লম্বা একটি দণ্ডের গায়ে। পাগলের মতো ওরা পরস্পরের নাম ধরে ডাকল। নাহ্, দুজনেই ঠিক আছে। আহত হয়নি কেউ। এখন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে।

আবার তোলো উরসুলাকে। মহিলাকে তুলতে জান ছুটে গেল ওদের। কী ওজনরে বাবা। অর্ধেক পাঁজাকোলা করে, অর্ধেক প্রায় টানতে টানতে উরসুলাকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল ওরা। খুদে বর্শার মতো বৃষ্টির ফোঁটা বিঁধছে গায়ে, হিম ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাচ্ছে, ওদেরকে ছিঁড়েখুড়ে ফেলতে চাইছে, অদৃশ্য আঙুল ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে উরসুলাকে। অবশেষে ওরা উরসুলাকে নিয়ে একটি আর্চওয়ের আড়ালে চলে এলো। ওদের কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে বিরাট এক খণ্ড পাথর দড়াম করে পড়ল উঠোনে, ভেঙে শতখণ্ড হলো। উন্মাদ হাওয়া প্রাসাদের দেয়ালের আরেকটা অংশ খসিয়ে ফেলেছে।

'আমরা এখানে থাকতে পারব না,' বলল এরিক। 'সকালের আগেই গোটা প্রাসাদ ভেঙে পড়বে।'

কিন্তু স্বামীর কথা কানে যায়নি কিমের। ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার চোখ, উরসুলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, চোখ খোলা, ঝড়ো রাতের আকাশে শূন্য দৃষ্টি। কিম কোনোদিন মৃত্যু না দেখলেও

বুঝতে পারছে এখন সে যা দেখছে তারই নাম মৃত্যু।

'এরিক...উনি...মারা গেছেন!'

যে ভয়টা করছিল ওরা সেটাই এবার সত্যি হলো। উরসুলা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেও পারল না– হেরে গেল লড়াইতে।

দেয়ালে হেলান দিল এরিক আর্মস্ট্রং। নিচু করে রেখেছে মাথা। ওরা ব্যর্থ হয়েছে; বিনাহি প্রাসাদে শতাব্দী কাল ধরে বাস করা শয়তানেরই অবশেষে জিত হয়েছে। এখন যদি ঈশ্বর দয়া করে ওদের রক্ষা করেন। নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত

এরিক কী করবে জানতে চাইল না কিম। জানে কিছু করার নেই শুধু ভোরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া। ওরা দুই নারী-পুরুষ, নগ্ন, শীত এবং ভয়ে কাতর, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দাদের কথা ভাবছে এরিক। তারা কি এখনও ডাইনিংরুমে বসে আছে নাকি আগুনে পুড়ে মরার ভয়ে হোটেল ছেড়ে পালিয়েছে? কথাটা মাথায় আসতেই জানালার দিকে তাকাল ও। ওই জানালা দিয়ে একটু আগে লাফিয়ে পড়েছে ওরা।

জানালা দিয়ে কমলা রঙের অগ্নিশিখা লকলকে জিভ বের করছে না, শিকার ধরার নেশায় উন্মাদ নয়। জানালায় আগুনের চিহ্নই নেই। জানালা অন্ধকার–শুধু প্রদীপের মৃদু আলোক রেখা দেখা যাচ্ছে। ওরা আসার সময় তেলের প্রদীপটা জ্বলছিল। ভয়ংকর বিষয়টি যখন উপলব্ধি করতে পারল এরিক অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হলো ও। ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চাইল, পারল না। কিমও মুখ তুলে চেয়েছে, বাধ্য করল এরিককে ওর তীব্রতম ভয়টাকে ব্যক্ত করতে।

'এরিক...কোথাও আগুনের চিহ্ন নেই!'

'না,' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল এরিক। 'আগুন লাগেনি। ওটা একটা কৌশল ছিল মাত্র, একটা ইল্যুশন। এবং কৌশলটা কাজে লেগেছে। ভূস্বামী সাংঘাতিক ধূর্ত। সে ধোঁয়া তৈরি করেছিল যাতে আগুনের ভয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি। তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে। মারা গেছে উরসুলা। আমাদের জীবন এখন নির্ভর করছে ভূস্বামীর দয়ার ওপরে!'

উনিশ

'পুরো ব্যাপারটা এখন আমাদের ওপর নির্ভর করছে,' গলায় আত্মবিশ্বাসের স্বর ফোটাতে চাইল এরিক।

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে কিম। জানে তার স্বামী সত্যি কথাই বলছে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে লড়াই করা ছাড়া উপায় থাকে না। 'আমারও তাই ধারণা। চলো এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।'

একটা দেওড়ির মধ্যে ঢুকল ও, সেখান থেকে চলে এলো হোটেলের নিচ তলায়। সংক্ষিপ্ত করিডরের পরে রিসেপশন এলাকা চোখে পড়ল। মুখ গোমড়া রিসেপশনিস্টকে দেখতে না পেয়ে ওরা খুশিই হলো। ডাইনিংরুম থেকে মানুষজনের গলা ভেসে আসছে। অতিথিরা আছে এখনও।

'আগে শুকনো কিছু পোশাক পরে নিই,' রিসেপশনিস্ট ডেস্কে ঝুঁকল এরিক, 'ডুপ্লিকেট' লেখা বোর্ড থেকে একটা চাবি খসিয়ে আনল।

'বেডরুমে যাওয়াটা কি উচিত হবে?'

'সমস্যা নেই। শয়তানের যা দরকার ছিল তা সে নিয়ে গেছে।' ভূস্বামী উরসুলার প্রাণ সংহার করেছে। ওই ঘর তার আর প্রয়োজন নেই।

দরজার বাইরে সেই ত্রিভুজ প্রতিরক্ষার চিহ্নটি আছে এখনও। চেহারা কেমন করুণ মনে হলো কিমের কাছে। যেন বাচ্চা ছেলে সৈকতে বালুর ঘর বানিয়েছিল, ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙে গেছে বাড়ি।

দরজা খুলল এরিক, টানটান শরীর। কোনোরকম বেগতিক দেখলেই ঘুরে দৌড় দেবে। তবে ভেতরে কেউ নেই। ওরা যে রকম রেখে গিয়েছিল সেরকমই আছে ঘর। ছোট টেবিলে এখনও অয়েল-ল্যাম্পটি জ্বলছে, মার্ক পেন্ডিফোর্ডের লাশ চাদর দিয়ে ঢাকা। চকের বৃত্তের চেহারারও কোনো বিকৃতি ঘটেনি।

'প্রতিরক্ষা ব্যূহটা যথেষ্টই শক্তিশালী ছিল,' ঘরের মেঝে থেকে নিজেদের জামা-কাপড় তুলতে তুলতে তেতো গলায় বলল এরিক। 'ওদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যূহ থেকে আমাদের বের করে আনা। আমরা বোকার মতো

ওদের ফাঁদে পা দিয়েছি।'

'এজন্য নিজেদেরকে আর দোষ দিতে হবে না,' চেস্ট অব ড্রয়ার খুলে এরিক একটা শুকনো তোয়ালে দিয়েছে। সে ওটা দিয়ে গা মুছছে। 'যা হওয়ার হয়ে গেছে। উরসুলাও নিশ্চয় আমাদেরকে দোষ দিত না। তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের যা করা দরকার মনে হয়েছে আমরা তা-ই করেছি।'

গা মুছে শুকনো পোশাক পরে নিল স্বামী-স্ত্রী। তারপর নেমে এলো নিচে। রিসেপশনিস্টকে দেখতে পেল না কোথাও। বোধহয় মেয়েটা ডিউটি শেষ করে চলে গেছে, ভাবল ওরা। বাতাসের হুংকারের মুহূর্তের বিরতির মাঝে ডাইনিংরুম থেকে লোকজনের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সদর দরজা বাতাসের ধাক্কায় কেঁপে উঠছে।

'আগে ডাইনিংরুম চেক করব,' কিমের হাত ধরল এরিক। ইস্, কেন যে মেয়েটা এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল! 'দেখা যাক হোটেল বোর্ডারদের কী অবস্থা।'

ওরা ডাইনিংরুমে ঢুকল। রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে মুখগুলো তাকাল ওদের দিকে। নীরব প্রশ্ন চোখে এতক্ষণ তোমরা কোথায় ছিলে? তোমাদের সাথে সেই পৌঢ়া মহিলা এবং চশমা পরা যুবক কোথায়?

ওদের দেখে এগিয়ে এলো বারম্যান। কালো চুলগুলো কাকের বাসা, মুখটা ভয়ানক বিষণ্ন। মুখ বাঁকাল সে কিমদের দিকে তাকিয়ে।

অ্যালেক্সকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে গেল এরিক। মনে পড়ে গেছে ১৯ নাম্বার রুমে ঘণ্টা কয়েক আগে দরজায় টোকা মারছিল এই অ্যালেক্স। তার সাথে চোখাচুখি হলো এরিকের। চোখ সরিয়ে নিল অ্যালেক্স। সে যদি সত্যি দরজায় টোকা মেরে থাকে, বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইছে, আচরণে বোঝা গেল।

এরিক বলল, 'গুড ইভনিং, অ্যালেক্স। নাকি মর্নিং বলব?'

'আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ভোর হয়ে যাবে,' অসন্তোষ বারম্যানের কণ্ঠে। ঠনঠন শব্দ তুলল গ্লাসে। যেন বলতে চাইল মদ খেতে চাও তো খেতে পার, কিন্তু হাতে তুলে দিতে পারব না।

এরিক হুইস্কির একটা বোতল খুলে মদ ঢালল দুটো গ্লাসে। একটা গ্লাস এগিয়ে দিল কিমের দিকে। টের পাচ্ছে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে হোটেলের লোকজন। কিন্তু এদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। এরা সব মরা মাছ।

'তুমি এখানেই থাকো, কিম,' নিজের গ্লাসটা খালি করল এরিক। আবার গ্লাস পূর্ণ করার বাসনা দমন করল শক্ত হাতে। 'এখানে তুমি নিরাপদ থাকবে।

'প্লিজ, না। তোমাকে আমি আবার বাইরে যেতে দেব না।' চোখে জলে টলমল করছে কিমের। 'তাতে কোনো লাভ হবে না। উরসুলা ব্যর্থ হয়েছে। সে জানত সে কী করছিল। আমরা দুজনেই এখানে থাকব। আশা করি ভোর হলে সমস্ত বিপদ কেটে যাবে।'

'আমরা এখানে বসে থাকলে কাউকেই আর আগামী ভোর দেখতে হবে না,' কোথাও পাথর খসে পড়ার শব্দ শুনতে পেল এরিক। প্রাসাদের দেয়াল আবার ধসে পড়েছে। তাছাড়া এখানে বসে থাকা মানে ফাঁদে আটকা পড়া। আবার হয়তো আরেকটা রাত এখানেই কাটাতে হবে। গলায় ঝুলতে থাকা ক্রুসটা বের করে বুকের ওপর রাখল এরিক। 'জানি না কোথায় যাব বা কী করব। হয়তো বেহুদাই নষ্ট করছি সময়। কিন্তু কিছু না করে স্রেফ বসে থাকতে পারব না। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরব।'

এরিককে বাধা দিল না কিম। দেখল ও দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল, বেরিয়ে পড়ল রিসেপশন এরিয়া থেকে। ব্যাকুলতা জাগল স্বামীর পেছনে ছুটে যায় কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল কিম। জানে এতে লাভ হবে না কোনো। মনস্থির করে ফেলেছে এরিক। ওর জন্য গর্ব হচ্ছে কিমের। ঘরের এক কোণায় কতগুলো তরুণ আর যুবক বসে তাস খেলছে, চেহারায় ফুটিয়ে রেখেছে কাউকে পরোয়া না করার ভঙ্গি। এদেরকে ঘৃণা করে কিম।

এরিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাতাল ঘরের টর্চার চেম্বারে যাবে। ওখানে গিয়ে যা করার করবে। এ জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করছে ভয়ংকর এক শক্তি, বিনাহির ভূস্বামী। এক সময় সে ছিল শয়তানের জল্লাদ, আবার প্রভু তাকে জাগিয়ে তুলেছে। ভূস্বামীকে ধ্বংস করলেই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজটা এক কথায় প্রায় অসম্ভব কারণ এরিকের কাছে অস্ত্র বলতে শুধু রয়েছে রুপোর ক্রুস আর ঈশ্বরের ওপর অগাধ বিশ্বাস।

হাতের টর্চের ব্যাটারির আয়ু ফুরিয়ে আসছে, দুর্বল আলোক রেখা ছায়া ভেদ করে খুব বেশি দূরে যেতে পারছে না। আলোতে ছায়ারা গুটিয়ে যাচ্ছে, আবার গড়াতে গড়াতে ফিরে আসছে আগের জায়গায়। নকল হররের একটা পৃথিবী, বিরাট বিরাট পাপেট, বিদ্যুত বিপর্যয়ের কারণে

সবক'টা অকেজো। যেন তীব্র ঘৃণা নিয়ে এই মানুষটাকে দেখছে তাদের অন্ধকার জগতে অনুপ্রবেশ করার জন্য ওরা।

এরিকের পায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে গেল ইঁদুর, আঁধারে জ্বলছে অসংখ্য পুঁতির মতো চোখ। আবার মানুষের মাংস খাওয়ার অপেক্ষায়। অসংখ্য ইঁদুর কাঁটা বসানো চাকাটার ওপরে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিচমিচ শব্দ করছে।

এরিকের চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। সরসর করে দাঁড়িয়ে গেছে ঘাড়ের সব ক'টা চুল। টর্চের বৃত্তাকার আলোয় ছিন্নভিন্ন একটা মানুষের শরীর দেখতে পেয়েছে ও। খুবলানো শরীরে কামড় বসাচ্ছে ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলো, মানুষটার চেহারা চেনা যাচ্ছে না। যদিও গঠন দেখে মনে হচ্ছে কোনো নারী শরীর হবে। তবে বোঝার জো নেই।

লাশটাকে পরীক্ষা করে দেখার প্রবৃত্তি হলো না এরিকের। সে নরখাদককে দেখতে পেল। দুই চোয়ালের ফাঁকে মাংস খণ্ড, স্থির হয়ে আছে। বিদ্যুত চলে যাওয়ার কারণে ওটা নিশ্চল। ওটাকে দেখে এখন ভয় লাগছে না এরিকের। নরখাদক তার উদ্দেশ্য সাধন করেছে, তার প্রভুর আর একে দরকার নেই।

ওয়্যারউলফ এরিককে দেখে গর্জন ছাড়তে চাইল। পারল না। বিদ্যুতের অভাবে সে-ও অসহায়। ভ্যাম্পায়ার ওটার পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওটার একটা দাঁত ভেঙে গেছে পতনের চোটে।

বুক ভরে দম নিল এরিক। চূড়ান্ত হুঁশিয়ারির গন্ধ পেল বাতাসে। ভূস্বামী তার খেলার সামগ্রীগুলোকে অকেজো করে রেখেছে কারণ এদের আর তার দরকার নেই। এবারের হরর শো হবে বাস্তব, অদৃশ্য আতংক ঘাপটি মেরে আছে আঁধারে, মরণশীল মানব সন্তানের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত কারণ সে শয়তানের আস্তানায় প্রবেশের দুঃসাহস দেখিয়ে অপরাধ করেছে।

কিছু একটা নড়ে উঠল– হালকা পায়ের শব্দ পেল এরিক। থেমে দাঁড়াল ও, টর্চ ঘুরিয়ে ফোকাস করল আলো, এক ঝলক দেখতে পেল লাল চুলের একটা ছেলেকে, সাদা মুখে মেচেতার দাগ ভর্তি, ছুটে পালাচ্ছে। কিছু একটা যেন খুঁজছিল সে। খুঁজে পেয়ে যেন ভীত হয়ে পড়েছে। এক কী দুই সেকেন্ড ছেলেটাকে দেখল এরিক, তারপর আঁধার গিলে ফেলল তাকে, ম্লান হয়ে এলো পদশব্দ। শিউরে উঠল এরিক। ছেলেটাকে এক নজর

দেখেই চিনতে পেরেছে। ও ডেভি শেলর!

গা কাঁপতে লাগল এরিকের, টর্চের আলো আরও কমে আসছে। পেছন থেকে ঠাণ্ডা আঙুল বাড়িয়ে এরিককে স্পর্শ করল অন্ধকার, পাঁই করে ও ঘুরে দাঁড়াতেই সরে গেল, তবে বিপরীত দিক থেকে আবার হামলে পড়ল ওর ওপর। পায়ের নিচে মেঝে কাঁপছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। এরিক বুঝতে পারল প্রাসাদের কোনো একটা অংশ আবার ধসে পড়েছে। ভূস্বামী প্রাসাদ ধ্বংস করে দিচ্ছে কারণ এটার তার আর দরকার নেই। মৃতরা উঠে আসছে জীবিতদেরকে খতম করতে!

পাথুরে সিঁড়ির পায়ের কাছে চলে এলো এরিক। এ সিঁড়ি সোজা চলে গেছে উঠোনে। ও ঘুরে দাঁড়ালেই গোলক ধাঁধার মতো এক সারি প্যাসেজ সামনে পড়বে। অথবা এরিক এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে পারে। স্বাধীনতা যেন ওর সাথে মশকরা করল পালাও ছোকরা, সময় থাকতে কেটে পড়ো, জিন্দালাশের এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। কিমের কথা মনে পড়ছে এরিকের। শয়তানের কবল থেকে ওকে বাঁচাতে হবে। কী করবে বুঝতে পারছে না। কার যেন পায়ের শব্দ পেল এরিক।

ওই ছেলেটাই বোধহয় ফিরে আসছে। ভয়ে কুঁকড়ে গেল এরিক। না, লঘু পায়ের আওয়াজ নয়, ভারী পদশব্দ, প্রাপ্তবয়স্ক কেউ আসছে। কিন্তু কে? যে-ই হোক, উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে সে। সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলল এরিক। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। ফর গডস শেক, কে তুমি?

প্রথমে পা জোড়া দেখতে পেল এরিক, শক্তিশালী, সুগঠিত পায়ের গোছ, হাঁটু, উরু, চর্বি জমে গেছে। তারপর ঝোপের মতো পিউবিক হেয়ার, কোঁচকানো পেট, ঝুলে পড়া বক্ষ, খাটো, মোটা ঘাড়...

গলা দিয়ে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো এরিকের। অবিশ্বাস, বিস্ময় এবং স্বস্তির চিৎকার। মিটমিটে আলোয় পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পাচ্ছে ও। বয়সের ভাঁজ পড়া মুখখানায় আশ্বস্ত করার হাসি, গভীর কণ্ঠটি প্রতিধ্বনি তুলল দেয়ালে।

'তোমাদেরকে সবখানে খুঁজেছি আমি,' বলল উরসুলা ইলিংসওয়ার্থ।

কুড়ি

কিম একটা খালি টেবিল দখল করল। ওর বামে বসেছে মধ্যবয়স্ক দুই নারী-পুরুষ। মদ খেয়ে ঢুলছে। মাঝে মাঝে ঢুলুঢুলু চোখ মেলে তাস খেলায় ব্যস্ত তরুণদের দিকে তাকাচ্ছে। কিম অনুমান করল তরুণদের কেউ হয়তো এ পৌঢ় দম্পতির ছেলে। ছেলেকে নিয়ে বোধহয় টেনশনে আছে। ছেলে আবার ভূত শিকারের অভিযানে বেরিয়ে পড়ে কিনা!

নিজেকে সাংঘাতিক অসহায় লাগছে কিমের। যদি মরতেই হয়, স্বামীর পাশে যেন ওর মরণ হয়–এ ঘরে কতগুলো অচেনা মানুষের মাঝে মরতে চায় না সে।

গ্লাস ভাঙার ঝনঝন শব্দে চমকে উঠল কিম। একটা জানালার কাচ ভেঙে গেছে। হারিকেন অবশেষে হোটেলের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। হু হু করে হাওয়া ঢুকছে ডাইনিংরুমে, যেন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকা মানুষগুলোকে খুঁজছে।

কে যেন আসছে। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, জ্যাকেটের কলার ওপরের দিকে ওল্টানো, দুই ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলছে সিগারেট, হাঁটার তালে কার্পেটের ঝরে পড়ল ছাই। কিম লোকটাকে দেখছে। ক্লান্ত এবং ভীত মন মানুষটাকে চিনে নিতে সময় নিল। হাত দিয়ে চেয়ারের কোণ চেপে ধরল কিম, কুঁকড়ে গেল শরীর; আমি এখানে নেই, মনে মনে বলল ও, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। আমার দিকে তাকাবেন না। লাফ মেরে উঠে ঘর ফাটিয়ে চিৎকার দেয়ার চেষ্টাটা বহু কষ্টে সংবরণ করল ও।

‘ওই লোকটা জর্জ ভ্যালান্স এবং উনি তো মারা গেছেন!

কোনো সন্দেহ নেই ওই মানুষটাই সেই লেখক। আর কিমের আতংক এবং ভয় যে অহেতুক নয় তা প্রমাণ করতেই বাতাস ধেয়ে এলো ওর দিকে, সাথে বয়ে আনল টার্কিশ তামাকের খুশবু।

ডাইনিংরুমের অন্যান্য লোকজন জর্জ ভ্যালান্সকে দেখছে কিন্তু তারা মানুষটাকে দেখে অবাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য ওরা তো আর

জর্জ ভ্যালান্সকে চেনে না। এরা হোটেলে এসেছে পরে, জর্জ ভ্যালান্সের মৃত্যুর অল্প ক'দিন আগে। লেখকের পরিচয়ও তারা জানত না। এদের কাছে জর্জ ভ্যালান্স একজন বৃদ্ধ মানুষ মাত্র যিনি বেশিরভাগ সময় ডুবে থাকেন বইয়ের জগতে, মাঝে মাঝে নিচে নেমে আসেন হৈ-হট্টগোলের শব্দ শুনলে।

ভ্যালান্স বার-এর দিকে পা বাড়ালেন। বার-এ অনেকগুলো বোতল সাজানো। কিমের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। কিম প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে চাইছে সে যা দেখছে ভুল। ওই মানুষটার সাথে জর্জ ভ্যালান্সের চেহারার মিল আছে মাত্র অন্য কিছু নয়। কিন্তু কিমের মন এ যুক্তি মেনে নিতে নারাজ। সে জানে ওটা জর্জ ভ্যালান্সই। ভ্যালান্স যেন আমাকে দেখে না ফেলেন, প্রার্থনা করল কিম।

অ্যালেক্স হাজির হলো বার-এ। লেখকের আকস্মিক আগমন তাকে মোটেই বিস্মিত করতে পারেনি। সে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বোতলগুলোর দিকে ইংগিত করল। আপনার যেটা পছন্দ নিতে পারেন, মি. ভ্যালান্স, কিম কল্পনা করল অ্যালেক্স লেখককে এ কথাই বলছে। এখানে সেলফ-সার্ভিস। তবে সব ফ্রি।

আমি পাগল হয়ে যাব! হাত দিয়ে মুখ ঢাকল কিম। নিশব্দে ফোঁপাতে লাগল। এখন যদি মৃত ম্যানেজার উইভারও হাজির হয়ে যায় চমকাবে না ও। আসতে পারে ক্যারোলিন চাডারটন, শেলর দম্পতির ছেলেটা। চলে এসো সবাই, পার্টিতে যোগ দাও!

আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাকাল কিম। লাফিয়ে উঠল কলজে। আরি, জর্জ ভ্যালান্স গেল কই! ঠিক তখন আবার বিশ্রী শব্দ করে ডাইনিংরুমের আরেকটা জানালার কাঁচ ভাঙল। ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে গেল মেঝেতে। বাতাস হুংকার ছেড়ে ঢুকে পড়ল ফয়ের এবং রিসেপশন এলাকায়। বাতাসের ধাক্কায় হাঁট হয়ে খুলে থাকল ডাইনিংরুমের দরজা। খোলাই থাকল।

তবে এবারে কেউ ঢুকল না ঘরে।

'তোমরা আমার কথা অমান্য করেছ,' ভর্ৎসনা করল উরসুলা। 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত বৃত্ত ছেড়ে কোথাও যেতে মানা করেছিলাম!'

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে এরিকের। চোখ নামিয়ে নিল, অন্যায় করা ছাত্রের মতো, ধরা খেয়েছে শিক্ষকের কাছে। বকা খাচ্ছে। পায়ে পা

ঘষতে ঘষতে তোতলাম,' আমি...আমরা...ধোঁয়া দেখেছিলাম...ভেবেছি হোটেলে আগুন লেগেছে...'

'বাদ দাও,' এরিকের ব্যাখ্যা শোনার সময় নেই উরসুলার। কটমট করে তাকাল ওর দিকে। 'আবার জামাকাপড়ও পরে ফেলেছ দেখছি। আমার সাহায্য তোমাদের আর দরকার হবে না মনে হচ্ছে।'

'না, না। ও কথা বলবেন না। সাহায্যের অবশ্যই দরকার।' উরসুলার দিকে তাকাল এরিক। ১৯ নাম্বার কক্ষে সমাহিত হওয়ার সময় যেরকম দেখেছে মহিলাকে প্রায় তেমনই লাগছে দেখতে। প্রায়। তবে একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে কোথাও, ঠিক ধরতে পারছে না এরিক। কী যেন নেই উরসুলার মধ্যে। তাই খচখচ করছে মন।

'শেলরদের ছেলেটাকে আমি দেখেছি,' বিড়বিড় করল ও। 'এখানে। কয়েক মিনিট আগে।'

'তুমি ভুল দেখনি,' মৃদু হাসল উরসুলা। 'ওরা সবাই বেঁচে উঠেছে। ওদের প্রত্যেকে। তোমাদেরকে বোধহয় বলেছিলাম এটা জিন্দালাশের প্রাসাদ।'

'জ্বী, বলেছিলেন,' বলল এরিক।

'তুমি যখন এসেই পড়েছ, আমার সাথে যোগ দাও,' উরসুলার ঠোঁট জোড়া হাসির ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। হাসিটা দেখে ঘাড়ের কাছটা কেমন শিরশির করে উঠল এরিকের। 'ভালো কথা, ওই ক্রুসটার আর দরকার নেই। ওটা বরং আমাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করবে। ওটা খুলে ফ্যালো। ছুড়ে ফেলে দাও।

ক্রুসে হাত বাড়াল এরিক, হঠাৎ থমকে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বুঝে ফেলল ব্যাপারটা, ও এখন জানে উরসুলাকে নিয়ে ওর মনটা কেন খচখচ করছিল। উরসুলার গলায় রুপোর ক্রুসটা নেই, পবিত্র সেই ভালিসমান যা সকল অপশক্তির কবল থেকে তাকে রক্ষা করত, সেই জিনিসটি অদৃশ্য!

নিজের ছোট্ট ক্রুসটা মুঠোয় চেপে ধরল এরিক, চেইন সুদ্ধ ক্রুসটা বাড়িয়ে দিল উরসুলার দিকে। 'আপনি এ ক্রুসটার কথা বলছিলেন, উরসুলা?'

কেউ যেন প্রচণ্ড ঘুসি মারল উরসুলাকে, পেছন দিকে হেলে গেল সে। হাসিটা মুছে গেছে মুখ থেকে, সেখানে ফুটল ক্রোধ এবং যন্ত্রণা। 'ওটা...ফেলে দাও!' কথা বলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে উরসুলার, এরিকের

দিকে বিস্ফারিত চোখ, চাউনিতে ভয়, আড়ষ্ট শরীরটা ভাঁজ হয়ে গেল সামনের দিকে। 'না!'

'তুমি বলেছিলে ভূস্বামী যে কোনো জায়গায়, যে কোনো চেহারায় হাজির হতে পারে,' আর 'আপনি' বলে সম্মান করার ধার ধারল না এরিক। ক্রুসটা সামনে বাগিয়ে ধরে কদম বাড়ল। পিছিয়ে যেতে লাগল উরসুলা, পা বেঁধে গেল সিঁড়িতে, হুমড়ি খেল সে, প্রায় ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। 'তুমি যে ঠিক কথাই বলেছিলে তার প্রমাণ তো হাতে নাতেই পাচ্ছি। তোমাকে দেখেই মনের ভেতরটা খচখচ করছিল আমার। কোথায় যেন একটা ব্যাপার মেলাতে পারছিলাম না। এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। তুমি ক্রুস গলায় পরনি। কারণ পরতে পারনি। কারণ তুমি জিন্দালাশেদের একজন। তুমি বিনাহির ভূস্বামী!

দাঁত মুখ খিচিয়ে এরিককে অভিসম্পাত করল পৌঢ়া, কিন্তু গালিগালাজ গিলে খেল বজ্রপাতের আওয়াজ। থরথর করে কেঁপে উঠল মেঝে। ফাটল ধরল সিঁড়িতে তবে ভেঙে পড়ল না। ধুলোয় ঢেকে গেল ঘর। নিভু নিভু হয়ে আসার টর্চের আলোয় নগ্ন মহিলাকে দেখছে এরিক। অশ্লীল লাগছে দেখতে। এরিকের গলার গভীর থেকে বেরিয়ে এলো শব্দগুলো। প্রতিটি শব্দ আঘাত করল উরসুলার ভৌতিক শরীরকে। সে পিছু হঠতে লাগল। 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং আমি তার অনুগত ভৃত্য, এখানে এসেছি এ জায়গার অপশক্তিকে ধ্বংস করতে। ঈশ্বর, পিতা এবং পুত্রের নামে বলছি...'

চিৎকার করে উঠল উরসুলা। এরিক দেখল মাথার ওপরের ছাদটা ধনুকের মতো বাঁকা হতে শুরু করেছে, তারপর ঝুরঝুর করে পড়ল ইট চুন সুড়কি। হা ঈশ্বর, ধসে পড়ছে ছাদ!

দ্বিধায় ভুগছে এরিক; ও ছুটে পালিয়ে যাবে নাকি সিঁড়ির ওপর শরীর মোচড়াতে থাকা কুৎসিত জীবটার দিকে এগিয়ে যাবে। পেছন ফিরল এরিক। ধুলোর আরেকটা মেঘ উঠেছে। পাতাল ঘরের একটা অংশ খসে পড়েছে। হয়তো বেরুবার রাস্তা গেছে বন্ধ হয়ে। ওদিকে গেলে জিন্দালাশদের কবরে চিরদিনের জন্য দাফন হয়ে যাবে এরিক।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হলে উরসুলা ইলিংসওয়ার্থের ছদ্মবেশ ধারণ করা ওই শয়তানটার পাশ কাটাতে হবে এরিককে। এ ছাড়া উপায় নেই। ভাঙা সিঁড়িতে বসে পড়েছে উরসুলা নামধারী পিশাচ। দু'হাত তুলে ওকে

বিশ্রী গালিগালাজ করছে, মিনতি করছে অন্ধকার রাজ্যের সম্রাটের কাছে তাকে সাহায্য করার জন্য।

উরসুলার মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে যেতে লাগল। গলে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যাচ্ছে চামড়া, ফুলছে, কুঁচকে যাচ্ছে। মাথা থেকে খসে পড়তে লাগল চুল, বেরিয়ে পড়ল খুলি। চোখ জোড়া ঢুকে গেল অক্ষিগোলকের মধ্যে, কংকালসার আঙুলগুলো ভীতিকর ভঙ্গিতে খামচাচ্ছে বাতাস। মানুষের ছদ্মবেশ ছেড়ে আসল চেহারায় আবির্ভূত হচ্ছে শয়তান।

এরিক আর্মস্ট্রং ঝড়ের গতিতে পাশ কাটাল ওটার, ঘুরে দাঁড়াল শেষবারের মতো, ক্রুসটা ছুড়ে দিল পিশাচের গায়ে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ওটা, আর্তনাদ করল, ডিগবাজি খেয়ে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে সরে গেল।

ছুটল এরিক। টলতে টলতে বাইতে লাগল সিঁড়ি। চুন-সুড়কি আর আবর্জনা খসে পড়ল গায়ে। সামনে আবর্জনার বিরাট একটা স্তূপ। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল এরিক। মনে মনে প্রার্থনা করল, ঈশ্বর আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার ভৃত্য। আমি পিশাচটাকে হত্যা করেছি। তুমি আমাকে এ নরক থেকে বের করে নিয়ে যাও।

ঠাণ্ডা বাতাস এবং বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগতে খুশিতে কেঁদে ফেলল এরিক। উঠোনটাকে চেনা যাচ্ছে না। চারদিকে উঠোন। পানি দ্রুত বেড়ে চলেছে। কোথাও কোথাও পানি এক হাত গভীর; একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল কোথাও থেকে, বিরাট একটা ঢেউ এসে ধাক্কা দিল এরিককে। ডুবিয়ে দিল ওকে। হাচড়ে পাচড়ে পানির ওপর ভেসে উঠল এরিক। মুখ হাঁ করে শ্বাস করছে। চারদিকে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। এ ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে হোটেলে যাওয়ার দরজাটা কীভাবে খুঁজে বের করবে এরিক? আদৌ কি দরজার কোনো অস্তিত্ব রয়েছে!

প্রাসাদের একটা দেয়ালও আস্ত নেই। শুধু পাথর আর পানির স্রোত ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়ছে না। ঈশ্বর হোটেলটাও হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিম হোটেলের মধ্যে আছে!

কিন্তু হোটেল ধ্বংস হয়নি। লচসাইড হোটেলের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারেনি ঝড়। আধুনিক ভবনটি শতাব্দী প্রাচীন প্রাসাদের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত। ছাদ থেকে কয়েকটা টাইলস খসে পড়েছে বটে, কয়েকটা জানালার কাচও ভেঙেছে তবে হারিকেন অ্যাঞ্জেলার রুদ্র রোষ ঠেকিয়ে দিয়েছে হোটেল।

দরজাটা খুঁজে পেল এরিক। শরীরের শক্তি দিয়ে খুলতে হলো কপাট। তবে আর বন্ধ করতে পারল না। ওর পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল বৃষ্টি, সিক্ত করে তুলল কার্পেট।

একটি অয়েল-ল্যাম্প এখনও জ্বলছে রিসেপশনে তবে কালো চুলের মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ডাইনিংরুমের দরজা খোলা, ভাঙা একটি জানালা দিয়ে হু হু করে ঢুকছে বাতাস। ছুটে যেতে মন চাইল এরিকের। কিন্তু ক্লান্ত শরীর আপত্তি জানাল। কোনো মতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চলল ও, ভারসাম্য হারিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। ঈশ্বর, প্রার্থনা করল এরিক, কিম যেন থাকে ভেতরে!

ডাইনিংরুমের লোকগুলোকে আবছা সাদা মুখ মনে হলো। এরিককে দেখে আঁতকে উঠল ভয়ে। যেন কোনো অশরীরী আতংক এসে ঢুকেছে ঘরে। পিশাচ এসেছে প্রতিশোধ নিতে।

'এরিক!' চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ। হালকা-পাতলা গড়নের একটি মেয়ে ছুটে এলো ওর দিকে, পায়ের ধাক্কায় পড়ে গেছে চেয়ার। মেয়েটি জড়িয়ে ধরল এরিককে। ফোঁপাচ্ছে। এরিকও জড়িয়ে ধরল তাকে পরম স্বস্তিতে। তার কিম ভালো আছে, সুস্থ আছে। ওরা একে অন্যকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকল। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীর-মন। মুখে কথা ফুটল না। শুধু স্পর্শ বুঝিয়ে দিল ওদেরকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, পারবেও না।

সকাল।

থেমে গেছে ঝড়। নির্মল আকাশ, জলে ভেজা রোদ– যা ঘটেছে তার জন্য যেন ক্ষমা চাইছে অনন্ত অম্বর। এমন শান্ত চারদিক, সামান্য বাতাস বইলেও যেন ফিসফিসানিতে ভঙ্গ হবে নৈশব্দ।

প্যাশিওতে দাঁড়িয়ে আছে কিম এবং এরিক। চারপাশে ধ্বংসযজ্ঞের ছড়াছড়ি। প্রাসাদ সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে আছে কোনমতে। যেটা একসময় উঠোন ছিল তা এখন কবর হয়ে গেছে হাজার হাজার টন পাথরের নিচে। সেই সাথে ভূগর্ভস্থ টর্চার চেম্বারও। শয়তান তার ঝড়ের যোদ্ধাদেরকে পাঠিয়ে দিয়েছিল কয়েকশো বছর আগের এক রাতের মতো। সে তার শিষ্যদের সৃষ্টি করেছিল আবার সে-ই তাদেরকে ধ্বংস করেছে তাদের ব্যর্থতার কারণে।

দূর থেকে ভেসে এলো ট্রাক্টরের আওয়াজ। রাস্তা পরিষ্কার করতে নেমে পড়েছে। রাস্তায় পড়ে থাকা গাছ কেটে পরিষ্কার করছে ইলেকট্রিক করাত। এবারের শীতে বিনাহি গাঁয়ের লোকদের জ্বালানীর অভাব হবে না।

'আমি সবকিছুর ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে পারব না,' এরিক কিমকে বলেছে কীভাবে ও জিন্দালাশ দেখল, কীভাবে ভূস্বামী উরসুলা ইলিংসওয়ার্থের ছদ্মবেশ নিয়েছিল।

'ভূস্বামীর মস্ত ভুল ছিল উরসুলার ·ভৌতিক দেহ ব্যবহার করা। উরসুলার শক্তি তখনও নিশেষ হয়নি, সে তাকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারেনি। উরসুলার ক্যান্সারই তাকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। কীভাবে ঘটল ব্যাপারটা তা হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না, তবে আমি নিশ্চিত অপশক্তিটা এখান থেকে চলে গেছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' হাসল কিম। 'চারপাশে কেমন শান্তি শান্তি একটা ভাব। শুধু ঝড় থেমে গেছে বলেই এরকম মনে হচ্ছে না আমার।'

'আজ বিকেলের মধ্যে চলে যাবে সবাই,' এরিক দেখছে অনেকেই তাদের গাড়িতে মালপত্র তুলতে শুরু করেছে। এই ভয়ানক জায়গাটা থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে।

'আমরাও চলে যাব। এবারে আর কোনো অজুহাত চলবে না।' স্বামীর দিকে একটা আঙুল তুলল কিম। 'এখানে থাকার কোনো মানে নেই। আমরা নতুন কোনো জায়গায় শান্তিতে মধুচন্দ্রিমা উপভোগ করতে চাই।'

'কথা দিলাম,' স্ত্রীকে চুমু খেল এরিক। 'আশা করি মৃতেরা আর কোনোদিন জেগে উঠবে না।'